তুলি-কলম

১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৬৭

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
১ কলেজ রো
কলকাতা-৯
মুদ্রক
ত্বিষাম্পতি দত্ত
সাক্ষর মুদ্রণী
১ কলেজ রো,
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
অরুণ-বণিক
পাঁচ টাকা

শ্রীমধুসূদন মজুমদার
প্রীতিভাজনেষু

সস্তা বই

॥ কথারম্ভ ॥

'হরিদ্বার জনতা'র একটি থার্ড-ক্লাস কামরায় চেপে যাচ্ছিলাম হরিদ্বার। অবশ্য পুণ্যকামনায় নয়, বৈষয়িক প্রয়োজনে।

একে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, তায় ট্রেনটা হওড়া থেকে ছেড়েছিল বেশ রাত করে। গোড়া থেকেই তাই ট্রেনে যাত্রীসংখ্যা ছিল খুবই অল্প। একটা বড় ধরনের কামরায় আমরা জনকয়েক যাত্রী বেশ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে-ঘুমিয়েই যাচ্ছিলাম।

ঠিক কোন্ স্টেশনে মনে নেই, মাঝরাতে এসে ট্রেনটা দাঁড়াল কয়েক মিনিটের জন্য।

ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীতে পশ্চিমের সেই ছোট স্টেশনটায় যাত্রী কেউ বড় একটা ছিল না।

আমাদের কামরার দরজা-জানালা সব বন্ধই ছিল। আমিই বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার একটা পাল্লা খুলে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম।

যাত্রীহীন নিস্তব্ধ স্টেশনটা কুয়াসার চাদর মুড়ি দিয়ে যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ম্লান চাঁদের আলোয় কেমন যেন মায়াময় লাগছিল চারধার।

এমন সময়ে কালো কম্বলে আগাগোড়া দেহটাকে মুড়ে একটি মনুষ্যমূর্তি এসে দাঁড়াল আমাদের কামরার দরজায়। হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল কামরার ভিতরে।

এত রাতে একজন অপরিচিত যাত্রীর আগমনে বেশ বিরক্তিই বোধ করলাম। বেশ যাচ্ছিলাম আমরা রাজ্যপাট বিছিয়ে। কোথা থেকে এল এই মুর্তিমান ছন্দপতন।

চোর-জোচ্চোর কি না তাই বা কে জানে।

বিরক্ত মনেই বাঁকা দৃষ্টিতে লোকটার উপর নজর ফেললাম।

লোকটা ততক্ষণে আমার সামনের খালি বেঞ্চিটার একেবারে কোণের আসনটায় বসে মুড়ি-দেওয়া কম্বলটাকে মুখের উপর থেকে নামিয়ে ফেলেছে। ট্রেনের আলোয় তার মুখটা স্পষ্টই নজরে পড়ল আমার।

চমকে উঠলাম।

মুখে দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে। মাথার চুলও বড় বড় অবিন্যস্ত। পরিধানে সন্ন্যাসীর গেরুয়াবাস।

তবু চিনতে আমার ভুল হয় নি।

সতীনাথ।

বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠলাম, সতীনাথবাবু, আপনি!

চমকে উঠল গেরুয়াধারী যাত্রী। আচম্বিতেই কম্বলটাকে টেনে নিয়ে নিজেকে যেন আবরিত করতে চাইল খানিকটা।

আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আপনি—

—চিনতে পারলেন না তো? আমি মধুসূদন। রাধানাথ মল্লিক লেনের ভাঙা বাড়িটার কথা ভুলে যান নি আশা করি?

এর পর আর আমাকে চিনতে কষ্ট হয় নি সতীনাথের। বলল, না না, সবই মনে আছে। প্রথমটা আপনাকে আমি ঠিক খেয়াল করে দেখি নি।

হেসে বললাম, কিন্তু এ কি ব্যাপার? একেবারে পুরোদস্তুর স্বামীজি বনে গেছেন যে!

গম্ভীর গলায় সতীনাথ বলল, না না, যা দেখছেন এটা বাইরের খোলস। আসলে আমি যা ছিলাম তাই আছি। স্বামীজি হওয়া কি মুখের কথা মধুবাবু? তাতে যে নির্লোভ হতে হয়। অনেক বাসনার কাঠ-খড় যে তাতে পোড়াতে হয়। সে আর পারলাম কই এ জীবনে!

'হরিদ্বার জনতা' তখন পূর্ণগতিতে ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারের বুক চিরে।

কামরার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। যাত্রী যে কয়েকজন ছিল সবাই আপাদমস্তক লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জেগে আছি শুধু আমরাই দুজন।

দ্রুত চলমান ট্রেনের সেই নির্জন অবসরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সতীনাথের জীবন-নাটকের অনেক দৃশ্যের অনেক কথাই আমি সেদিন জানতে পেরেছিলাম।

সতীনাথকেও সেদিন কেমন যেন কথা বলার নেশায় পেয়েছিল।

রাধানাথ মল্লিক লেনের এক প্রায়ান্ধকার অপরাহ্নে যে তরুণ মানুষটিকে দেখেছিলাম নেহাতই স্বল্পভাষী, দিনের পর দিন এক সঙ্গে থেকেও যার মুখে কোন দিন কথার খৈ ফুটতে দেখি নি, সেদিন রাতে সেই মানুষটিই নিজের অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতে কেমন যেন মুখর হয়ে উঠেছিল।

বোধ হয় অনেক দিন পরে আমার মত একজন নৈর্ব্যক্তিক শ্রোতা পেয়ে বুকের বোঝাকে সে হাল্কা করতে চেয়েছিল।

করেও ছিল। রাতের অবশিষ্ট প্রহরগুলো একের পর এক পিছলে গড়িয়ে যেতে লাগল ট্রেনের চাকার তালে তালে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সতীনাথের মনের কথাগুলোও একের পর এক গড়িয়ে পড়তে লাগল তার কাঁপা কাঁপা গলার ভিতর থেকে।

সব কথা শেষ করে অবশেষে সতীনাথ বলল, সেই রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। নেমে এলাম পথে। আজও পথে পথেই দিন কাটাই। চলেছি কেদার-বদরির পথে। তবে একটানা নয়, থেমে থেমে। আজ এখানে, কাল সেখানে। এমনি করেই একদিন যদি পথের শেষের ঠিকানাটা মিলে যায় এই আশায়। কি জানেন মধুবাবু, ধনীই বলুন আর গরীবই বলুন, সুখীই বলুন আর দুঃখীই বলুন, সবাই আমরা পরের হাতের খেল্‌না। নিজের কথা বলতে পারব না, নিজের

পথে চলতে পারব না। যেন অন্য কারও বুকের কথাই আমার মুখে বসানো। আসলে কেউ আমবা মানুষ নই। সবাই আমরা যাত্রা-দলের রাজা আর রাণী। ঝুটো মুক্তোর মুকুট আর ঝুটো মোতিব মালা পরে পবের হাতে লেখা কথার ফুল ফোটাই মুখে, পবের লেখা নির্দেশে আসা-যাওয়া করি আসবে। তাই তো ও সং সাজতে আর ভাল লাগল না। বেরিয়ে পড়লাম পথে সব সাজ-পোশাক খুলে।

পরক্ষণেই মৃদু হেসে আবার বলে উঠল, কিন্তু স^ আব খুলে ফেলতে পারলাম কই? এই দেখুন না আবাব একটা পোশাক চাপিয়েছি গায়ে। কি জানেন, আসলে আমবা সবাই নকল। একটা পোশাক না হলে আমাদেব চলে না।

সতীনাথেব কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কান পেতে শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম। নিজে কোন কথাই বলতে পাবি নি শেষেব দিকে।

কোন্ একটা স্টেশনে যেন ভোব হতেই সতীনাথ উঠে দাঁড়াল। কম্বলটকে জড়িয়ে নিল সারা গায। তাবপব আমাব দুটো হাত ধবে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নাববেই গাড়ি থেকে নেমে গেল।

আমি অভিভূতেব মতই বসে বইলাম স্তব্ধ হয়ে।

একটা কথাও বেব হল না আমার মুখ থেকে।

পরদিন ভোরেই সাইকল নিয়ে শহরে ছুটল সতীনাথ। বার লাইব্রেরীর গেজেট দেখে পাকা খবরকে আরও পাকা ভাবে জেনে আসবে। সঙ্গে গেল শূলপানি ও নগেশ।

আর সেইখানেই সতীনাথের পরিচয় হলো দয়াময়বাবুর সঙ্গে।

আদালতের বটগাছের নিচে নগেশকে সাইকেল দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে সতীনাথ আর শূলপানি সন্তর্পণে ঢুকল বার-লাইব্রেরীতে।

কালো কালো পোষাকপরা উকীলবাবুরা সব ভারিক্কী চালে ঘোরাফেরা করছেন। কেউ বা বসেছেন মোটা মোটা কেতাব খুলে। কেউ বা ফিস্ ফিস্ কথাবার্তা চালাচ্ছেন মক্কেলদের সঙ্গে।

একপাশে ইজি-চেয়ারে চিৎ হয়ে সাদা একখানা বইয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন একজন।

সেদিকে চোখ পড়তেই ভাল করে দেখে নিয়ে সতীনাথ বলল, ওই গেজেট। আমি কলেজে দেখেছি এর আগে।

ঠিক সেই সময় লোকটি বইখানা মুখের উপর থেকে সরিয়ে ইজি-চেয়ারের হাতলে রাখলেন। গোলগাল গম্ভীর মুখ। নাকের নিচে আশুতোষ-মার্কা গোঁফ পানের ছোপে ঈষৎ লালচে। কপালে অনেকগুলো বলীরেখা। মাথার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বিশাল এক টাক।

পাশের সহকর্মীদের দিকে চেয়ে অনেকটা যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, না হে, এ কালেজের রেজাল্ট এবারেও তেমন ভাল হয় নি। সর্বসাকুল্যে মোটে পাঁচটি ফার্স্ট ডিভিশন।

সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর কথায় কেউ কোন রকম সাড়াশব্দ দিল না।

পায়ে পায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যেয়ে শূলপানি বলল, আজ্ঞে, এই বইটা একটু দেখতে পারি?

চোখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোক। গম্ভীর গলায় বললেন, কেন? কি দরকার?

—আজ্ঞে, আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্টটা একটু দেখব

—ওঃ, এই কালেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছ বুঝি ?

—আজ্ঞে না, আমি নই। আমার এই বন্ধুটি—

পিছনে দাঁড়ানো সতীনাথকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শূলপানি। সতীনাথের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আরে, তুমি দিয়েছ আই. এ. একজামিন ? তুমি যে একেবারে ছেলেমানুষ হে। তা কত নাম্বার তোমার ? কোন্ ডিভিশনে পাশ করবে বলে আশা কর ?

শূলপানি জবাব দিল, ও ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। আমরা খবরের কাগজে দেখেছি। শুধু খবরটা পাকাপাকি জানবার জন্যই—

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। শূলপানির কথা থামিয়ে দিয়েই বললেন, বটে, বটে, তুমিই তাহলে এ কালেজের পঞ্চপাণ্ডবের একজন। ব্র্যাভো মাই ডিয়ার লিট্‌ল্ ইয়ং ম্যান, ব্র্যাভো !

এমনি করেই দয়াময়বাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত।

ওদের দুজনকে আদর করে পাশে বসিয়ে সতীনাথের সম্পর্কে অনেক খবরই তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে জেনে নিলেন। শেষে বললেন, তারপর বি. এ. পড়ছ তো নিশ্চয়ই। কোন সাবজেক্টে অনার্স নিচ্ছ বল ?

সতীনাথ কুণ্ঠিতকণ্ঠে জবাব দিল, আজ্ঞে, সেইটেই তো হয়েছে সমস্যা। এই শহরে আমার পিসিমার বাড়ি আছে। সেখানে থেকেই কোনক্রমে আই. এ. টা পড়েছি। কিন্তু এখানে তো আর বি. এ. পড়া চলবে না।

—ওহো, তাও তো বটে। এটা যে আবার সেকেণ্ড গ্রেড কালেজ—এখানে তো বি. এ. নেই। তা বেশ তো, যেখানে বি. এ. আছে এমন কোন কালেজেই পড়বে। কি বল ?

এ কথার কোন জবাব দিল না সতীনাথ। মুখ নিচু করে বসে রইল। ওর দু'চোখ ফেটে বুঝি জল বেরিয়ে আসবে।

কথা বলল শূলপানি, ওর বাবার অবস্থা ভাল নয়। সামান্য চাকরি করেন বিদেশে। যে টাকা পাঠান তাতে কোনক্রমে খাওয়া-পরাটা চলে যায়। আই. এ.-র কলেজের মাইনেই সব সময় ঠিক মত দিতে পারেন নি। সেক্ষেত্রে বাইরে কোথাও পড়ার কথা ভাবাই যায় না।

হুঁম্—বলে গুম হয়ে খানিক বসে রইলেন দয়াময়বাবু। অভ্যাস-বশতই বার কয়েক হাত বুলোলেন নিজেরই টাকে। বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী দিয়ে কপালটাকে ঘসলেন কয়েকবার।

তারপর বললেন. কিন্তু তাই বলে এমন একটা কেরিয়ার পড়বার সুযোগের অভাবে নষ্ট হয়ে যাবে! না না, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সতীনাথের বুকের ভিতরটা কেমন যেন কাঁপতে লাগল একটা অজ্ঞাত প্রত্যাশায়। একটি অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই অযাচিত সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় ও একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পাবল না।

একটু চুপ করে থেকে দয়াময়বাবু বললেন, দেখ, আমার শ্বশুর-মশায়রা কলকাতায় থাকেন। আমার মেয়ে রেবা সেখানে থেকেই স্কুলে পড়ে। ক্লাস এইট। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতা রওনা হয়ে যাও। সেখানেই কালেজে ভর্তি হওগে। আমার শ্বশুরমশায়দের ওখানেই তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কোন অসুবিধা হবে না।

একটু থেমে আবার বললেন, আর—তোমার পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেবাকে সকাল-সন্ধ্যে একটু পড়াটড়াগুলো দেখিয়ে-শুনিয়ে দিও, আমি তোমার কালেজের মাইনে বাবদ মাসে কয়েকটা টাকা এখান থেকেই পাঠিয়ে দেব। কি বলো, আপত্তি নেই তো কিছু?

সতীনাথ কিছু বলবার আগেই সোৎসাহে কথা বলল শূলপানি, আজ্ঞে, এতো খুব ভাল ব্যবস্থা হল। আপনি মহানুভব, তাই—

সতীনাথ কোন কথাই মুখ ফুটে বলতে পারল না। তাড়াতাড়ি দয়াময়বাবুর দুই পায়ে হাত রেখে একটা প্রণাম করল।

দয়াময়বাবু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, আশীর্বাদ করি, জীবনে বড় হও। মনে রেখো, তোমাব মধ্যে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে সফল করে তুলবাব দায়িত্ব তোমার।

সে-কথারও কোন জবাব দিতে পাবল না সতীনাথ। নীরবে শুধু ঘাড়টা কাৎ করলো একবাব।

তারপর আরও কিছু আলাপ-আলোচনাব পব সেখান থেকে বিদায় নিল সতীনাথ।

শহর থেকে ফিরবার পথে নগেশ কথার চিমটি কেটে বলল, হুঁ-হু বাবা, এ যে একেবারে অর্ধেক রাজত্ব আব রাজকণ্যাব বিত্তান্ত

সাইকেলের প্যাডেলটায় ডান পায়েব একটা চাপ দিয়ে সতীনাথ বলল, ধ্যেৎ, কী যে বলিস্!

॥ ২ ॥

যে সম্ভাবনার ইঙ্গিতকে সতীনাথ সেদিন ছোট্ট একটা 'ন্যেৎ' শব্দ দিয়ে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিল সেই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে হতেও যে একদিন তার জীবনে এমন নির্মম নিষ্ঠুর পরিণতি লাভ করবে সে কথা কি সে সেদিন কল্পনাও করতে পেরেছিল ?

সতীনাথ তখন সবে ফোর্থ ইয়ারে উঠবে। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। আম জাম-কাঁঠালের ছায়ায় দিনগুলি বেশ ভালই কাটছে।

এমন সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সর্দা আইন পাশ হয় হয়।

বাল্য-বিবাহের শতাব্দীব্যাপী সংস্কারের মূলে পড়ল আইনের কুঠারাঘাত। প্রতিটি বিবাহেচ্ছু নবনারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স আইন করে বেঁধে দেওয়া হল। বিধান হল, নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমে উপনীত হবার আগে কারো বিয়ে হলে নবোঢ় দম্পতি এবং তাদের বিয়ের পৃষ্ঠপোষক সকলকেই আইনত দণ্ড ভোগ করতে হবে।

যেন এক ভয়ংকর বিপদের আবির্ভাব-আশংকায় ভীত বিপন্ন হয়ে পড়ল রক্ষণশীল মানুষের দল। প্রতিকারহীন ক্ষোভে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রক্ষণশীল অসহায় অভিভাবকের দল স্ব স্ব পুত্র-কন্যার আশু বিবাহ দেবার জন্য একেবারে যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যারা হয় তো পুত্র-কন্যার বিয়ের ব্যাপারে আরো দু'চার বছর নির্বিঘ্নে অপেক্ষা করতেন, একটা অহেতুক আতংকে তারাও পুত্র-কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিলেন।

ঘটকদের পশার বেড়ে গেল। পশার বাড়ল পুরোহিত ও

নরসুন্দরের। বাজি-বাজনাদারদের তো নাওয়া-খাওয়ার ফুরসুৎ রইল না। আজ এ-গ্রাম থেকে বিয়ের ডাক আসে তো কাল আসে ও-গ্রাম থেকে। কখনও বা একই রাত্রের বিভিন্ন লগ্নে বিভিন্ন বিবাহ-সভায় ঢোল-কাশি নিয়ে হাজিরা দিতে হয়। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে উলু দেবার এয়ো জোটে না, বাসর জাগবার মেয়ে জোটে না। বর আছে তো কনে জোটে না, কনে আছে তো বর পাওয়া ভার। বালক, কিশোর, তরুণ—বালিকা, কিশোরী, তরুণী—যে যেখানে ছিল সবাইকে খুঁজেপেতে টেনে-হিঁচড়ে এনে বর-কনের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া হতে লাগল। জমিদার-বাড়ির দুর্গোৎসবে সহস্র ছাগ-বলির মত হাজার-হাজার অসহায় বালক-বালিকাদের বিয়ের যুপ-কাষ্ঠে ফেলা হতে লাগল।

বেচারি সতীনাথও বাদ গেল না।

সে ডামাডোলের বাজারে সতীনাথ তো রীতিমত লোভনীয় পাত্র। খাস কলকাতা শহরে কলেজে পড়ে। একটা পাশ দিয়েছে। চাই কি আরেকটা পাশও বছর ঘুরলেই দেবে। এ হেন পাত্র তো তখন আসমানের চাঁদ।

সে-চাঁদ ধরতে অনেক হাতই এগিয়ে এল। কিন্তু শক্ত করে ফাঁদ পাততে পারল শুধু একজনই। সতীনাথের বিধবা জেঠাইমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। কয়েকখানা গ্রাম ছাড়িয়েই তাঁর বাড়ি।

হাতড়াতে হাতড়াতে একদিন তিনি হাজির হলেন সতীনাথদের বাড়ি। জেঠাইমার পায়ের উপর ঢিপ করে একটা প্রণাম করলেন। তারপর দিনভোর রাতভোর ফুস্থুর-ফুস্থুর করে কী যে মন্ত্র দিলেন তাঁর কানে, জেঠাইমা একেবারে 'গুম' হয়ে গেলেন। ফতোয়া জারী করলেন, সেই আত্মীয়টির মেয়ের সঙ্গেই সতীনাথের বিয়ে দেবেন। এবং অবিলম্বেই।

সতীনাথের মা মুখ কালো করে বললেন, তা কি করে হবে দিদি? ও যে একেবারে ছেলেমানুষ?

ঝংকার দিয়ে উঠলেন জেঠাইমা, দুই দুটো পাশ দিতে চলেছে, সে আর ছেলেমানুষ কিসে? তাছাড়া ছেলেমানুষ থাকতে থাকতেই তো ছেলের আমি বিয়ে দিতে চাই। নইলে শেষটায় ওই কলকাতার শহরে একটা ধিঙ্গি মেয়ের পাল্লায় পড়ে ছেলে আমাদের গোল্লায় যাবে তাই কি তোমরা চাও? ওসব কোন কথা আমি শুনতে চাই না। খবরদার সতুর মা, এ বিয়েতে যেন ভাংচি দিতে এস না।

এ সংসারে এই স্নেহশীল বিধবা মানুষটির প্রভাব যে কতখানি সতীনাথের মার সেটা অজানা নয়। তার কথার উপরে যে সহজে কেউ কথা বলবে না তাও তিনি জানেন। তবু আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু উনি রইলেন বিদেশে, এ অবস্থায় সতুর বিয়ে—

তাকে থামিয়ে দিয়েই কথা বললেন জেঠাইমা, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। কালই সতুর বাবাকে তার করিয়ে দিচ্ছি। সে এসে ছেলের বিয়ে দিয়ে যাক।

কিন্তু জেঠাইমার সে ইচ্ছায় বাদ সাধল যার বিয়ে সেই সতীনাথ নিজেই। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে তখন বাড়িতে ছিল। বিয়ের কথাটা কানে যেতেই সে বেঁকে দাঁড়াল। তার সমস্ত মন যেন সহস্রকণ্ঠ হয়ে অনবরত তার বুকের মধ্যে বলতে লাগল—না, না, এ হয় না, হতে পারে না।

তবু নিজের মুখে আপত্তিটা জানাতে কেমন যেন সংকোচ বোধ হল তার। তরুণ বয়সের স্বাভাবিক লজ্জাও ছিল তার সঙ্গে মিশে। তাই ও-পাড়ার খেলার সাথী অমলকে দিয়ে কথাটা সে পাড়ল জেঠাইমার কাছে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, বিয়ে সে এখন করতে পারবে না। তথাপি যদি তাঁরা বিয়ের আয়োজন করেন তাহলে যে দিকে দুচোখ যায় সে চলে যাবে।

সতীনাথ কখনো তাঁর ব্যবস্থায় আপত্তি জানাতে পারে এটা যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য, এমনি ভাবেই জেঠাইমা একেবারে আঁতকে উঠলেন অমলের কথা শুনে। চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে তিনি বলতে

লাগলেন, কী সত্তুর এত বড় আস্পর্ধা! আমার কথার উপর কথা বলে! ওর বাবা আজ পর্যন্ত কোন দিন যা করতে সাহস করল না, নাক টিপলে দুধ গলে ওই ছেলে কিনা তাই করল! আমার কথার উপর কথা!

বলতে বলতে এক সময়ে চোখের জল ফেলে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি কেঁদে বললেন, তা তো বলবেই। ও তো আমার পেটের ছেলে নয়। তাহলে কি এমন করে মায়ের কথার অবাধ্য হতে পারত! যতই কর, যতই বুকের রক্ত দাও, পর কি কখনও আপন হয়? হয় না—হয় না।

জেঠাইমার শেষের কথাগুলো সতীনাথের বুকে যেন বিষাক্ত তীরের মত বিঁধল।

বুকের রক্ত দেওয়ার একটা ইতিহাস আছে।

ছোটবেলায় একবার ভারি অসুখ হয়েছিল সতীনাথের। একেবারে জীবন সংশয়! সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বাড়িশুদ্ধু কান্নাকাটি সেই সময়ে একদিন সকাল সকাল স্নান করে এসে জেঠাইমা মা-কালীর নামে সওয়া পাঁচ আনার পয়সা একটা পুটুলিতে বেঁধে অচৈতন্য সতীনাথের কপালে ছুইয়ে বলেছিলেন—হে মা কয়ড়ার কালী, আমার সতুকে ভাল করে দাও মা, বুকের রক্ত দিয়ে আমি তোমায় পূজো দেব। সতীনাথের রোগমুক্তির পর সত্যি সত্যি তিনি সদলে কয়ড়ার জাগ্রত দেবী মহাকালীর মন্দিরে যেয়ে নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে অনেক ধুমধাম করে মায়ের পূজো দিয়েছিলেন। চারিদিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল সতীনাথের জেঠাইমার। আজও আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা সে-গল্প করে।

সতীনাথ নিঃসন্তান বিধবা জেঠাইমার নয়নের মণি—পুত্রাধিক প্রিয়। সতীনাথ তা জানে। তাই তো তাঁকে সে বড়মা বলে ডাকে। বুঝি বা তাঁকে ভালবাসে মায়েরও অধিক। তাই তো বড়মার অভিমানক্ষুব্ধ কথাগুলো তার একেবারে মর্মমূলে এসে আঘাত করল
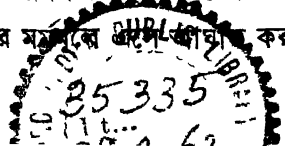
তাই তো সবলে নিজেব ইচ্ছা-অনিচ্ছাব টুঁটি চেপে ধরে জেঠাইমার প্রস্তাব মত বিয়েতে সে সম্মতি দিল। জেঠাইমা বুঝুক, সতীনাথ পেটেব ছেলেব চেয়ে কম নয়। সতীনাথ তাঁর পব নয়।

মাব কাছে যেয়ে অশ্রু-ছলছল চক্ষে বলল, বড়মাকে তুমি বলে দাও মা, বিয়েতে আমাব অমত নেই। তোমবা সকলে মিলে যা ভাল বুঝবে তাই আমি মাথা পেতে নেব।

ছেলেব ম্লান মুখ আব ছলছল চোখ দেখে মায়ের বুঝতে কিছুই বাকি বইল না কোন্ অবরুদ্ধ বেদনাব তাড়নায় সে যে নিজে মাব কাছে বিয়েতে সম্মতি জানাতে এসেছে সে তো তাঁর অজানা নয়। বললেন, আমাদেব তুই ভুল বুঝিস্ নে বাবা, এ বিয়েব আমবা কিছুই জানি না।

মুখ নিচু কবেই সতীনাথ বলল, ও কথা তুমি বলো না মা, বড় মা শুনলে ব্যথা পাবে। তুমি আমাব হয়ে তাকে কথা দিয়ে এস গে।

কথা তিনি দিলেন। আব সেই কথামত টেলিগ্রাম পেয়ে সতীনাথের বাবা দীননাথবাবুও বাড়ি এসে হাজির হলেন কমস্থল থেকে। সব শুনে গম্ভীব হয়ে খানিক বসে বইলেন ঘরের দাওয়ায়।

তাবপব এক সময় সতীনাথকে ডাকলেন কাছে। স্বভাবত তিনি স্বল্পবাক মানুষ। কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে ধীবে ধীবে বললেন, সব কথা আমি শুনেছি। সত্যি যদি এ বিয়েতে তোমাব অমত থাকে তো বলো, আমি না হয় বড় ঠাকরুণকে একবাব বলি—

বাধা দিল সতীনাথ, না বাবা, তা তুমি কবো না। বড়মা তাহলে মনে খুব ব্যথা পাবে।

দীননাথ বললেন, তোমাব মত ছেলেব উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। কিন্তু বাবা, বিবাহ জীবনের একটা সাময়িক ঘটনামাত্র নয়। এর সঙ্গে তোমার সারা জীবনেব সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ জড়িয়ে থাকবে। কাজেই খুব ভাল করে ভেবে চিন্তে তোমাকে মনস্থিব কবতে হবে।

আবেগের বশে এমন কিছু কবা ঠিক নয় যার জন্যে পরে অনুতাপ করতে হতে পারে।

এ কথার কোন জবাব সতীনাথ দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দীননাথ এক সময় বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

চুপচাপ অনেক ক্ষণ বসে বইলেন দীননাথ। তারপর এক সময ভ্রাতৃবধূব কাছে যেযে কথাটা পাড়লেন।

—দেখুন বৌঠাকরুণ, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই—

খপ কবে জ্বলে উঠলেন জেঠাইমা, অত ভূমিকাব দবকাব কি ঠাকুরপো? যা বলতে এসেছ সোজা কবেই বল না। ছেলেব বিয়ে এখানে দেবে না, এই তো? তা বেশ তো. তোমাদেব ছেলে, তোমবা যেখানে খুশি তাব বিয়ে দাও গে। তাতে আমাব কথা বলবাব কি আছে? আমাবই ঘাট হয়েছিল যে পবেব ছেলেব বিয়ে নিয়ে নাচানাচি শুরু কবেছিলাম।

জেঠাইমার কথাব তোড়েব সামনে একেবাবে বোবা বনে গিয়েছিলেন দীননাথ। একটু সাহস সঞ্চয় কবে আমতা আমতা কবে বললেন, এ আপনি কি বলছেন বৌঠাকরুণ, সন্তু তো আপনাবই ছেলে—

অগ্নিতে বুঝি ঘৃতাহুতি পড়ল। জেঠাইমা ফোঁস কবে উঠলেন, ও ছেঁদো কথা তুমি রাখ ঠাকুরপো, ও আমি জীবন ভোব অনেক শুনেছি। নইলে কারু ঘবও জ্বালিয়ে দেই নি, কারু পাকা ধানেও মই দেই নি। ভাল বুঝে একটা বিয়েব সম্বন্ধ কবেছিলাম। তাই নিয়ে বাড়িশুদ্ধ, সবাই আমাব উপব তম্বি। সেদিনকাব পুঁচকে ছেলে সন্তু সেও এসে একবার শাসিয়ে গেল, এ-বিয়ে করব না। আবার তুমি এসেছ তার হয়ে ওকালতি করতে! কেন? তোমাদের কি এমন অন্যায়টা আমি করেছি?

বলতে বলতে ক্ষোভে ও দুঃখে জেঠাইমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

দীননাথ হাতজোড় করে বললেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী বলছেন বৌঠাকরুণ, সতুর প্রতি অন্যায় করবেন আপনি? সে কি কখনও হয়, না সে কথা কেউ ভাবতে পারে? বেশ তো, আপনি যদি মনে করেন যে এ বিয়েতে সতুর কল্যাণ হবে, তো তাই হবে। আপনার ব্যবস্থার উপর এ বাড়িতে কেউ কোন দিন কথা বলেনি, আজও বলবে না।

বাড়ির সবাই সে-ব্যবস্থাকে মেনে নিলেন। বিয়ের তোড়-জোড়ও শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু সে-ব্যবস্থার উপর কথা বললেন এমন একজন যার কথা এরা ভাবতেও পারেন নি।

তিনি জেলা কোর্টের উকীল দয়াময়বাবু।

আই. এ. পরীক্ষার ফলজিজ্ঞাসু একটি পল্লী-তরুণের মধ্যে যেদিন তৃতীয় পাণ্ডবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেই দিনই আর একটি সম্ভাবনার উজ্জ্বল ছবিও চকিতে তাঁর মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

ক্ষুরধারবুদ্ধি আইনব্যবসায়ী তিনি। নেহাৎ অকারণ দাক্ষিণ্য-বশতঃই সেদিন সতীনাথকে নিজ কন্যার গৃহশিক্ষকরূপে শ্বশুরালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা তিনি করেন নি। সেই সঙ্গে আর একটি আকাঙ্খার বীজও তাঁর মনের মধ্যে সহসা অঙ্কুরিত হয়েছিল। চকিত ভাবনায়ই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, উপযুক্ত জল-হাওয়ায় এ বীজ একদিন সোনার ফসল হয়ে উঠবেই। আর তা যেদিন হবে সেদিন সে ফসল কেটে ঘরে তুলতেই বা কতক্ষণ!

কিন্তু বিচক্ষণ লোক দয়াময়বাবু। তিনি এ সম্ভাবনার তিলমাত্র ইঙ্গিতও ঘুণাক্ষরে কাউকে দিলেন না। তিনি জানতেন, মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা না প্রকাশয়েৎ।

তাই যেদিন তাঁরই মক্কেল-জোটানো দালাল প্রিয়নাথ এসে তাম্বুলরস রঞ্জিত দন্তরাজি বিকশিত করে তাঁর মনের সেই অতি গোপন বাসনার অকাল ব্যর্থতার বার্তা নিবেদন করল সেদিন তিনি বিস্ময়ে ও ক্রোধে খানিক হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রিয়নাথ বলছিল, ঘোর কলিকাল উকীলবাবু, ঘোর কলিকাল। নইলে মানুষ কখনও এমন অকৃতজ্ঞ, চশমখোর হয়। আরে বাবা, চোখের পর্দা বলেও তো একটা কথা আছে। এই যে একটা লোক তোদের জন্য এত করছে, তার কি কোন দাম নেই? তিনি না হয় নিঃস্বার্থ ভাবেই সব করছেন, কিন্তু তোদেরও তো একটা বুদ্ধিবিবেচনা থাকা উচিত।

দয়াময়বাবু প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারেন নি। মৃদু হেসে বললেন, কার কথা বলছ হে প্রিয়নাথ? কি হয়েছে?

রসিয়ে রসিয়ে সতীনাথের বিয়ের খবর সবই খুলে বলল প্রিয়নাথ। বলতে বলতেই ফোঁড়ন কাটল আবার, ছিলি আস্তাকুড়ে, উঠে এসেছিলি শান-বাঁধানো ঘরে, চাই কি একদিন সোনার পালংকেও পা রাখতে পারতি। তা এঁটো পাতার স্বভাব তো, কপালে অত সুখ সইবে কেন? মরবি এখন সারা জীবন আস্তাকুড়ে পচে।

হঠাৎ ধমকে উঠলেন দয়াময়বাবু, থামো তুমি প্রিয়নাথ। বাজে বাচালতা রাখো। তুমি সত্যি জান সতীনাথের বিয়ে হচ্ছে অজ্ঞ পাড়াগাঁর একটা মুখখু মেয়ের সঙ্গে?

—সত্যি মানে? আমার নিজের কানে শোনা কথা। নিজের চোখে দেখে এলাম বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়েছে। আর উদ্যোগ-আয়োজনই বা কিসের। এক ঢোল এক কাসি ঠন্-ঠন্-ঠন্। বিয়ে তো নয় যেন পাঁঠা বলির বাজনা।

বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল প্রিয়নাথ পানের রঙে কালো ছোপ লাগানো উঁচু-নিচু এক পাটি দাঁত বের করে।

কড়া গলায় আর একবার তাকে ধমক দিলেন দয়াময়বাবু।

প্রিয়নাথ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন দয়াময়বাবুও। কি যেন ভাবলেন গম্ভীর হয়ে। তারপর এক সময়ে বললেন, তাই তো হে, এর একটা বিহিত তো করা দরকার। এমন একটা ভাল 'কেরিয়ার' এ ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে সে তো ঠিক নয়।

প্রিয়নাথ মনে মনে হাসল : 'কেরিয়ারের' জন্য তো চোখে তোমার ঘুম নেই! হুঁহুঁ বাবা, তোমাকে আমি খুব চিনি। তুমি যেমন ঘুঘু উকীল, আমিও তেমনি উকীলের 'টর্নি'। তুমি থাক ডালে ডালে, আর আমি ফিরি পাতায় পাতায়।

বাইরে একগাল হেসে বলল, আজ্ঞে, তা তো বটেই, তা তো বটেই। আপনি না দেখলে আর কে দেখবে ছেলেটাকে! আহা বেচারি! চোখ-মুখ যেন দুদিনেই একেবারে শুকিয়ে গেছে।

দয়াময়বাবু এবার গলায় বেশ জোর দিয়ে বললেন, তুমি কিছু ভেব না প্রিয়নাথ, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখুনি একবার 'ষ্ট্যাণ্ডে' যাও, একটা ঘোড়ার গাড়ি বলে এস। বিকেলেই আমি একবার সতীনাথদের বাড়ি যাব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

—সে কি স্যার, আপনি নিজে যাবেন?

—হ্যাঁ, আমি নিজেই যাব। চিঠিপত্রে হয় তো কাজ হবে না। বিয়েটা যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে।

সন্ধ্যার কিছু আগেই সতীনাথদের গ্রামে যেয়ে হাজির হলেন দয়াময়বাবু।

দীননাথ বাড়িতেই ছিলেন। সশব্যস্তে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। এত বড় মাননীয় অতিথির আগমনে একেবারে যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে গেলেন।

হাত জোড় করে বললেন, আপনি আসবেন আমার এই গরীবের বাড়িতে, এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর।

দয়াময়বাবু মাপা হাসি হেসে বললেন, না না, সে কি কথা। সতীনাথকে আমি নিজের ছেলের মতই মনে করি। তার বাড়িতে আসব এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। কি বল হে সতীনাথ?

সতীনাথ একপাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। নীরবেই মৃদু হাসল। কোন কথা বলল না।

কথা বললেন দীননাথ, আজ্ঞে, সে তো বটেই। আপনার কৃপায়ই ওর লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। নইলে আমার সাধ্যে তো আর কুলোতো না।

কিন্তু এ-সব বাজে কথাকে আর বেশী দূর এগোতে দিলেন না দয়াময়বাবু। সতীনাথকে একটা অছিলায় ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি আসল বক্তব্যে হাত দিলেন বললেন, একটা কথা হঠাৎ কানে এসেছে দীননাথবাবু, কথাটা কি সত্যি?

সবিস্ময়ে দীননাথ বললেন, কি কথা বলুন তো?

—সতীনাথের নাকি বিয়ে দিচ্ছেন আপনি? আমি অবশ্য কথাটা বিশ্বাস করি নি—

কথার মাঝখানেই কথা বললেন দীননাথ, দেখুন, অবিশ্বাসযোগ্য হলেও কথাটা সত্যি। আমারই ত্রুটি হয়ে গেছে। কথাটা এর আগেই আপনাকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল যে আপনাকে জানাবার আর অবসর পাই নি। অবশ্য দু'এক দিনের মধ্যেই আমি যেতাম ভেলাসদরে আপনার কাছে—

গম্ভীর গলায় দয়াময়বাবু বললেন, কেন? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে নাকি?

—আজ্ঞে, সে তো বুঝতেই পারছেন। আপনার মত হিতাকাঙ্ক্ষী সত্তুর আর কে আছে বলুন। আপনাকে তো এ বিয়েতে উপস্থিত থাকতেই হবে। আমি নিজে যেয়ে আপনাকে নেমন্তন্ন করে আসব।

—তার আর দরকার হবে না। এ বিয়ে আপনি বন্ধ করে দিন।

যেন আকাশ থেকে পড়লেন দীননাথ। সভয়ে বললেন, সে কি? কেন?

—কেন আবার জিজ্ঞাসা করছেন? একটা 'ব্রাইট' ছেলে। সবে বি. এ. পড়ছে। কত সম্ভাবনা তার সামনে। আর কোথাকার একটা পাড়াগেঁয়ে মুখ্খু মেয়েকে জোর করে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে ছেলেটার ভবিষ্যৎকে একেবারে ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

দয়াময়বাবুর কথাগুলো অন্যায় নয়। অশোভনও নয়। যে কোন শুভাকাঙ্খীই একথা বলতে পারতেন কিন্তু যে সুরে যে ভঙ্গীতে তিনি কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তাতে দীননাথ খুবই আহত হলেন। তবু সহজ সৌজন্যের সঙ্গেই তিনি বললেন, দেখুন, কাজটা যে খুব সমিচান হচ্ছে না, সেটা আমিও বুঝি। কিন্তু কি করব বলুন, এ ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

দয়াময়বাবু বক্রকণ্ঠে বললেন, কেন? ছেলের বিয়ে এখন না দিলে কি আপনার সম্পত্তি লাটে উঠত? না কেউ আপনাকে ফাঁসি দিত?

—দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা হয় তো আপনি জানেন না, তাই এ-কথা বলছেন। এ বিয়েতে সতুর খুবই আপত্তি। আমিও কখন ভাবি নি যে এ সময়ে ওর বিয়ে দেব। বিশেষ করে আপনার অনুগ্রহে ওর পড়াশুনার একটা ব্যবস্থা যখন হয়েছে। কিন্তু কি করি বলুন, ওর জেঠাইমা ওকে ছেলের মত ভালবাসেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছেতেই এ বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। এক্ষেত্রে আর কোন উপায় ছিল না আমার।

দয়াময়বাবু কণ্ঠে ক্ষুরের ধার লাগালেন, এটা একটা কথাই নয় মশায়। ওর জেঠাইমা অবুঝের মত একটা কাজ করবেন, আর আপনারা সবাই তাতে সায় দিয়ে নেচে উঠবেন। কাজটা ভাল কি মন্দ একবার তলিয়েও দেখবেন না। তাছাড়া সতীনাথের জেঠাইমা

পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ। শিগগির শিগগির নাতির মুখ দেখবার আশায় তিনি না হয় গদগদ হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আপনি ছেলের বাপ হয়ে তাতে সায় দিলেন কেমন করে? আপনি কি একবারও ভেবেছেন যে এর ফলে ছেলের যে ক্ষতি হবে তাতে আখের নষ্ট হবে আপনারই। আপনার বৌদির আর কি? তিনি তো বিয়ে দিয়েই খালাস। তাকে তো আর হেপা পোয়াতে হবে না। আরে মশায়, ও রকম পরের ধনে পোদ্দারি সকলেই করতে পারে।

দয়াময়বাবুর কথার সুরে এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব স্পষ্টতই ফুটে বেরিয়েছিল, বিশেষ করে জেঠাইমার প্রতি এমন অশোভন ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন যে দীননাথের চোখ-মুখ প্রবল ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। তবু স্বভাবশান্ত মানুষ তিনি। নিজেকে সংযত করে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, দয়াময়বাবু, আপনি সতুর আশ্রয়দাতা। আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাছাড়া আজ আপনি আমার বাড়িতে মাননীয় অতিথি। তাই বলছি দয়া করে এ ব্যাপারে আর কোন আলোচনা আপনি করবেন না। তাতে কোন ফল হবে না।

দয়াময়বাবু সক্রোধে বললেন, তার মানে আমার কথা আপনি রাখবেন না? এ বিয়ে বন্ধ করবেন না?

—না।

দৃঢ় কণ্ঠে কথাটা বলেই সহসা চুপ করলেন দীননাথ। মুহূর্তমাত্র কি যেন ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, আপনাদের শহরে কি হয় জানি না। আমরা গাঁয়ের মানুষ, গাঁয়ের কথাই জানি। এ বাড়িতে সতুর জেঠাইমাই একমাত্র কর্ত্রী। তাই এ বাড়িতে তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছার মূল্য অন্য কারো ভাল লাগা না লাগার চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই তাঁর যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন এ বিয়ে কেউ রোধ করতে পারবে না। আমিও না।

দয়াময়বাবু এবার শেষ অস্ত্র ছাড়লেন। বাঁকা ঠোঁটের ফাঁকে

শানিত হাসির ঝিলিক লাগিয়ে বললেন, তাতে যদি সতীনাথের সমূহ ক্ষতি হয় তবুও না?

দীননাথ বুদ্ধিমান লোক। সমস্ত ব্যাপারটা তিনিও এতক্ষণে আঁচ করতে পেরেছেন। তাই ব্যঙ্গের সুরে বললেন, ক্ষতি আপনি অনেকটাই করতে পারেন তা জানি। হয়তো সতুর ভাগ্যে লেখা-পড়ার পাট এখানেই শেষ হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে বলুন? গরীবের ঘরে যখন জন্মেছে তখন সে মন্দভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

জেলাকোর্টের উকীল দয়াময়বাবুর মুখের উপর তারই আশ্রিত সতীনাথের দরিদ্র পিতা যে এমন সদম্ভ জবাব ছুঁড়ে দিতে পারে এ সত্য তার কল্পনারও অতীত ছিল। তাই সহসা কোন জবাব তিনি দিতে পারলেন না। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দীননাথের মুখের দিকে।

এমন সময় ঘরের ভিতর দিককার ভেজানো দরজাটা আস্তে খুলে গেল। ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করলেন সতীনাথের জেঠাইমা। আধ-ঘোমটার আড়াল থেকে দ্বিধাহীন স্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বললেন, আমার একটা অনুরোধ উকীলবাবু, সতুকে আপনার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করবেন না। ভুল আমারই হয়েছিল। আমি সব কথা ঠিক বুঝতে পারি নি। এ বিয়ে আমি ঠিক করেছি, আমিই ভেঙে দেব। ওর যাতে কোন ক্ষতি না হয় আপনি দয়া করে সেদিকে একটু কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।

দয়াময়বাবুর মুখ-চোখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই রকম একটা ঘটনার আশা করেই তো তিনি সগর্বে এখানে এসেছিলেন। আশাপূরণের আনন্দে মন তার আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। দৃঢ়স্বরে আবার কথা বললেন দীননাথ, এ আপনি কি বলছেন বৌঠাকরুণ? এ হতে পারে না।

জেঠাইমা মুখ ফিরিয়ে বললেন, কেন হতে পারে না ঠাকুরপো? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে উনি সতুর আশ্রয়দাতা। ওর ইচ্ছারও তো একটা মূল্য আছে। বিশেষ উনি সতুর হিতাকাঙ্ক্ষী।

—তা জানি। তবু 'এ হবে না'। দুদিন উনি সতুকে দুটো অন্ন দিয়েছেন, সে অন্নঋণ না হয় সতুর সঙ্গে আমরা সবাই সারা জীবন ভরে বয়ে বেড়াব। কিন্তু তাই বলে সেই দুদিনের ঋণের কাছে তোমার সারা জীবনের স্নেহ-ভালবাসা একেবারেই মূল্যহীন হয়ে যাবে এ অঘটন আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না। আর হিতের কথা বলছ? এ জগতে কেউ কারো হিত করতে পারে না বৌঠাককণ, হিত-অহিত সব যার যার কপালে লেখা থাকে। দর্শক আমরা সবাই নিমিত্ত মাত্র।

এই চরম ঘোষণার পরে আর কোন কথা চলে না। অগত্যা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে দয়াময়বাবু দীননাথের শত অনুরোধেও জলগ্রহণ না করেই শহরে ফিরে গেলেন। আর এদিকে এই ঘটনার পরে দীননাথ যেন নবীন উৎসাহে অধিকতর আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহের আয়োজনে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন

শুভক্ষণে উলুধ্বনি হল, শাঁখ বাজল, দুই হাত এক হল।

শুধু শুভদৃষ্টির সময় অতি সাধারণ একটি শ্যামলা মেয়ের একখানি ততোধিক সাধারণ মুখের দিকে চেয়ে সতীনাথের বুকখানা যেন কি এক অজ্ঞাত বেদনায় টনটন করে উঠল। চকিতে আর একটি চপলা গৌরাঙ্গী কিশোরীর চকিতপ্রেক্ষণা সুকুমার মুখের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল।

ভবিষ্যৎ জীবনে জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত শ্রান্ত সতীনাথ যখন ক্রেতাবিহীন একটি নতুন-খোলা মুদিখানার দোকানে বসে বসে ঝিমুত আর বড়লোক হবার দিবাস্বপ্ন দেখত, তখনও মাঝে মাঝে সেই

বেণী-দোলানো চপল মুখখানি বিদ্যুৎ চমকের মতই তার মেঘলা মনের উপর ভেসে উঠত। অকারণেই তখন এক এক সময় তার ভাবতে বড় ভাল লাগত—আহা! সেদিন যদি সুভদ্রার সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে না পড়ত তাহলে হয় তো দয়াময়বাবুর সস্নেহ আনুকূল্যে স্বর্ণ-সোপানের সন্ধান খুব অনায়াসেই সে পেতে পারত।

আরও একদিন—যেদিন সরযূর সঙ্গে সতীনাথের নামকে অসঙ্গত ভাবে জড়িয়ে একটা ভিত্তিহীন কুৎসার হলাহল আকণ্ঠ পান করে গোয়ালঘরে নিজের পরিধানের শাড়ি গলায় জড়িয়ে ফাঁসিতে ঝুলেছিল সুভদ্রা, সেদিনও অন্ধ বেদনায় ও তীব্র জীবন-বিতৃষ্ণায় ক্ষত-বিক্ষত সতীনাথের রক্তাক্ত হৃদয়ের পটে বার বার একটি গৌরাঙ্গী কিশোরীর হাসিভরা মুখখানিই ভেসে ভেসে উঠেছিল।

আর কী আশ্চর্য বিধির বিধান! সেই মৃত্যু-আকাঙ্খার চঞ্চলা কিশোরীই একদিন একান্ত আকস্মিক ভাবে নব রূপে নতুন মমতায় এসে আবির্ভূত হয়েছিল সতীনাথের সামনে। সতীনাথের ব্যর্থ বিপন্ন জীবনের সব দুঃখ-লাঞ্ছনাকে বুঝি মমতার জলে নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল।

॥ ৩ ॥

কুৎসা।

দেহহীন সহস্রশীর্ষ ভয়ংকর সরীসৃপ।

তার প্রতিটি মুখে তীব্র বিষ।

সেই বিষের জ্বালায়ই তো আজীবন জ্বলেছিল সুভদ্রা। আর সতীনাথকেও জ্বালিয়েছিল।

বেচারি সুভদ্রা।

সতীনাথ তাকে করুণার চোখেই দেখেছে চিরদিন।

সুভদ্রারই বা দোষ কি? একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূর পক্ষে প্রবাসী স্বামীর এতবড় কলংকের কথা—হোক না সে মিথ্যা কল্পনা।—নির্বিবাদে হজম করাই কি তার পক্ষে সম্ভব?

তাই তো দুঃসহ যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের সাহায্যেই চিরতরে সব যন্ত্রণার অবসান সে করতে চেয়েছিল।

আর সতীনাথেরই বা দোষ কি?

নগদ টাকার বিনিময়ে সবয়ুকে সে প্রাইভেট পড়াতে গিয়েছিল। কাজটা হয় তো একটু দুঃসাহসিকই হয়েছিল তার পক্ষে। কিন্তু সে-ট্যুইশনী করা ছাড়া তখন তার আর কি উপায় ছিল কলকাতা শহরে বেঁচে থাকবার বা কলেজের পড়া চালাবার?

দোষ হয়তো কিছুটা করেছিল শূলপানি।

কিন্তু সে বেচারাও কি বুঝতে পেরেছিল আগে যে রাগের মাথায় হুট করে যে কথাগুলো সে কলকাতা থেকে ফিরে এসে বলে ফেলেছিল তার এমন বিষময় ফল ফলবে?

হয়তো দোষ-অপরাধ কারোরই কিছু ছিল না। যত দোষ যত অপরাধ সব সতীনাথের ভাগ্য-বিধাতার। নইলে নিতান্ত দরিদ্র ঘরে জন্মেও একান্ত আকস্মিক ভাবেই দয়াময়বাবুর অযাচিত করুণায় জীবনের স্বর্ণ-সোপান উত্তরণের যে অবাধ সুযোগ তার হাতের মুঠোয় এসেছিল, আবার একদিন স্নেহময়ী জেঠাইমার একটা অকারণ জিদের ফলে সেই সুযোগ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে নিবান্ধব মহানগরীর একেবারে পথে এসে তাকে দাড়াতে হবে কেন?

সে দারুণ দুর্দিনের কথা সতীনাথ কোনদিন ভুলতে পারে নি।

বিয়ের পরে অষ্ট-মঙ্গলার গিঁট খুলে সবে বাড়ি ফিরেছে।

ফিরেই তোড়জোড় শুরু করে দিল কলকাতা যাত্রার।

জেঠাইমা বললেন, আরও ক'টা দিন থেকে যা না রে সতু। এত তাড়া কিসের? কলেজ খুলতে তো এখনও দেরি আছে তোর।

সতু জবাব দিল, তা আছে। তবু একটু আগেভাগে যাওয়াই ভাল। বলা তো যায় না কিছুই। ওদিকে আবার কি ব্যবস্থা হয়ে আছে কে জানে।

আশংকাটা জেঠাইমার মনেও উঁকিঝুঁকি মারছিল। কিছুতেই খুলে বলতে পারছিলেন না। নিজেকেই কেমন অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। সতুর কথায় এবার মনের কপাট খুলে দিলেন।

বললেন, সেই তো হয়েছে মস্ত ভাবনার কথা রে। আমিও গোড়ায় কথাটা ওভাবে তলিয়ে দেখি নি। তোর বাবারও একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ। এখন কি যে আছে তোর কপালে কে জানে।

জানতে অবশ্য বেশী দেরি হল না। যাত্রার তোড়জোড় করতে করতেই হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে চিঠি এল। লিখেছেন দয়াময় বাবুর শ্বশুর।

আশংকাই সত্য হল। দয়াময়বাবু ঝানু উকীল। আসামীকে জেলখানার একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার আগে যুদ্ধে ক্ষান্তি

দেবার মত লোক তিনি নন। শ্বশুরবাড়ির আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে সতীনাথকে যাতে একেবারে পথে বসতে হয় তার ব্যবস্থা পাকা-পাকি করে তবে তিনি ছেড়েছেন।

শ্বশুরমশায় চিঠিতে সেই কথাটাই সতুকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাকে কলকাতার বাসায় রাখবার সুবিধা তাদের হবে না। অতএব সতীনাথ যেন ছুটির পরে কলকাতায় থাকবার অন্য ব্যবস্থা করে। তার বিছানা আর বইপত্র সে যেমন বেঁধে রেখে গিয়েছে ঠিক তেমনি আছে। যে কোন দিন সন্ধ্যার পরে এসে সে যেন সেগুলো নিয়ে যায়।

মাথায় যেন বজ্র ভেঙে পড়ল সতীনাথের।

আশংকাটা যতদিন কাল্পনিক ছিল তার ভার ছিল হালকা। নিশ্চিত ভাবলেও সেটা যেন এমন ভয়াবহ মনে হয়নি। কিন্তু এখন কি হবে? কোথায় থাকবে কলকাতায়? কেমন করে পড়াশুনো চালাবে? মেস্-বোর্ডিংএ থাকবার মত সঙ্গতি কোথায়? বাবাও বিয়ের পরেই কর্মস্থলে চলে গেছেন। এ অবস্থায় কি তার কর্তব্য?

একবার ভাবল, বাবাকে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে।

আবার ভাবল, তাতে কি সমস্যার কোন সমাধান হবে? বাবার আর্থিক সামর্থ্যের কথা তো তার অজানা নয়। আই. এ. পড়বার সময়েই কলেজের মাইনে আর বইপত্রের খরচাই নিয়মিত পাঠাতে পারেন নি। মাঝে মাঝেই তাকে হাত পাততে হয়েছে মা ও জেঠাইমার যৎসামান্য সঞ্চয়ের কাছে। কলকাতার মেসে-বোর্ডিংএ থেকে কলেজের পড়ার খরচ যোগাবার সামর্থ্য তাঁর কোথায়?

তাহলে? পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হবে? সব সম্পর্ক চুকে যাবে কলেজের সঙ্গে? জীবনের সব উচ্চাশার সমাধি হবে?

দু'দিন দু'রাত নিজের মনেই অনেক ভাবল সতীনাথ। অনেক যুদ্ধ করল নিজের সঙ্গে নিজে।

সে যুদ্ধে জয়ী হল সতীনাথ। জয়ী হল তরুণ মনের দুঃসাহস।

সতীনাথ মনস্থির করে ফেলল। যেমন করে হোক কলকাতা যেয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। তারপর ভাগ্যে থাকে লেখাপড়া হবে, না থাকে হবে না।

হবেই বা না কেন? নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দেয়। ও তো নিজেই দেখেছে, ওদের কলেজেরই কত ছেলে কত প্রতিকূল অবস্থায় বিরুদ্ধ সংগ্রাম করে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ ট্যুইশনী করে, কেউ ছেলে পড়িয়ে কোন বাড়িতে থেকে, আবার কেউ বা কোন ঠাকুরবাড়িতে এক বেলা প্রসাদ পেয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। সতুর কপালে কি আর একটা কোন ব্যবস্থা জুটবে না? নিশ্চয় জুটবে।

যাত্রার দিন এল।

মা সতুর হাতে গুঁজে দিলেন সংসার-খরচের টাকা থেকে সামান্য ক'টা টাকা। চোখের জল মুছতে মুছতে বার বার বললেন, সুবিধা-সুযোগ কিছু না হলে তুই ফিরে আসিস বাবা। সেখানে না খেয়ে না দেয়ে পড়ে থেকে যেন একটা অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে তুলিস্ না। তারপর কপালে যা আছে তাই হবে।

জেঠাইমা চোখে জল ফেললেন না। গুম হয়ে বসে রইলেন ঘরের দাওয়ায়।

সতু এসে প্রণাম করে বলল আসি বড়মা।

জেঠাইমা এবারেও কোন কথা বললেন না। শুধু একটা ছোট নেকড়ার পুটুলি সতুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

সতু বলল, এটা কি বড়মা?

উদ্গত অশ্রুকে সযত্নে চেপে রেখে জেঠাইমা বললেন, কুড়িটা রূপোর টাকা আছে এতে। যত্ন করে কোঁচার খুঁটে বেঁধে নে। বিদেশ-বিভূঁয়ে শুধু হাতে যেতে নেই।

সতু হাতটা টেনে নিয়ে বলল, না বড়মা, এ টাকা আমি নেব না।

এই কুড়িটা রূপোর টাকার ইতিহাস সতু জানে। অনেক কষ্টে অনেক দিন থেকে এই টাকা কয়টা জেঠাইমা সঞ্চয় করে রেখেছেন তীর্থে যাবেন বলে। সঙ্গীর অভাবেই সে মনোবাসনা তার পূর্ণ হয় নি। সঙ্গী পেলেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়বেন মনে এই আশা।

তাই সতু টাকাটা নিতে আপত্তি করল।

মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জেঠাইমা বললেন, লেখাপড়া শিখে তোর এই বুদ্ধি হয়েছে রে সতু? ছেলের জীবন, ছেলের ভবিষ্যতের চেয়ে কি মার তীর্থ-ধর্ম বড় রে পাগল! তুই মানুষ হ, তাহলেই আমার সব তীর্থ সাঙ্গ হবে। নে, টাকাটা ভাল করে বেঁধে নে।

সেই কটিমাত্র টাকা সম্বল করেই একদিন ভোরে শেয়ালদা স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নামল সতীনাথ।

গন্তব্যস্থান বাড়ি থেকেই ভেবে এসেছিল ওর আই. এ. ক্লাসের সহপাঠী নরেশ চক্রবর্তী থাকে পটলডাঙ্গার সিটি বোর্ডিং-এ। অসম্ভব পড়ুয়ে ছাত্র নরেশ। ফোর্থ ইয়ারের পড়াটা থার্ড ইয়ারেই যাতে একবার ঝালিয়ে নেওয়া যায় আগাগোড়া সেই সদিচ্ছায় সারা গরমের ছুটিটা সে কলকাতায়ই কাটাচ্ছে, বাড়ি যায় নি।

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে সতীনাথ সিটি বোর্ডিং-এই যেয়ে উঠল।

নরেশ তখন সবে ঘুম থেকে উঠে বারান্দার রেলিং-এ ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। এমন সময় সতীনাথকে স্যুটকেস হাতে ঢুকতে দেখে সোল্লাসে বলে উঠল, আরে, সাত সকালে গরীবের ঘরে হাতির পাড়া! ব্যাপার কি হে সতীনাথ?

নরেশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই সতীনাথ বলল, আমি যে গরীব ঘরের ছেলে সে তো তুমি ভালই জান ভাই।

নরেশ হেসে বলল, গরীব না হয় ছিলে, না হয় আজও আছ, কিন্তু কাল তো আর থাকবে না বাবা। আরে ভাই, সোনার

ছেলেবেলায় গ্রামাঞ্চলে দেখেছি, বিকেলের সূর্য যখন পশ্চিম-আকাশে একটু একটু করে নামতে থাকে, নারকেল গাছের মাথায় যখন তার পড়ন্ত আলো পড়ে ঝিলমিল করে, গৃহস্থ বঁধুর মাথায় তখন আপনিতেই টনক নড়ে—জল্‌কে যাবার সময় হয়েছে। সঞ্জীববাবুও 'পালামৌ'-তে লিখেছেন, বিকেল হলেই 'পৃথিবীর রঙ-ফেরা' দেখার টান তিনি মনে মনে অনুভব করতেন। এইসব উৎকল-নন্দনেরও বোধ হয় একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ছিল যার দ্বারা ঘড়ি ছাড়াও এরা বুঝতে পারত কলে জল আসার সময় হয়েছে।

ধীরে ধীরে জল-যাত্রীদের কোলাহল মিলিয়ে গেল। বাড়িটা আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় যেয়ে দাঁড়ালাম।

টিপ্ টিপ্ করে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের মুখ আগেকার মতই মেঘের ঢাকনায় ঢাকা।

চোখে-মুখে একটু জল বুলিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার বিছানায় কাৎ হলাম। ঘুম আর আসবে না। তবু এমন জল-টিপ্-টিপ্ বর্ষায় যতটুকু আরাম ভোগ করা যায় তাই বা ছাড়ে কে!

একটু বোধ হয় তন্দ্রার মত এসেছিল। দরজায় ঠুক্‌ঠুক আওয়াজে চোখ খুললাম। আবার অতি সন্তর্পণে দরজা ঠোকার আওয়াজ হল।

বিরক্ত কণ্ঠে বললাম, কে?

—আজ্ঞে, আমি মধুবাবুকে খুঁজছি।

কণ্ঠস্বর অপরিচিত। কিন্তু নামটি আমার। বললাম, দরজা খোলাই আছে। ভিতরে আসুন।

পাল্লা দুটো খুলে গেল। ক্ষীণতনু উজ্জ্বলশ্যাম একটি কচি মুখ আঁকা পড়ল দরজার ফ্রেমে। নেহাৎই ছেলেমানুষ। বয়সে আমার চেয়ে বুঝি ছোটই হবে।

বললাম, আসুন।

জুতোজোড়া বাইরে রেখেই সে ঘরে ঢুকছিল। বললাম, জুতোটা ভিতরে এনেই রাখুন। এখানে আমরা কেউ রিপুজয়ী মহাপুরুষ নই।

জুতোজোড়া সন্তর্পনে দরজার একপাশে রেখে সে এগিয়ে এল। আমার বাঘমার্কা জাপানী মাদুরের একটা কোণ হাত দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে বললাম, বসুন।

মুখে কিছু না বলে পকেট থেকে একখানা হাত চিঠি বের করে সে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

চিঠি পড়েই সব বুঝতে পারলাম। সিট বোর্ডিং এ আমার পরিচিত একটি ভদ্রলোক থাকেন। তিনিই সতীনাথকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন ছেলেটি কলেজে পড়ে। অল্প খরচে একটু থাকবার জায়গার তার বড়ই দরকার। আমাদের এখানে যদি একটা ব্যবস্থা হয় তাহলে বড়ই উপকার হয় ছেলেটির।

চিঠি থেকে মুখ তুললাম। দুটি ভীরু চোখ সাগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, সিট অবশ্য এই ঘরেই একটা খালি আছে। কিন্তু এখানে যে রকম হাটুরে ব্যবস্থা, তাতে এখানে থেকে কি লেখাপড়া করতে পারবেন?

—এখানকার অসুবিধার কথা সবই আমি শুনেছি। কিন্তু আমি নিরুপায়। আপনি একটু আশ্রয় দিলে—

বাধা দিলাম, না না, আশ্রয় দেবার এতে কি আছে? সিট ভাড়া দিয়ে আপনি থাকবেন। বরং আপনার মত একজন রুম মেট পেলে আমি তো বর্তে যাই। জানেন বোধ হয় আমিও ছাত্র—অবশ্য মোক্তারশিপ কলেজের।

সতীনাথ কোন কথা বলল না। আমার হাসির সঙ্গে সঙ্গে নীরবে একটুখানি হাসল মাত্র।

বুঝলাম, ছেলেটি স্বল্পভাষী।

বললাম, তাহলে কবে থেকে আসছেন ?

—কবে থেকে কি আর ? আজ থেকেই। সিটি বোর্ডিং থেকে স্যুটকেসটা আর বাজার থেকে একটা মাদুর কিনে আনতে যা দেরি।

—কিন্তু আপনার বইপত্তর, বিছানা—সে সব ?

—সে সব দু'একদিনের মধ্যেই নিয়ে আসব।

—এর আগে বুঝি অন্য কোথাও ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—সেখানে বুঝি থাকবার অসুবিধা হচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

আবার খেয়াল হল, ছেলেটি স্বল্পবাক। তাই আর কথা বাড়ালাম না। বললাম, আপনি একটু বসুন তাহলে। একটু চা খাওয়া যাক। তারপর দুজনেই বেরোব আপনার জিনিষপত্র আনতে।

সতীনাথ সবিস্ময়ে বলল, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে ?

হেসে বললাম, যাব তো। আজ থেকে আপনি আমার রুম-মেট। বন্ধু। এ ফ্রেণ্ড ইন নীড ইজ এ ফ্রেণ্ড ইনডীড।

দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম।

সতীনাথের টুকিটাকি জিনিষপত্র কিনে একটু রাত করেই বাসায় ফিরলাম। আমাদের ঘরের তৃতীয় অংশীদার নরেনদা তখন তার গদি-পাতা পরিপাটি বিছানায় বসে চোখ বুঁজে মৌজ করে শট্‌কার নল টানছেন।

বললাম, নরেনদা, ইনি আমাদের নতুন রুম-মেট সতীনাথবাবু। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক একে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন।

নরেনদা হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার—নমস্কার। আসুন—বসুন। তা মশায়ের কি করা হয় ?

সতীনাথের হয়ে আমিই জবাব দিলাম, উনি এখানকার কলেজে বি. এ. পড়েন। খুব ভাল ছেলে।

নরেনদা যেন একটু দমে গেলেন। কিন্তু-কিন্তু করে বললেন, তা বেশ—তা বেশ। কিন্তু আমি ভাবছি, আমাদের এখানকার অ-ভালোর মধ্যে উনি ভাল ছেলে হয়ে থাকতে পারবেন তো!

এবারও আমিই জবাব দিলাম, অসুবিধা তো কিছুটা হবেই। সে উনি মানিয়ে নিতে পারবেন। সবই আমি ওকে খুলে বলেছি।

—সে তো বলেছেন। বলি, আমার কথাগুলো বলেছেন কি?

হেসে বললাম, সে আর বলাবলির কি আছে। থাকতে থাকতেই উনি সব দেখতে পাবেন, জানতে পারবেন।

নরেনদা এবার সশব্দে কথা বলে উঠলেন, না না, ওসব ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আমি পছন্দ করি না। উনি যখন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন তখন সবই ওর আগে থেকে জানা ভাল। শুনুন মশায়, দেখছেন বটে বেশ ফিটফাট চেহারা, রংটাও ফর্সাই বলা চলে, চুলে টেরিও কাটি, বিছানার নিচেও গদি পাতি, কিন্তু মশায় আসলে কিন্তু আমি একজন ক্ষুদে দোকানদার, তামাকের ব্যবসা করি। তাছাড়া, আমার একটা ভারী বদ অভ্যাস আছে মশায়, হরবড়ি ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানি। সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। বলি, এ সব সয়ে-টয়ে থাকতে পারবেন তো?

হেসে সতীনাথ জবাব দিল, তা পারব না কেন? আপনি তামাক খাবেন তাতে আমার অসুবিধা হবে কেন?

যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নরেনদা, তবে মশায় এখানে প্যাঁট হয়ে বসে পড়ুন। কসে পড়াশুনা করুন। কোন অসুবিধা হবে না। সব ব্যবস্থা আমরা ঠিক করে দেব। দেখুন তো মধুবাবু, ওর সিটটা ঠিক কোন্ জায়গায় দেওয়া যায়। দরজার কাছের ওই খালি সিটটায় ওর অসুবিধে হবে। একশো বার আমরা যাওয়া-আসা করব, ওর পড়ার ডিষ্টার্ব হবে। তার চেয়ে—হ্যাঁ, সেই ভাল, আমার এই সিটটাই ওকে দিচ্ছি। আমি ওখানে চলে যাই। ধরুন তো মশায় আমার বিছানাটা—

কথা শেষ না করেই তিনি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। শট্‌কাটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে বিছানার গদির একটা পাশ উঁচু করে টেনে তুললেন।

সতীনাথ বলল, না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। এই খালি সিটটাতেই আমি থাকব। আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

নরেনদা একেবারে তেড়ে উঠলেন, হবে না বললেই হল? সুবিধে-অসুবিধের আপনি কি বোঝেন মশায়? যা বলছি তাই করুন। বিছানাটা ধরে আমাকে একটু সাহায্য করুন।

নরেনদাকে আমি ইতিমধ্যেই চিনে নিয়েছি। পরের সুবিধার জন্য তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। তাই দ্বিরুক্তি না করে তিনজনে ধরে তার বিছানা ও অন্যান্য জিনিষপত্র দরজার কাছে সরিয়ে দিলাম।

দিতে দিতেই বললাম, আপনি হয় তো অবাক হয়েছেন সতীনাথ বাবু। কিন্তু নরেনদার স্বভাবই এই রকম।

সতীনাথ সপ্রসংশ কণ্ঠে বলল, সত্যি আপনি আশ্চর্য্য মানুষ নরেনদা। এই বলছিলেন এখানে আমার অসুবিধা হবে। এখন দেখছি আমিই এখানে এসে আপনার অসুবিধা ঘটালাম।

নরেনদা বললেন, কিছু না, ও কিছু না। এই সব দোকানদার ফেরিওলাদের আড্ডায় এসে অসুবিধা তো আপনার কিছু হবেই। তবু ওরই মধ্যে যতটা সুবিধে-সুযোগ করে দেওয়া যায় সেটা তো আমাদের কর্তব্য।

নরেনদার মুখে কথা হাতে কাজ। সতীনাথের কুণ্ঠিত হাত থেকে সদ্য কেনা মাদুরটা নিয়ে বিছিয়ে দিতে দিতে বললেন, আপনার বাকি বিছানা কোথায়?

সতীনাথ সসংকোচে জবাব দিল, এখন গরমের দিন, ওই মাদুরেই চলে যাবে।

—তা না হয় যাবে। কিন্তু বালিশও তো অন্তত একটা চাই।

—বালিশ আমার আছে। দু'একদিনের মধ্যেই নিয়ে আসব।

—ঠিক আছে। আপাতত তাহলে আমার এই বাড়তি বালিশটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন।

নরেনদা তার বিছানা থেকে তাকিয়া-মতন একটা ছোট বালিশ বসিয়ে দিলেন সতীনাথের মাদুরের শিওরে।

—ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কি করছেন। আপনার যে অসুবিধা হবে।

—হেঃ হেঃ তা যা বলেছেন। অসুবিধা আমার সত্যি হবে। আমার কাছে মশায় ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। যা বলব স্পষ্ট করেই বলব। ঘোর সংসারী মানুষ মশায়, পাশ-বালিশ একটা না হলে ভাল ঘুম হয় না। তাহলে কেন দিয়ে দিলাম ওটা, এই তো বলবেন। দোকানদারই হই আর তামাকের খরদারীই করি, আমিও তো মানুষ। আপনি খালি মাথায় চিৎ হয়ে থাকবেন, আর আমি পাশ বালিশ জড়িয়ে আরাম করব পাশে শুয়ে, তাও কি কখন হয় ?

নরেনদার কথার তোড়ে চুপ মেরে গিয়েছিল সতীনাথ। কেমন একটা সবিস্ময় প্রসংশার দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল নরেনদার মুখের দিকে।

তার মনের অবস্থা উপলব্ধি করে বললাম, নরেনদা আমাদের সত্যি গুণী মানুষ সতীনাথবাবু।

— তাই তো দেখছি।

—ওর আর একটা গুণের খবর তো এখনও জানেনই নাই।

—সেটা আবার কি ?

—উনি খুব ভাল বাঁশী বাজাতে পারেন।

—তাই বুঝি ?

—রাত একটু গভীর হোক, নিজ কানেই শুনতে পাবেন।

—ভারি আশ্চর্য মিল তো। তামাক থেকে একেবারে বাঁশী।

কথার পৃষ্ঠে কথার ধরতাই হিসাবেই কথা কয়টি বলেছিল সতীনাথ। কিন্তু ঠোঁট থেকে কথা কয়টি বেরিয়ে যেতেই সে বুঝতে

পারল, কথাটা লাগসই হলেও শোভন হয় নি। একটা অনিচ্ছাকৃত ইঙ্গিত যেন কথাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে। নরেনদার মনে কি সেটা বিঁধলো? তাই তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে সতীনাথ বলে উঠল, কিছু মনে করবেন না নরেনদা, কোন কিছু ভেবে আমি কথাটা বলি নি। এমনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

হেসে উঠলেন নরেনদা, আরে না না, এতে আর মনে করবার কি আছে? তাছাড়া, 'অলেহ্য' কথা তো আপনি কিছু বলেন নি। দোষ বলুন গুণ বলুন ওই ছুটোই আমার সম্বল। তামাকও নাই আবার বাঁশীও বাজাই।

একটু থেমে আবার বললেন, আর মিলের কথা বলছেন? ও যে কিসের সঙ্গে কি মেলে যায় তা কেউ বলতে পারে না। এই আমার কথাই ধরুন না। আরে মশায়, আপনাকে কি বলব, দু'চার দিনের জন্যে যখন বাড়ি যাই, সন্ধ্যের সময় হাত-মুখ ধুয়ে ঝালর-দেওয়া বালিশ সাজানো ফুল-ফোটা ধপ্‌ধপে বিছানার আসন পিঁড়ি হয়ে যখন বসি, আর সাদা মুখখানাকে একেবারে রাঙা করে আমার স্ত্রী যখন কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকে গড়গড়ায় কল্‌কেটা বসিয়ে নলটা আমার হাতে তুলে দেয়, ছেলে-মেয়ে দুটি কাছে কাছেই ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, তখন গো মশায় আমারি ভাবতে অবাক লাগে যে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা খুপ্‌চি ঘরে এক কাঁচ্চা তামাকের দর নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে খিটিমিটি করে যে লোকটা আমি কি সত্যি সেই নরেন্দ্রনাথ। অথচ মাসের পর মাস মিলেই তো যাচ্ছে। অমিল তো কিছু পাচ্ছিনা।

অনেক ক্ষণ একটানা কথা বলে নরেনদা চুপ করলেন।

একটু পরে সতীনাথ বলল, আচ্ছা নরেনদা, আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন?

—রবীন্দ্রনাথ? সে আবার কে?

—রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি? তিনি যে মস্ত বড় কবি। আমাদের দেশের গৌরব।

—আমি মশায় মুখ্‌খু মানুষ, অত সব জানব কি করে? কিন্তু সে কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো? বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছি নাকি?

—না না, আপনি খুব চমৎকার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাতেও এই রকম কথা আছে।

নরেনদা যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সাগ্রহে বললেন, সত্যি আছে নাকি? বলুন তো কি কথা আছে।

—'বাঁশি' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে। তাতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

'আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানীর কোন ভেদ নেই'

ঠিক যেন বুঝতে পারেন নি এমনি ভাবে মাথা চুলকে নরেনদা বললেন, কিন্তু কেন ভেদ নেই বলুন তো?

—কারণ কেরানী আর বাদশা ও দুই-ই একই মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

সোৎসাহে বিছানার উপর মোটা মোটা আঙুলের একটা থাপ্পড় বসিয়ে নরেনদা বলে উঠলেন, ঠিক বলেছেন মশায়, ঠিক বলেছেন। ও উজীর-ফকীর, রাজা-প্রজা সবই নামের ভুল মশায়। উজীর ভাবলেই উজীর, নইলে সব ফক্কিকার। এই আমার কথাই ধরুন না মশায়—

—আর বলতে হবে না নরেনদা, এখানেই ক্ষান্ত দিন, আমি বাধা দিলাম। বললাম, উনি তো এখানেই থাকছেন আপাতত, ও আলোচনার অনেক সময় পাবেন। আপাতত গাত্রোত্থান করুন, দক্ষিণ হস্তের কর্মটা সমাধা করে আসি।

নরেনদা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, ইস্—আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। রাতও তো বেশ হয়েছে। তাই চলুন। কি জানেন মধুবাবু, ইনি একজন লেখাপড়া জানা লোক আমাদের কাছে ছিটকে

এসে পড়েছেন, দু'চারটে জ্ঞানের কথা ওর কাছ থেকে যদি শিখে ন নি তাহলে যে বড়ই আপশোষ হবে। আমায় তো জানেনই, যাবে বলে ক অক্ষর গোমাংস।

নরেনদার কথায় কান না দিয়ে সতীনাথের দিকে চেয়ে বললাম আমাদের তো মশায় অন্নপূর্ণা পাইস হোটেলেই দু'বেলা বাঁধা বরাদ্দ আপনিও কি সেখানেই নাম লেখাবেন না কি?

সতীনাথ সলজ্জ ভাবে বলল, আপনারা যা বলবেন তাই করব তবে একটু সস্তায় যাতে হয় সেইটে একটু দেখবেন। আমার অবস্থ তো সবই আপনাকে বলেছি।

নরেনদা বলে উঠলেন, আরে মশায়, সেদিক থেকে আপনার আশংকার কোন কারণ নেই। রাধানাথ মল্লিক লেনের এই আড্ডা-খানার বাসিন্দাদের কার পকেটে যে কোন মা লক্ষ্মী বাস করেন সে দুদিন থাকলে আপনিও জানতে পারবেন। নিন জামাটা চড়িয়ে এখন চলুন।

নিচে নামতে নামতে নরেনদা বললেন, দেখুন মধুবাবু, সতীনাথবাবু আজ প্রথম এখানে এসেছেন। আজ কিন্তু খাবার পরে একটু করে রাবড়ি চড়াতে হবে পুঁটিরামের দোকান থেকে। আর সে খরচটা আমার।

পরদিন সন্ধ্যার দিকেই দয়াময়বাবুর শ্বশুরবাড়িতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল সতীনাথ।

বই-খাতাগুলো আনা একান্ত দরকার। তাছাড়া বিছানা-বালিশ যা আছে তাও আনতে হবে। নরেনদার পাশ-বালিশ মাথায় দিয়ে আর কদিন কাটানো যায়।

ট্রাম থেকে নেমে একটা গলিপথ ধরে খানিকটা এগোলেই বাড়িটা।

গলিতে পা দিয়েই মনের মধ্যে যেন সংকোচ বোধ করতে লাগল সতীনাথ। ঘটনাবহুল গত ছুটিটার আগে পর্যন্ত সে জানত—হয় তো এ বাড়িরও সবাই তাই জানত—যে নেহাৎই আশ্রিত একটি ছাত্র হিসাবেই এ-বাড়িতে সে ঠাঁই পেয়েছিল। তাই অপরিচিত বড় লোকের বাড়িতে বাস করবার স্বাভাবিক কুণ্ঠা ছাড়া আর কোন সংকোচই তার এখানে ছিল না। সহজ ভাবেই সকলের সঙ্গে সে মেলামেশা করত।

বিশেষ করে তার ছাত্রী রেবার সঙ্গে।

দয়াময়বাবুর মেয়ে রেবা। ক্লাস এইটের ছাত্রী ছিল। এখন নাইনে পড়ে।

আশ্চর্য মেয়ে রেবা। এতটা বয়স হয়েছে অথচ এখনও আপন পর বোধ হয় নি। যাকে কাছে পায় তাকেই আপনার বলে মনে করে।

অন্তত সতীনাথকে সে তো তেমনি ভাবেই গ্রহণ করেছিল একেবারে প্রথম দিন থেকেই।

শেয়ালদা স্টেশন থেকে রিক্সা করে সোজা সে হাজির হয়েছিল সার্পেন্টাইন লেনের দোতলা বাড়িটার সামনে।

গৃহস্বামী সদানন্দবাবু বাইরের ঘরেই বসে ছিলেন। প্রণাম করে তাঁর হাতে দয়াময়বাবুর চিঠিখানি দিয়েছিল সতীনাথ। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাকে সঙ্গে করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন, এই দেখ গো, রেবাদিদির মাষ্টারমশায় এসেছে। জামাই একেবারে সব ঠিক করেই পাঠিয়েছে।

অভ্যাসমত সেখানে উপস্থিত প্রণম্যদের প্রণাম করতে করতেই এক ফাঁকে একটি কিশোরী এসে সতীনাথকে প্রণাম করে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

অবাক হয়ে তার দিকে চাইতেই সদানন্দবাবু বললেন, এই তোমার ছাত্রী রেবা।

আর একবার চোখ তুলে তার দিকে চেয়েছিল সতীনাথ। দুটি চোখে সবিস্ময় কৌতুক যেন টলমল করছে।

সদানন্দবাবু বললেন, একতলার দক্ষিণের ঘরটাই ওকে ঠিকঠাক করে দাও। সেই ঘরেই ও থাকবে। ছোট হলেও বেশ নির্জন আছে ঘরটা। ওর পড়াশুনার সুবিধা হবে।

দাদুর কথার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিল রেবা। খানিক পরেই ফিরে এসে সতীনাথকে বলেছিল, আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আপনার ঘর ঠিক হয়ে গেছে।

একটু ইতস্তত করে সতীনাথ বলল, কিন্তু - আমার স্যুটকেস আর বিছানাটা যে বাইরে রয়েছে।

মিষ্টি হেসে রেবা বলল, ও। আমি হরিয়াকে দিয়ে আনিয়ে দিয়েছি। সবই আপনার ঘরে আছে। আসুন।

তার পিছু পিছু একতলার ঘরটায় যেয়ে সে ঢুকল। আশ্চর্য হয়ে দেখল, একটা সিঙ্গল তক্তপোষে তারই সতরঞ্চি জড়ানো বিছানাটা পরিপাটি করে পাতা। দক্ষিণের জানালার পাশে ছোট একটি টেবিল। তার উপরই রয়েছে স্যুটকেসটা।

সতীনাথের মুখ দিয়ে অজ্ঞাতেই বেরিয়ে গেল, আরে, এরই মধ্যে আপনি দেখছি সব একেবারে ফিটফাট করে ফেলেছেন!

মুখের উপর তর্জনী তুলে দুষ্টুমি-ভরা হাসি হেসে রেবা বলল, উহুঃ, আপনি নয়, তুমি। আমি আপনার ছাত্রী। পড়াতে বসে খালি আপনি আপনি করবেন নাকি একশো বার? তাছাড়া, বয়সেও তো আমি আপনার চেয়ে অনেকখানি ছোট।

রেবার অল্প কয়েকটি মাত্র কথায়ই কেমন যেন সহজ বোধ করেছিল সতীনাথ। বলেছিল, তা তো ঠিকই। আচ্ছা, তাই হবে।

রেবা বলল, জামা-জুতো খুলে আপনি বিশ্রাম করুন। আমি চা নিয়ে আসছি।

সতীনাথ বাধা দিয়ে বলল, না না, চা খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

আবার সেই মিষ্টি হাসি আর সকৌতুক চাউনি।

রেবা বলল, কলকাতা থাকাও তো আপনার অভ্যাস ছিল না এতদিন। ও দুটোই এক সঙ্গে অভ্যেস হয়ে যাবে। তাছাড়া, চা তো আর বিষ নয়।

চায়ের কাপটা ওর হাতে দিয়ে খাটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল রেবা। চায়ে চুমুক দিতে দিতেই সতীনাথ বলল, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বস।

—ঠিক আছে। রেবা দাঁড়িয়েই রইল।

চা খেতে খেতে আবার এক সময় চোখ তুলে চাইল সতীনাথ। পরম মমতায় দুটি চোখ ভরে নিয়ে যেন ওর চা খাওয়াই দেখছিল রেবা।

সতীনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল। বলল, চা খেয়ে আপনি টানটান হয়ে শুয়ে পড়ুন। ট্রেনে নিশ্চয়ই ঘুম হয় নি। যথাসময়ই আমি ডেকে দেব এখন। হ্যাঁ, যখন যা দরকার হয় আমাকে বলবেন। কোন রকম সংকোচ করবেন না যেন।

সংকোচ সতীনাথ করে নি। সংকোচের অবকাশই দেয়নি রেবা। পুরো একটি বছরও সে বাড়িতে কাটায় নি সে। কিন্তু যতদিন সে ছিল, চাঞ্চল্যে ও সহানুভূতিতে, সেবায় ও যত্নে, মমতায় ও দাক্ষিণ্যে রেবা যেন তাকে একেবারে ঘিরে রেখেছিল।

সেই বাড়িতেই আজ আবার সে চলেছে। রেবাও সেখানে আছে। অথচ আজ সে চলেছে নেহাৎই একজন বাইরের লোকের মত।

তেমনি আদরের সঙ্গে আজ কি সে বাড়ি তাকে গ্রহণ করবে?

রেবা কি তেমনি হাসিমুখে এসে দাঁড়াবে সামনে?

ওর বিয়ের খবর কি এরা সবাই জেনেছে? রেবাও?

জানাই তো সম্ভব!

দয়াময়বাবু যে ভাবী-জামাতা হিসেবেই সতীনাথকে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন রেবার টিউটর করে, সেটা জানতে পেরে না জানি কি ভেবেছিল রেবা?

মনে মনে সে কি দুষ্টুমির হাসি হেসেছিল একটা। অর্বাচীন দরিদ্র গ্রাম্য মানুষের অশোভন উচ্চাশার বহর দেখে?

অথবা নিদ্রাহীন গভীর রাতে আকাশের অস্তগামী চাঁদের দিকে চেয়ে অকারণেই তার চপল চোখ দুটি জলে ভরে এসেছিল?

একটা খিল্ খিল্ হাসির শব্দে চমক ভাঙল সতীনাথের। কি সব আবোল-তাবোল সে ভাবছে?

সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল, পথের পাশের একটা পানের দোকানের দরজায় আঁটা কোন সিনেমা-অভিনেত্রীর ছবির দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে কি যেন দেখিয়ে দেখিয়ে খিলখিল্ করে হাসছে দুটি ফাঁচকে ছোঁড়া।

আত্মস্থ হল সতীনাথ।

সামনের বাড়িটাই সদানন্দবাবুর।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। ডান হাতে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে যে তার সামনে এসে দাঁড়াল—কী আশ্চর্য—সে রেবা।

ওকে দেখে রেবা সশব্দে বলে উঠল, কী আশ্চর্য, আপনি! আমি আরও ভাবলাম বিয়ে করে বুঝি আমাদের একেবারে ভুলেই গেলেন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, দেখ দিদিমা, কে এসেছে?

—কে এসেছে রে রেবা?

সাগ্রহ প্রশ্নের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে সদানন্দবাবুর স্ত্রী সতীনাথকে দেখেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুধু সংক্ষেপে বললেন, ওঃ, তুমি! বস। আমি একটু কাজে ব্যস্ত আছি।

বলেই তিনি যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন পাশের ঘরে।

সতীনাথ বড়ই অপ্রস্তুত বোধ করল। নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি রেবা? আমি এসে কি অন্যায় করে ফেলেছি?

রেবাও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, অন্যায় করেছেন ঠিকই, তবে এসে

নয়, না এসে। কি জানেন মাস্টারমশায়, আপনি যে বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করে বড় হোস্টেলে যেয়ে উঠেছেন, সেটাকে এ বাড়িতে কেউই যেন ভাল মনে নিতে পারে নি। কেন বলুন তো?

সতীনাথ বিস্মিত হয়েছিল রেবার কথাগুলো শুনে। তবু সে বিস্ময় গোপন করে হেসে বলল, তোমাদের বাড়ির খবর আমি কেমন করে বলব বল? তবে একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞেস করে পারছি না। আচ্ছা রেবা, আমি বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করেছি, কলকাতার বড় হোস্টেলে উঠেছি, এসব খবর তোমরা কোথায় পেলে?

—যেমন করেই হোক পেয়েছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

—তবু?

—বাবা লিখেছেন।

—তোমার বাবা লিখেছেন এই সব কথা?

—কেন? খুব অন্যায় করেছেন কি?

কি একটা বলতে যেয়েও নিজেকে সংবরণ করে নিল সতীনাথ। রেবার সোজা প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, আচ্ছা রেবা, আমার এখানে না থাকাতেই যদি এঁরা সবাই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে তোমার দাদামশায় আমার এখানে থাকায় আপত্তি করে চিঠি লিখলেন কেন তা তো বুঝতে পারলাম না?

রেবার কণ্ঠ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। বলল, সেটাও বাবার ইচ্ছা মতই লেখা হয়েছিল।

—কারণ?

—তিনি লিখেছিলেন, একটি নববিবাহিত যুবকের সঙ্গে আমার কোন রকম ঘনিষ্ঠতা হয় এটা তিনি পছন্দ করেন না। তাই—

নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সতীনাথ। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলল, ওঃ।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপচাপ।

কিন্তু এ ভাবে বেশীক্ষণ এ বাড়িতে থাকা যে সঙ্গত নয় সেটা

অনুভব করেই সতীনাথ পরিস্থিতিটাকে লঘু করবার উদ্দেশ্যেই বলে উঠল, যাক সে সব কথা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তাছাড়া তোমাদের তো এতে খুশি হওয়াই উচিত। ঘাড় থেকে একটা বোঝা নেমে গেল—

ঘাড় বাঁকিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাকাল রেবা। দুই চোখে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল সজল বিদ্যুৎ। বিক্ষুব্ধ গলায় বলল, মানুষ মানুষের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকে এ সত্যটা বুঝি নতুন শিখেছেন মাস্টারমশায়? তা হবে। আপনি এখন বড় মানুষের জামাই হয়েছেন তো। তবে ভয় নেই, আপনার ঘাড়ে কোন দিন বোঝা হয়ে চাপতে যাব না।

বোঝা হয়ে তুমি কোন দিনই আমার ঘাড়ে চাপবে না, তুমি চিরদিনই আমার মাথায় থাকবে সুদূর স্বপ্নের আনন্দ-মুকুট হয়ে—এই একটি মাত্র সান্ত্বনার কথাই ভাবতে ভাবতে সতীনাথ সেদিন রাতে তার টিনের স্যুটকেস আর সতরঞ্চি-জড়ানো বিছানাটা নিয়ে সার্পেনটাইন লেনের সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

পথে যেতে যেতে বড় দুঃখে সতীনাথ সেদিন ভেবেছিল—মানুষ কী ভয়ংকর জীব! মফঃস্বল কোর্টের বার লাইব্রেরীতে যে দয়াময়-বাবুকে একদিন দেবস্বরূপ বলে মনে হয়েছিল, সেই লোকটিকেই আর একদিন তাদের গ্রামের বাড়িতে মনে হয়েছিল অতি সাধারণ স্বার্থপর বলে, আবার আজ এইমাত্র তার মনুষ্য-চর্ম ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করল কী এক জঘন্য হীন মূর্তি! নিজের শ্বশুর ও কন্যার কাছেও নির্বিবাদে মিথ্যাভাষণ করতে তার কোথাও এতটুকু বিবেকে বাধে নি। স্বার্থই কি তাহলে জীবনের সব? আর কিছুই কিছু নয়!

একটা গভীর মানসিক তিক্ততা নিয়েই সেদিন আড্ডায় ফিরল সতীনাথ।

বেশ খানিকটা রাত হয়েছে তখন।

নরেনদা যথারীতি দোকান থেকে ফিরে তার পুরু বিছানায় বসে বাঁ হাতে শট্‌কার নলটা ধরে নিজের মনেই গুণ গুণ করে কি একটা গৎ ভাজছিলেন।

আমিও উপুড় হয়ে পড়ে ছিলাম 'বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট' খানার উপরে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছাড়ল সতীনাথ। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে খেল।

পাশ ফিরে উঠে বসতেই চোখে পড়ল, নরেনদা মিটমিট করে হাসছেন। কি যেন একটা রহস্যের আভাষ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

এতক্ষণে মুখ খুললেন নরেনদা। গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি যে গুণী মানুষ তাতো কাল শুনেছি মধুবাবুর কাছে। কিন্তু মশায়, এতটুকু মানুষ আপনি যে এত বড় কর্রিৎকর্মা তাতো বলেন নি খুলে।

নরেনবাবুর কথার ধরনে একটু যেন ভয়-ভয় ভাবেই তার দিকে তাকাল সতীনাথ।

আবার কোন্ ছিদ্রপথে কে বিষ ঢেলেছে নরেনদার কানে কে জানে? পৃথিবীতে কাউকেই কি বিশ্বাস আছে?

বলল, কি ব্যাপার নরেনদা? আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এখুনি বুঝতে পারবেন মশায়, এখুনি বুঝতে পারবেন। দেখুন তো এ জিনিষটা কি?

বালিশের তলা থেকে একখানা খাম বের করে দুই আঙুলের ফাঁকে ধরে সকৌতুকে নরেনদা বললেন কথাগুলো।

সেদিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত সতীনাথ বলল, ওতো একখানা খাম। আমার চিঠি এসেছে বুঝি বাড়ি থেকে? কিন্তু এখানকার ঠিকানা মা জানল কেমন করে? সবে তো কাল আমি এখানে এসেছি।

—ধীরে মশায়, ধীরে। আমি মুখ্‌খু মানুষ। অত ছড়-বিছড়

প্রশ্ন করলে কি সামলাতে পারি? একে একে শুনুন। প্রথমত চিঠিটা বাড়ি থেকে আসে নি। এসেছে আপনার একেবারে খাস শ্বশুরবাড়ি থেকে?

আমি চমকে বলে উঠলাম, শ্বশুরবাড়ি!

নরেনদা অভয়দানের ভঙ্গীতে বললেন, হ্যাঁ মশায় শ্বশুরবাড়ি। দেখতে এতটুকু হলে কি হবে, জীবনের ওই মহৎ এবং বৃহৎ কর্মটি উনি ইতিমধ্যেই সমাধা করে ফেলেছেন। কেমন মশায়, ঠিক বলেছি কি না?

কি আর জবাব দেবে সতীনাথ? মাথা চুলকে কোন রকমে বলল, মানে—

—থাক, আর মানে বোঝাতে হবে না। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। চিঠিটা এসেছে সিটি বোর্ডিং-এর ঠিকানায়। বিকেলে নরেশবাবু বলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আপনাকে খুঁজতে। আপনার নাকি বন্ধু হন তিনি। তা বাসায় তো তখন আমরা তিনজনই নো-পাত্তা। দরজায় তালা। পাশের ঘরের উনি নাকি আমার এই দোকানের কথা বলায় তিনি সেখানেই চিঠিখানা দিয়ে গিয়েছেন। কেমন হল তো? না, আরও কিছু প্রশ্ন আছে?

আমি বললাম, প্রশ্ন তো, আরও একটা আছে নরেনদা।

—যথা?

—চিঠিখানা যে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সেটা বুঝলেন কেমন করে?

এবার মাথা চুলকাবার পালা নরেনদার। লজ্জিতভাবে বললেন, ওইখানে আমার একটু গলতি হয়ে গেছে মশায় সতীনাথবাবু। নিজগুণে আপনি ক্ষমা করে দেবেন। ঘোর সংসারী মানুষ তো, আঁকা-বাঁকা কাটা-কুটি-ভরা মেয়েলি হাতের ঠিকানা-লেখা খাম দেখলেই মশায় বুকের ভিতরটা কেমন কুড়্ কুড়্ করে ওঠে। তাই চিঠিখানা আমি খুলেই ফেলেছি। আরে মশায়, কেবল কি শ্বশুর

বাড়ির চিঠি। একেবারে খোদ মা-লক্ষ্মীর পত্র। এই নিন মশায়, আপনার জিনিষ আপনি বুঝে নিন।

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিল সতীনাথ।

অপরিচিত হস্তাক্ষর। সুভদ্রার প্রথম চিঠি। বাড়ির ঠিকানায়ই লেখা ছিল। কে যেন সিটি বোর্ডিংএর ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করেছে।

গলায় অভিভাবকী সুর লাগিয়ে আবার কথা বললেন নরেনদা, এ কাজটা মশায় আপনার গর্হিতই হয়েছে। সদ্য বিবাহ করেছেন। এখন তো আপনাদের সখের প্রাণ গড়ের মাঠ মশায়। পাখনা যেন সব সময় মেলাই থাকবে। তা নয় এসে অবধি বেচারীকে একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখেন নি? না হয় তিনি উচ্চশিক্ষিতা নন, গায়ের রংটা না হয় মেমসাহেবী ধাঁচের নয়, তাই বলে আপনি তাকে এমন ভাবে অবহেলা করবেন? না না, এটা মশায় আপনার অন্যায়—ভারী অন্যায়।

পরে এক সময় নিরিবিলিতে চিঠিখানা চোখের সামনে মেলে ধরেছিল সতীনাথ। নরেনদার অভিযোগগুলো সুভদ্রার চিঠির ভাষারই প্রতিধ্বনি মাত্র।

সুভদ্রা লিখেছে: 'শ্রীশ্রীচরণকমলেষু, প্রণাম পাদপদ্মে শত কোটি প্রণামান্তে নিবেদন, আপনি এখান হইতে যাইবার পর আমাকে একখানিও চিঠি লিখেন নাই। ইহা লইয়া আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই নানা কথা বলে। আপনি আমার স্বামী, দেবতা, আপনার শ্রীচরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি জানি না। আপনি ফুল-শয্যার রাতে আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। এখান হইতে যাইবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করেন নাই। যাইয়া একখানি চিঠিও লিখেন নাই। ইহাতে আমার মনে যে কিরূপ কষ্ট হয় তাহা কি আপনি বুঝেন না? আমি লেখাপড়া জানি না, আমি

দেখিতে কালো, সেই জন্যই কি আমাকে আপনার পছন্দ হয় নাই? কিন্তু আমি তাহার কি করিব? আপনি স্বামী হইয়া যদি আমাকে এরূপ অবহেলা করেন তাহা হইলে আমি কার কাছে দাঁড়াইব?'

অনেক কাটাকুটি করে অনেক ভুল বানান লিখে অনেক উঁচু-নিচু লাইন সাজিয়ে অনেক পরিশ্রমে সুভদ্রা চিঠিখানি শেষ করেছে।

সুভদ্রার প্রথম চিঠি। স্ত্রীর প্রথম পত্র। প্রিয়ার প্রথম সম্ভাষণ। অথচ চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে সতীনাথের মন তো পুলকে ভরে উঠল না। রামধনু তো লাগল না মনের আকাশে।

বরং একটা অপরিসীম বিরক্তিতে সারা মন যেন তিক্ত হয়ে গেল।

অবহেলা?

সত্যি কি সুভদ্রাকে সে অবহেলা করেছে?

তার তো মনে হয় না। সজ্ঞানে সুভদ্রার প্রতি কোনরূপ খারাপ ব্যবহার তো সে করে নি।

ফুল-শয্যার রাতে সুভদ্রার আগড়ম-বাগড়ম সব হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়ে সারাক্ষণ ওর সঙ্গে বকবক করতে সে পারে নি এ কথা ঠিক। কিন্তু যা সব প্রশ্নের ছিরি তার কি কোন জবাব দেওয়া যায়?

সতীনাথের মনে পড়ল, অনেক কথার মাঝখানে এক সময় সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা আপনাদের গাঁয়ে ডাকঘর আছে?

সতীনাথ বলেছিল, না।

সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রা বলেছিল, ছ্যা গাঁ আপনাদের।

—আপনি মাছ ধরতে পারেন বড়শি দিয়ে?

—না।

—জাম গাছে উঠতে পারেন?

—না।

—তবে নাকি আপনি খুব পণ্ডিত। আচ্ছা বলুন তো, মানুষ পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারে?

—না।

—আপনি জানেন না। পারে।

—আমি বলছি, পারে না।

—তবে যে চিঠির খামের উপর আঁকা থাকে, একটা মেয়ে দুই হাতে ফুলের মালা নিয়ে পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে, সে কি মিথ্যে? পারে—পারে—পারে। আপনি কিচ্ছু জানেন না।

এর পরে সতীনাথের পক্ষে বোবা সাজা ছাড়া আর কি উপায় ছিল? কিন্তু তাতে কি সুভদ্রাকে অবহেলা করা হল?

শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবার পর তাকে সে কোন চিঠি লেখে নি তাও ঠিক। কিন্তু সতীনাথই বা কি করবে? চিঠি লিখতে যে তার মন চায় নি। ভয়ও হয়েছে বৈ কি? চিঠি লিখলেই তো জবাব আসবে। আর তার সঙ্গে আসবে ওই সব উদ্ভট্টি প্রশ্ন আর অদ্ভুত ভাষা আর অদ্ভুততর হস্তাক্ষরের জঞ্জাল। তা নিয়ে কি করবে সতীনাথ? তাই তো সে চুপ করেই ছিল। তাই বলে সুভদ্রাকে সে অবহেলা করেছে অকারণে এ কথা মনে করে সুভদ্রা যদি কষ্ট পায়, সতীনাথ তার কি করতে পারে?

বেচারী সতীনাথ!

ভুলেও সেদিন সে বুঝতে পারে নি যে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই তার মনের গহন পথের ধাপে ধাপে তখন আঁকা পড়েছে তার কল্পলোকের মানসীর রাতুল পদচিহ্ন।

সে পদচিহ্নের সঙ্গে যে [illegible] মিলে গেছে বেদনার পায়ের চিহ্ন, একটি মমতাময়ী চঞ্চলা কিশোরী প্রায় একটি বছরের সেবায় ও সহানুভূতিতে, কৌতুকে ও লাস্যময়তায় তার অবচেতন অন্তরকে যে নিঃশেষে ভরে দিয়েছে, একটি সরলা গ্রাম্য বধূর প্রণয়বিধুর মন যে বৃথাই সে অন্তরের দুয়ারে মাথা ঠুকে ঠুকে শুধু তিক্ততার মাত্রাই বাড়িয়ে তুলছে, এ সত্যের ছায়ামাত্রও সেদিন সতীনাথের মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয় নি!

হায়রে মানুষের মন!

॥ ৫ ॥

সতীনাথকে কেন্দ্র করে যেন নতুন করে জোয়ার এল নরেনদার জীবনে। ওকে যেন তিনি নতুন চোখে দেখতে লাগলেন সেই দিন থেকে।

নরেনদার বদ্ধমূল ধারণা হল, আর্থিক অসুবিধার চাপে পড়েই সতীনাথ তার সত্যানিবাহিত জীবনের সুখ-সম্ভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। নইলে ছেলে তো সে খারাপ নয়।

আমাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, সোনার টুকরো ছেলে মশায় সতীনাথ। অথচ অবস্থার চাপে পড়ে কেমন কালিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ওর কপালটাও মশায় একটু মন্দ। নইলে ওমন সোনার চাঁদ ছেলে, তার কপালে জুটল কি না একটা কালো মুখ্খু বউ।

সঙ্গে সঙ্গেই যেন নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দেন তিনি, আর তাও বলি মশায়, ও কালো আর ধলো তো দুদিনের চোখের নেশা। দিন কাটুক, দেখবেন ও সব একাকার হয়ে গেছে। সতীনাথকেও তো সেই কথাই বলছিলাম সেদিন, 'আরে ভায়া, রেখে দাও তোমার কালো। দু' পোঁচ খাড়িমাটি টানলেই কি সুন্দরী হয় নাকি? আসল রূপ হচ্ছে তোমার মনে। মনের সেই চোখ যেদিন তোমার খুলবে, দেখবে ওই ময়লা বৌই তোমার লক্ষ্মীর মত ফুটফুট করছে। কি বলেন মধুবাবু, ঠিক কথা বলি নি?

হেসে বললাম, আমি তো দাদা, ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস, হ্যাঁ না কি করে বলি বলুন?

—আরে মশায়, তাই বলে একটা মতামতও নেই আপনার? বলি, বিয়েই না হয় করেন নি, তাই বলে বরযাত্রীও কি যান নি?

—মাপ করবেন নরেনদা, এইখানে আপনার সঙ্গে আমার মিলল না। দৈয়ের সাধ কখনও ঘোলে মেটে না।

—কি বলেন, দেব না কি তাহলে দৈয়েব অর্ডার?

—ওইটিও মাপ করতে হচ্ছে নরেনদা। দৈ খাওয়ার যা বহর দেখছি আপনাদেব দুজনের তাতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ বনে গেছে।

—কেন? আমাদের আবার কি দেখলেন আপনি?

—দেখলাম যে ও দিল্লীকা লাড্ডু। খেলেও পস্তাতে হয়, না খেলেও পস্তাতে হয়।

—কেমন?

—এই দেখুন না আপনি, লাড্ডু খেয়েও এখানে পড়ে পড়ে দিনরাত হা-হুতাশ করছেন। আর ওই দেখুন সতীনাথবাবু, খেতে না পেয়েও দিনরাত টো-টো করে বেড়াচ্ছেন কলকাতার পথে পথে।

সহানুভূতির ছোঁয়াচ লাগল এবার নরেনদার গলায়, ওর জন্য সত্যি আমার বড় দুঃখ হয় মধুবাবু। আমার কথা ছেড়ে দিন। বুড়ো-হাবড়া মানুষ, আমার আবার সুখ আর সোয়াস্তি। কিন্তু সতীনাথের এই হল মৌজের সময়। ঐ যে কি যেন বলে আপনাদের কবিতায়—মধু বসন্ত না কি। সতীনাথ সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিল একটা কবিতা।

আমি বললাম, রাত দশটা বাজে নরেনদা, ও মধু বসন্ত এখন থাক।

—অ্যাঁ, বলেন কি? দশটা বাজে? কিন্তু সতীনাথ তো এখনও ফিরল না?

—তিনি হয় তো একেবারে খেয়েই ফিরবেন। চলুন, আমরাও ও পর্ব শেষ করে আসি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেনদা উঠে পড়লেন।

এলুমিনিয়ামের বাটি দিয়ে ঢাকা-দেওয়া একটা মাটির খুড়ি হাতে নিতে নিতে বললেন, আসবার সময় দেখলাম রাবড়ি বেশ সস্তায় দিচ্ছে, তাই নিয়ে এলাম খানিকটা। সতীনাথের ভোগে আর লাগল না দেখছি।

বয়সের ও বৃত্তির ব্যবধান পেরিয়ে সতীনাথ আর নরেনদা যেন হঠাৎ পরস্পরের অনেকখানি কাছাকাছি এসে পড়েছে। সতীনাথ আজকাল তাঁর কাছে বাবু ছেড়ে ভায়ার পর্যায়ে এসে উঠেছে, আপনি থেকে তুমিতে।

দরজায় তালা লাগাতে যাব এমন সময় ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সতীনাথ।

নরেনদা বললেন, এই যে এতক্ষণে চাঁদের উদয় হল। বলি, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

দরজা খুলে তিনজনই ভিতরে ঢুকলাম।

সতীনাথ বলল, একটা টুইশনের খোঁজে গিয়েছিলাম বেলেঘাটায়।

—হল?

—না।

আমি বললাম, খাওয়া হয়েছে আপনার?

—না। এই তো ফিরছি।

—তা আর দেরী করবেন না। রাত অনেক হয়েছে। তাড়াতাড়ি হাত-মুখটা ধুয়ে নিন।

সতীনাথ ইতস্তত করে বলল, আপনারা খান নি এখনও?

কৃত্রিম রোষে উত্তর দিলেন নরেনদা, প্রশ্নটা ভালই করেছ ভায়া। তুমি রইলে বাইরে, আর আমরা ভুঁড়ি ভোজন করে আসি! বেশ!

সতীনাথ তবু বলল, আমার তো একটু দেরী হবে। এইমাত্র এলাম। আপনারা বরং খেয়ে আসুন। আমি পরে যাচ্ছি

আমি বললাম, সে হয় না। নরেনদা রাবড়ি এনেছেন দোকান থেকে। অতএব তিন জনকে এক সঙ্গেই খেতে হবে।

নরেনদার দিকে হাঁ করে খানিক চেয়ে থেকে কুঁজোর জল গড়াতে বসল সতীনাথ।

এমনি সুখ-দুঃখ হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে তিনটি প্রাণীর দিন এক রকম কেটে যাচ্ছিল।

ভালই যাচ্ছিল। আমাদের জরাজীর্ণ ঘরটাতেও যেন প্রাণের একটা ছোঁয়াচ লেগেছিল।

কিন্তু তারই তলে তলে যে এত বড় একটা ফাটল ধরেছিল, একদিনের জন্যও তা আমরা বুঝতে পারি নি। যেদিন বুঝতে পারলাম সেদিন ভয়ে ও বেদনায় একেবারে আতঙ্কে উঠলাম। এক সঙ্গে একই ঘরে থেকেও মানুষ যে মানুষ থেকে এত দূরে থাকতে পারে সে সত্য উপলব্ধি করে সেদিন আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

কিছু দিন পরের কথা।

সারাটা দুপুর নিজের ধান্দায় কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেলা প্রায় আড়াইটে নাগাদ আড্ডায় ফিরেছি।

এ সময় ঘরে কারও থাকবার কথা নয়। নরেনদা সকাল আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান সেরে দোকানে বেরিয়ে যান। দুপুরে আর আসেন না। ফেরেন সেই রাত আটটা সাড়ে আটটায়।

অথচ ঘরের শেকল খোলা। তালা নেই।

বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল। ব্যাপার কি?

দ্রুত পায়ে এগিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

জানালার দিকে মুখ করে সতীনাথ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

বললাম, কি মশায়, আজ কি কলেজ-টলেজ নেই নাকি?

তেমনি শুয়ে থেকেই সতীনাথ জবাব দিল, কলেজ আছে। তবে—

—তবে কি? শরীর ভাল আছে তো?

-হ্যাঁ, শরীর ভালই আছে

—তাহলে ?

—এমনি ভাল লাগল না, তাই চলে এলাম।

সতীনাথ উঠে বসল।

জামাটা ছেড়ে ওর দিকে চাইতেই চমকে উঠলাম। উস্কোখুস্কো চুল। মলিন বিবর্ণ মুখ।

—ব্যাপার কি ? স্নান করেন নি আজ ?

—না।

সংক্ষিপ্ত একটি 'না' বলেই ও মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, খাওয়া হয়েছে ?

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার দিকে একবার তাকিয়েই আবার চোখ নিচু করল সতীনাথ।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও খান নি ? ব্যাপার কি বলুন তো সতীনাথবাবু ? স্নান করেন নি, খান নি, কলেজ কামাই করে অসময়ে ঘরে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে ?

—হয় নি কিছুই। পকেটে পয়সা নেই, তাই—

কথা শেষ না করেই চুপ করল সতীনাথ।

—পয়সা ছিল না, সে কথা আমাদের তো বলতে পারতেন ! এক সঙ্গে থাকি, এটুকু সম্পর্ক না রাখলে কি চলে ? অন্তত নরেনদাকে—

তাড়াতাড়ি বাধা দিল সতীনাথ, না না, ঠিক তা নয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। গিয়েছিলাম নরেশের কাছে সিটি বোর্ডিংএ। যদি কিছু ধার পাই। তা হাঁটাহাটিই সার হল। নরেশ নাকি ভোর সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। তার জন্য বসে বসে এই খানিক আগেই ফিরে এসেছি।

হঠাৎ মনে হল, সতীনাথের যে এই রকম একটা অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে ও মুখে না বললেও এটা আমাদের আগেই বোঝা

উচিত ছিল। দুপুর বেলা আমাদের খাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই; যে যখন কাজকর্মের ফাঁকে সময় পাই অন্নপূর্ণা পাইস হোটেলে একটা ঢুঁ মেরে আসি। কিন্তু রাত্রিবেলা তিনজন একসঙ্গেই খেতে গিয়েছি প্রথম প্রথম। ক্রমে সতীনাথ আমাদের দল থেকে মাঝে মাঝেই ছিটকে পড়তে লাগল। কখনও বা একেবারে খেয়েই ফিরত। আবার সন্ধ্যে থেকে ঘরে থাকলেও খাবার সময় বলত, আজ আমার একটু পড়ার তাড়া আছে মধুবাবু। আপনারা দুজন খেয়ে আসুন। আমি বরং পরেই যাব।

নরেনদা মাঝে মাঝে ধমক-ধামক দিলেও গুরুতর ভাবে আমরা এ নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাই নি। সাদা মনেই যার যার কাজ কর্মে মেতে রয়েছি। সতীনাথ যে খাবার সময়ে ইচ্ছা করেই আমাদের এড়িয়ে গেছে, নিজের অবস্থা বুঝে যখন যা পেরেছে যৎসামান্য পেটে দিয়ে কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে, এ কথা আমরা ভাবতেও পারি নি।

সেদিন সবই বুঝতে পারলাম।

ওর জন্য দুঃখ হল। নিজেদের একান্ত উদাসীনতায় লজ্জিতও বোধ করতে লাগলাম।

সতীনাথের হাত ধরে আস্তে টান দিয়ে বললাম, নিন উঠুন। হোটেলের দরজা হয় তো এতক্ষণ বন্ধ হয়েই গেছে। তবু যা হোক কিছু খাবেন চলুন।

সতীনাথ বিমূঢ়ের মত বলল, যাব?

—যাবেন না তো কি এখানে না খেয়ে পড়ে থাকবেন? নিন জামাটা। চলুন।

হোটেলের দরজা খোলাই ছিল। খদ্দের পত্তর কেউ নেই। শুধু ঠাকুর আর চাকরদের খাওয়া বাকি। তারি আয়োজন চলছে।

অন্নপূর্ণা পাইস্ হোটেলের আমরা বাঁধা খদ্দের। তাই আমাকে

ঢুকতে দেখেই ঠাকুর এগিয়ে এসে বলল, অসময়ে কি মনে করে বাবু?

বললাম, এক জনের মত খাবার কি হবে ঠাকুর?

সতীনাথের দিকে চেয়ে ঠাকুর বলল, এই বাবু খাবেন বুঝি? বাবুকে তো অনেক দিন দেখি নি এখানে? দেশে গিয়েছিলেন বুঝি?

সতীনাথের দিকে তাকালাম আড় চোখে। চোখ নিচু করল ও।

ঠাকুরকে বললাম, হ্যাঁ। সারাদিন ওর খাওয়া হয় নি। যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার বড়ই ভাল হয়।

ঠাকুর রান্নাঘরের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, মাছ-তরকারী তো বাড়তি আছে বলে মনে হয় না। তবে ডাল-ভাত চারটি হতে পারে কোন রকমে।

বললাম, তাহলেই হবে। তাই দাও তাড়াতাড়ি।

ঠাকুর হাঁক দিল, ওরে রামকানাই, বাবুকে একটা ঠাঁই করে দে তো ঐ কোণে

সতীনাথকে খাইয়ে নিজের পকেট থেকে হোটেল-চার্জ দিয়ে পথে নেমে এলাম।

চলতে চলতে এক সময় সতীনাথ বলল, দেখুন মধুবাবু, একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আপনিই একদিন বলছিলেন দুপুর বেলা আপনি কি একটা কাজ করেন।

—হ্যাঁ, মেডিক্যাল ব্যাগের ক্যানভাসারি। বাড়ি থেকে বড়দা মাঝে মাঝে যৎসামান্য যে টাকা পাঠান তাতে তো এখানকার খরচ মেটে না। তাই বাড়তি কিছু উপার্জনের চেষ্টা করি।

—কিছু হয় তাতে?

—কিছু তো হয়ই মাঝে মাঝে। তবে তেমন কিছু নয়।

—আচ্ছা মধুবাবু—

—বলুন না কি বলতে চান। অত সংকোচ করছেন কেন?

—মানে, ওই রকম কোন কাজ কি আমাকে একটা জুটিয়ে দিতে পারেন ?

—ক্যানভাসারির কাজ ? তা আর না পারার কি আছে ? কোম্পানির মাল বেঁচে আপনি কমিশন পাবেন, এতে আর কার কি আপত্তি ? করবেন আপনি ?

—পেলে তো করি।

—বেশ তো, এখুনি চলুন। ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

—চলুন।

নরেশের কাছ থেকে ধার করা টাকায় আরও দিন কয়েক চলল। নরেনদার এবং আমার পকেট থেকেও প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে কিছু গেল।

পপুলার মেডিক্যাল ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ণের ছোট-বড় নানা আকারের হোমিওপ্যাথি ব্যাগ ও ক্যাশ মেমো নিয়ে কলকাতার পথে পথে বৃথাই সতীনাথ জুতোর সোল ক্ষয় করে ঘুরে বেড়াল আরও কিছুদিন।

কিন্তু হিল্লে কিছুই হল না।

অল্পাহার, অনাহার আর আত্মপীড়ণের রক্তাক্ত নখর তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হয়ে সতীনাথকে যেন চেপে ধরতে লাগল দিনের পর দিন।

তার সেই অসহনীয় অবস্থা দেখে আমরাও অসহায় বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়তে লাগলাম।

আর ঠিক সেই সংকট-কালেই পরিত্রাণের একমাত্র ভরসার সংবাদ নিয়ে এলেন নরেনদা একদিন রাত্রে।

সতীনাথ ইচ্ছা করলেই একটা ট্যুইশনী করতে পারে।

মাইনেও ভাল। মাসে পঁচিশ টাকা।

একটি মেয়েকে পড়াতে হবে।

## ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্ত সরকার নরেনদার তামাকের দোকানের একজন বাঁধা খদ্দের। নরেনদার দোকানের বাদশাহী বালাখানা না হলে তাঁর একটি সন্ধ্যাও চলবার উপায় নেই।

মস্ত বড়লোক শ্রীমন্ত সরকার।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে মস্ত বাড়ি। রাধাবাজারে মস্ত কারবার। তাছাড়া কলকাতার নানা অঞ্চলে তারও বাড়ি আছে। তা থেকে মোটা টাকা ভাড়া আসে মাসে মাসে।

নরেনদা তাঁকে অনেক দিন দেখেছেন। তাঁর কথা আমার কাছে গল্পও করেছেন অনেক দিন।

ভারি সৌখীন লোক শ্রীমন্ত সরকার। বয়স প্রায় ষাট 'ছুঁই ছুঁই'। মাথার কাঁচা পাকা চুলে পাশপাটি টেড়ি। কড়া ইস্ত্রির ডবল-ব্রেস্ট শার্ট পরেন। তাতে মুক্তো-বসানো সোনার বোতাম লাগানো। হাতে হীরের আংটি। পরণে পরিপাটি করে কুঁচনো ধুতি। পায়ে সায়েব বাড়ির লপেটা।

সন্ধ্যাবেলা রাধাবাজার থেকে ফেরবার পথে প্রায়ই তাঁর ঝকঝকে মোটরখানা এসে দাঁড়ায় নরেনদার ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের দোকানের সামনে।

মোটর-চড়া খদ্দের নরেনদার ওই একটিমাত্র সবে ধন নীলমণি। তাই গাড়ি দেখলেই নরেনদা বুঝতে পারেন, আজ তার বরাতটা ভাল।

কুঁচনো ধুতির কালো ফুলটা বাঁ হাতে ধরে গাড়ি থেকে নামেন শ্রীমন্ত সরকার।

মেজাজী গলায় বলেন, একটু খুশবো দিয়ে ভাল করে 'পাঞ্চ' করে দিও হে আজ, যাতে রোজকার চেয়ে একটু ভাল হয়।

নরেনদা অনেক দিন লক্ষ্য করেছেন, শ্রীমন্ত সরকার যখন এই ধরণের কথা বলেন, তখন তাঁর ড্রাইভার-কাম বাজার সরকার শশীনাথ কেমন যেন মুচকে মুচকে হাসে বাবুকে আড়াল করে।

কেন এমন করে হাসে লোকটা, নরেনদা ঠিক বুঝতে পারেন না। যাকগে, বুঝে তার কাজও নেই। এ-বয়াম ও-বয়াম থেকে নানা রকম তামাক বের করে শ্রীমন্ত সরকারের মনোমত 'পাঞ্চ' তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি।

সব সময়ই যে শ্রীমন্ত সরকার নিজে আসেন তা নয়। শশীনাথও আসে অনেক সময়। দোকানেও নরেনদার একটা গড়গড়া থাকে। সেইটেতেই তামাক লাগিয়ে নানা গল্প-গুজব করে। তারপর এক সময় বলে, দিন মশায় এবার পোয়াটেক বালাখানা। আজ আর যুৎ করে 'পাঞ্চ' করতে হবে না। সাদাসিদেতেই চলে যাবে।

সেদিন সন্ধ্যের পরেও শশীনাথ এসেছে তামাক নিতে।

নরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, ফি শনিবারই তো দেখি কর্তা নিজে আসেন, আজ তিনি এলেন না তো?

ফিক্ করে হেসে শশীনাথ বলল, আজ কর্তার মেজাজ ভাল নয়। তাই আসেন নি।

—কি হল আবার? অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

—আরে না মশাই, না। ও সব বড়লোকের বড় কথা মশাই, ও আপনি বুঝবেন না। দিন—তামাক দিন পোয়াটেক। আমাকে আবার সকাল সকাল ফিরতে হবে।

কেমন যেন কৌতুহল বোধ করলেন নরেনদা। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি শশীবাবু? মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে।

হেঁ-হেঁ করে কেমন এক রকম হেসে উঠল শশীনাথ। বলল, ওঃ,

আপনিও তাহলে ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা। তাছাড়া এর তো আর লুকো-ছাপি কিছু নেই। এ ফ্ল্যাটের সবাই তো জানে। আমাদের বাবুর বুঝলেন কি না একটু ইয়ের দোষ আছে।

—ইয়ের দোষ মানে? বোকার মত প্রশ্ন করলেন নরেনদা।

—ইয়ে মানে—খোটের দোষ আর কি।

—খোটের দোষ? সে আবার কি?

—খোটের দোষ জানেন না? ওটা বাবুদের 'বাঙাল' দেশের একটা টার্ম।

সুবিধা মত কথার মধ্যে দুটো-একটা ইংরেজি শব্দ চালিয়ে দেয় শশীনাথ। বড় বাড়িতে কাজ করার উপার পরিচয় ওটা।

নরেনদা বললেন, আমিও তো 'বাঙাল' দেশের মানুষ। কিন্তু কই এ রকম কোন কথা তো শুনিনি কখনও।

—আরে মশাই আপনি শুনবেন কোথা থেকে? আপনি তো আর ও পথের পথিক নন।

—কি যে আপনি বলছেন শশীবাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু খুলেই বলুন না মশায়।

—এর আর খোলাখুলির কি আছে? কি জানেন, আমাদের বাবুর একটি বাঁধা মেয়ে মানুষ আছে। বুঝলেন তো? 'কেপ্ট' আর কি?

নরেনদা সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি?

—তবে আর বলছি কি মশাই। তাই না শনিবার হলেই আপনার দোকান থেকে স্পেশাল 'পাঞ্চ' এর ফরমান হয়। তাও জানতেন না এতদিন?

সত্যি, এতদিনে অনন্ত সরকারের 'পাঞ্চ' আর শশীনাথের মুচকি হাসির রহস্যটা উদঘাটিত হল নরেনদার কাছে।

সমস্ত ব্যাপারটা একটু হজম করে নিয়ে তিনি বললেন, এতদিনে বুঝতে পারলাম। তা আজ হঠাৎ বাবুর মেজাজ খারাপ হল কেন?

—আর বলবেন না মশাই। বাবুর সে মেয়ে মানুষের আবার একটা মেয়ে আছে। সখ করে তাকে আবার ইস্কুলে দেওয়া হয়েছিল। কি না গান শিখে লেখাপড়া শিখে তিনি ভদ্দর হবেন। আরে মশাই, তাও কি কখনও হয়, না হয়েছে? আমড়া গাছে কি কখনও আম ফলে? আপনিই বলুন না?

—তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই। কিন্তু বাবুর মন খারাপের কারণটা তো বুঝলাম না।

—সেই মেয়ের একটা প্রাইভেট মাস্টার ছিল মশাই। বেচারি কি আর ভিতরের ওই সব কাণ্ড কারখানা জানত? বাইরে থেকে তো কিছু বুঝবার উপায় নেই। ভদ্র পাড়া। লোকজন সব দেখতে শুনতে ভাল। সাদা মনেই সে পড়াতে এসেছিল। তারপর ধীরে ধীরে সব জানতে পেরে দিয়েছে চম্পট। শুধু কি একবার। যে আসে সেই দুদিন পরে হাওয়া হয়ে যায়। এদিকে সেই মেয়ে মানুষেরও জিদ, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্রঘরে বিয়ে দেবে। সমাজে ওঠাবে। কাজে কাজেই বাবুর উপর তম্বি—যেখান থেকে পার মেয়ের মাস্টার এনে দাও। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে কাঁদা-কাটিতে পৌঁচেছে। তাই বাবুর আজ শনিবারটা মাটি। ফলে মেজাজ বে-শরিফ।

শশীবাবুর কাহিনী শুনতে শুনতে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল নরেনদার মনে।

আচ্ছা, এই টুইশনীটা সতীনাথকে ধরে দিলে কেমন হয়? মাসান্তে তার তো একটা হিল্লে হয় তাহলে?

কিন্তু সব জেনেশুনে সতীনাথ কি রাজী হবে এ টুইশনী করতে? হাজার হোক একটা 'প্রসের' মেয়েকে পড়ান?

এ ছাড়া সব জেনেশুনে তিনিই বা সতীনাথকে সেখানে পাঠাবেন কোন্ ভরসায়?

উঠতি বয়স সতীনাথের। তার উপর সদ্য বিবাহিত। ও দিকে

স্ত্রীর সঙ্গে মনের একটা গরমিলও হয় তো ঘটেছে। এ অবস্থায় কি ওই পংকিল আবহাওয়ার মধ্যে তাকে পাঠান উচিত হবে?

যদি এর ফলে সতীনাথের জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তখন কে দায়ী হবে সে জন্যে?

না না, কাজ নেই—কাজ নেই হাত বাড়িয়ে বিপদকে টেনে এনে।

পরক্ষণেই আবার ভাবলেন, কিন্তু এই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলাই কি সঙ্গত হবে?

শশীনাথকে বললেই হয় তো ট্যুইশনীটা সতীনাথের হয়ে যাবে। তাহলেই তার কলকাতা থাকবার ব্যবস্থা হবে। কলেজের পড়া সে চালাতে পারবে। নইলে যে তাকে না খেয়েই কলকাতা ছাড়তে হবে।

তাছাড়া, সেখানে ট্যুইশনী করতে গেলেই যে সতীনাথের একটা বিপদ ঘটবে, তার পদস্খলন হবে, তারই বা কি মানে আছে? সে তো সেখানে যাবে, পড়াবে, চলে আসবে। এর মধ্যে অত ভয় পাবার কি আছে?

—অত ভাবছেন কি মশাই চুপ করে? তামাকটা দিন তাড়াতাড়ি।

শশীনাথের তাগিদে চমক ভাঙল নরেনদার।

—হ্যাঁ, এই দিচ্ছি।

তামাক ওজন করতে করতে তিনি বললেন, আচ্ছা শশীবাবু, যে মেয়েটার কথা বললেন না, সে কি স্কুলে পড়ে?

—না না, বাড়িতেই পড়ে?

—কোন্ ক্লাসে?

—হবে সিক্স কি সেভেন ওই রকম একটা কিছু। মেয়েটার বয়স আছে মশাই। চোদ্দ-পনেরোর কম হবে না। বেশী বয়সে তো লেখাপড়া শুরু করেছে। তা আপনি এত খোঁজ করছেন কেন নরেনবাবু? নিজেই করবেন না কি ট্যুইশনীটা? করেন তো বলুন, আজই লাগিয়ে দি।

—না না, আমি ট্যুইশনী করব কি ? আমার তো মশায় পেটে বোমা মারলে 'ক' অক্ষর বেরবে না।

—তাহলে ?

—আমার জানাশুনা একটি ছেলে আছে। ভারী ভাল ছেলে। বি. এ. পড়ে কলেজে। বড্ড টানাটানিতে পড়ে গেছে—

—থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। শুধু বলুন সে রাজী কি না। ব্যস্। বাকি ব্যবস্থা সব আমার হাতে।

—মাইনে পত্তর কি রকম দেবেন ?

—সে এ বাজারের পক্ষে খুব ভাল মশাই। বুঝতেই তো পারছেন, বেশ বসালো না হলে এ টোঁপ মাছে গিলবে কেন ?

—তবু ?

—এর আগে যে ছোকরাটি ছিল সে নিত পঁচিশ টাকা। তবে বাবু এখন প্যাচে পড়ছেন। তা ও টেনেটুনে তিরিশ পর্যন্ত তোলা যাবে।

তিরিশ !

এর পরে আর ইতস্তত করেন নি নরেনদা।

প্রায় পাকা কথাই দিয়ে দিলেন শশীনাথকে। বললেন, কাল সন্ধ্যার পরে একবার আসুন। ছেলেটিকে আমি এখানেই এনে রাখব।

—ঠিক আছে। আজই আমি বাবুর কাছে কথাটা পাড়ব। কিন্তু দেখবেন মশাই, আমার মুখ যেন রক্ষা হয়।

—সে ভার আমার। আপনি দয়া করে ট্যুইশনীটা করে দিন। বেচারি বড়ই বিপাকে পড়েছে।

হাসি মুখেই ঘরে ঢুকলেন নরেনদা। হাতে একটা খাবারের ঠোঙা।

ঘরে আমি একাই ছিলাম। সতীনাথ এখনও ফেরে নি। ওর ফেরার আজকাল সময়েরও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

বললাম, কি ব্যাপার নরেনদা? একেবারে ঠোঙা হাতে প্রবেশ?

—একটা সুখবর আছে মশায় মধুবাবু!

—সুখবর?

—হ্যাঁ। সতীনাথের জন্য একটা ট্যুইশনী পাওয়া যেতে পারে।

—বলেন কি? মাইনে কত?

—সে বেশ ভাল। তিরিশ টাকা।

—তিরিশ টাকা! এ যে একটা ছোটখাট চাকরি নরেনদা!

—তাতো ঠিকই। কিন্তু একটা বিপদ হয়েছে যে।

—বিপদ আবার কি?

সব কথাই খুলে বললেন নরেনদা। তারপর প্রশ্ন করলেন, এ অবস্থায় কি করি বলুন তো মধুবাবু?

স্পষ্ট বললাম, কি আবার করবেন? ট্যুইশনীটা ঠিক করে দেবেন।

—কিন্তু—

আমি বাধা দিলাম, এর মধ্যে আর কিন্তু কিন্তু নেই। আগে ওর কলকাতায় থেকে পড়ার ব্যবস্থা তারপর অন্য কথা। তাছাড়া ওর পড়াশোনা নিয়ে কথা, কার ছেলে কার মাথা দিয়ে কি হবে?

সেই সিদ্ধান্তই মেনে নিলাম দুজন। দুর্গা বলে ঢুকে তো পড়ুক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে। আমাদের সতর্ক দৃষ্টি তো রইলই।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল সতীনাথ।

গায়ের জামা খুলে চুপচাপ বসল নিজের বিছানায়। আমাদের দিকে একবার চাইলও না ভাল করে।

আড়চোখে চেয়ে দেখি, মিটিমিটি হাসছে নরেনদা। আমি আর তাই কোন কথা পাড়লাম না। নরেনদাই বলুক ব্যাপারটা।

নরেনদাই কথা বললেন, কি হল ভায়া? একেবারে যে চুপ মেরে গেলে?

সতীনাথ নিরুত্তর।

—বলি হল কি তোমার? ট্যুইশনীর খবর-টবর কিছু হল?

বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল সতীনাথ, ও সব আমার হবে-টবে না। ভাবছি, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাব।

—সে কি ভায়া, বিরহের আগুন কি হঠাৎ একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল নাকি?

—আমার অবস্থাটা আপনারা বুঝতে পারছেন না, তাই ঠাট্টা করছেন।

নরেনদা বুঝলেন, শ্রীমানের মনের অবস্থা ভাল নয়। কথা বলবার যা ধরন হয় তো এখুনি কেঁদে ফেলবে।

তাই সোজা বলে উঠলেন, একটা ট্যুইশনী করবে?

ফ্যাল ফ্যাল্ করে তাকাল সতীনাথ।

—বল তো আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। মাইনেও ভাল। তিরিশ টাকা।

তিরিশ টাকা।

কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না সতীনাথ।

বলল, আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

—আরে না না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, ট্যুইশনী একটা আছে। এখন তুমি করবে কি না সেইটেই হল কথা।

—ট্যুইশনী আছে, অথচ আমি করব না? আপনি কি বলছেন নরেনদা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার অবস্থা তো আপনার অজানা নয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন নরেনদা।

সব শুনে খানিক গুম হয়ে বসে রইল সতীনাথ। আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবল। তারপর যেন মরীয়া হয়েই বলে উঠল, তা হোক, আপনি ঠিক করে দিন। ওই ট্যুইশনীই আমি করব। ও ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

কি জানি কেন এত কথার পরেও নরেনদা ঈষৎ আপত্তির স্বরে

বললেন, উপায় নেই তা তো বুঝতে পারছি ভায়া। কিন্তু ভাবছি শেষে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।

অধীর আগ্রহে নরেনদার সিটের কাছে এগিয়ে গেল সতীনাথ। তাঁর দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলল, দোহাই আপনার নরেনদা, ও সব ভাবনা-টাবনা রাখুন, ট্যুইশনীটা আমাকে ঠিক করে দিন, চিরদিন আপনার কেনা হয়ে থাকব আমি।

॥ ৭ ॥

আজ জীবনের এই সায়াহ্ন বেলায় দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে চোখ ফেরালে অবাক হয়ে যাই। ভাবি, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, গৃহী-সন্ন্যাসী, কত মানুষই তো দেখলাম আজ পর্যন্ত। চোখের সামনে কত ঘটনাই তো ঘটতে দেখলাম দিনের পর দিন। তাদের কিছু হয়তো বুঝেছি। কিন্তু অনেক কিছুই তো রয়ে গেল আমার বুদ্ধিগোচর জগতের সীমার বাইরে।

তবু একটা জিনিষ আমি বেশ ভাল করেই বুঝেছি যে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার মত নির্ভরের অযোগ্য বস্তু বুঝি পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কতটুকুই বা আমাদের বুদ্ধির দৌড়। বিশ্বের দুরধিগম্য রহস্যের কতটুকুই বা আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি। তবু সেই বুদ্ধির বড়াই নিয়েই অহংকারের যেন আর সীমা নেই আমাদের। কত বড় অর্বাচীনের মতই না আমরা মনে করি যে সারা দুনিয়াটাই যেন আমাদের নখ-দর্পণে আঁকা।

নইলে সতীনাথকে সরযূদের দর্জিপাড়ার বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতে পাঠাবার আগে তার ব্যক্তি-চরিত্রের পতনের আশংকাই তো বার বার আমাদিগকে কুণ্ঠিত করে তুলেছিল।

কত ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকেই তো ব্যাপারটাকে আমরা বিচার করে দেখেছিলাম। শ্রীমন্ত সরকারের মত লোকের সংস্পর্শে সতীনাথকে যেতে দেওয়া কি সমীচীন হবে? বিশেষ করে সব জেনে শুনেও সরযূর মত মেয়ের সঙ্গে শিক্ষক হিসাবেও মেলামেশা করাটা শেষ পর্যন্ত তাকে চারিত্রিক পতনের পংকে টেনে নিয়ে যাবে না তো? তার বাপ-মা আত্মীয়স্বজনই বা ব্যাপারটাকে কেমন চোখে দেখবেন?

এমনি অনেক কথাই তো সেদিন আমরা চুল-চেরা বিচার করে দেখেছিলাম।

কিন্তু হায়! তখন কি আমরা একথা একবারও ভাবতে পেরেছিলাম যে সতীনাথের চরিত্র যে ধাতু দিয়ে গড়া তাতে এ সব তীরের মুখ যতই তীক্ষ্ণ হোক তাতে সতীনাথের হৃদয় বিদ্ধ হবে না।

ভাবতে কি পেরেছিলাম যে, যে বিষ-শায়কে বিদ্ধ হয়ে সতীনাথ আজীবন ছটফট করবে তীব্র যন্ত্রণায়, সে শায়ক উদ্যত হবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক কোণ থেকে।

সেদিন তো এ সত্য আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে সতীনাথের আবাল্য সহচর শূলপানি হাত দিয়েই বিধাতা পুরুষ যে কূটকৌশল একদিন তার বক্ষ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করাবেন।

বেচারি শূলপানি!

তারই বা দোষ কি?

আমরাই তো একটি সরলপ্রাণ গ্রাম্য যুবককে নিয়ে রংস্থচ্ছলেই সরযূ-ঘটিত সংবাদটি সবিস্তারে ও সালংকারে তার কাছে বর্ণনা করতে করতে বেশ খানিকটা নির্দোষ আমোদই উপভোগ করেছিলাম।

সেদিন কি আমরা জানতাম যে, আমাদের কাছে যা খেলা-খেলা তাই একদিন সতীনাথের জীবনে মৃত্যুর অধিক অভিশাপ বহন করে আনবে?

না, কিছুই আমরা সেদিন জানতাম না। কিছুই আমরা সেদিন বুঝতে পারি নি।

শুধু আমরা কেন, কেউই পারে না। মানুষের বুদ্ধির কতটুকুই বা দৌড়?

তাই তো বলছিলাম, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার মত নির্ভরের অযোগ্য বস্তু বুঝি পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

কিন্তু সে কথা থাক। আগে সতীনাথের কথাই বলি।

শশীনাথই প্রথম দিন সতীনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সরযূদের দর্জিপাড়ার বাড়িতে।

ছোট দোতলা বাড়ি। আর পাঁচখানা বাড়ির মতই। বাইরে থেকে বৈশিষ্ট্য কিছু নজরে পড়ে না।

কিন্তু ঢুকে ঢুব বঙ্গে শান্ত পদক্ষেপে একতলার বসবার ঘর পার হয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে শ্বেত পাথর বসানো টানা বারান্দা পেরিয়ে একেবারে দাম্পদের ঘরখানায় পৌঁছুতে পৌঁছুতেই সতীনাথ লক্ষ্য করল, বেশ দামী আসবাবপত্রে বাড়িখানি সাজানো।

বসবার ঘরেই কালো পাথরের একখানি গোল টেবিলের চারধারে কালো রঙের বার্নিশ করা [illegible] চেয়ার বসানো।

পরে সতীনাথ জেনেছিল, টেবিলখানি খাঁটি পাথরের তৈরি। আর চেয়ারগুলো সব দামী মেহগেনি কাঠের।

টেবিলের ঠিক উপরেই সিলিং থেকে ঝুলছে একটা মাঝারি ঝাড়। ঘরের জানালা পথে বিচ্ছুরিত সূর্যের আলো পড়ে সেটা ঝলমল করছে।

পার হয়ে যেতে যেতে দেওয়ালে টাঙানো সোনালী ফ্রেমে বাঁধা একখানা বড় [illegible] সহসা চোখটা নামিয়ে নিল সতীনাথ।

তারপর ঐ বাড়িতে যেতে-আসতে অনেকবারই সেই ছবিখানির উপর নজর পড়েছে সতীনাথের। কিন্তু কোন দিনই সে ছবিখানির দিকে ভাল করে সে তাকাতে পারে নি।

এমন একটা অশ্লীল প্রায়-উলঙ্গ নারী মূর্তির ছবি যে কেউ যত্ন করে ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারে এ যেন সে ভাবতেই পারে না।

দোতলার টানা বারান্দা পার হবার সময় ডান দিকে যে হল ঘরটা পড়ে, প্রথম প্রথম সে ঘরের কোন কিছুই সতীনাথের চোখে পড়ে নি। দরজা-জানালাগুলো প্রায় বন্ধই ছিল। দু'একটা যা খোলা ছিল তাতে পুরু নীল পরদা ঝোলানো।

তবু সেই অদেখা ঘরের রহস্যও সেদিন সতীনাথের বিরক্ত মনকে যেন আরও গভীরতর বিরক্তিতেই ভরে দিয়েছিল।

একটা বিরক্ত বিতৃষ্ণ মন নিয়েই সতীনাথ প্রথম ঢুকল সরযুর ঘরে।

তার পড়বার ও শোবার ঘর।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সে।

আশ্চর্য একটা সংযম ও শুভ্রতা যেন ছড়িয়ে আছে সে ঘরের ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত।

এ বাড়ির অধিবাসীদের জীবনযাত্রার যেটুকু আভাষে জেনে তার জন্য নিজেকে তৈরি করেই সে এখানে এসেছে, বাড়িতে ঢুকেই নিচের বসবার ঘরে তার যে নমুনা সে প্রত্যক্ষ করেছে, আর একটি প্রায় বন্ধদুয়ার হলঘরের আধো অন্ধকারের রহস্যকে কেন্দ্র করে মুহূর্ত মধ্যেই যে কাল্পনিক বীভৎসতার ছবি তার মনের মধ্যে আঁকা হয়েই গিয়েছিল, তার তুলনায় এই ঘরখানির সজ্জা ও আবহাওয়ার এই প্রভেদ যে প্রথম দৃষ্টিতে যেন বিশ্বাসই করা যায় না যে এটাও এই বাড়িরই একটি অংশ।

ঘরখানি ছোট।

একপাশে একটি সাধারণ তক্তপোষে একটি ধপধপে সাদা শুভ্র বিছানা পাতা। প্রায় জানালা ঘেঁসে একটি ছোট টেবিল। তাতে খাতা-পেন্সিল-কলম ও দু'একখানি বই। মুখোমুখি দুখানি চেয়ার। পাশেই একটা কালো রঙের শেলফে কিছু বইপত্র পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা। তক্তপোষের মাথার দিকে একটি ডেসিং-টেবিল। পিতলের ফুলদানিতে সদ্য তোলা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। এক কোণে একটি ছোট ধূপদানি। ধূপের সুরভিতে সারা ঘর আমোদিত।

সতীনাথ শুনেছিল, সরযু স্কুলে যায় না, বাড়িতেই পড়ে ক্লাস সেভেনের স্ট্যাণ্ডার্ডে। তবে সে তুলনায় তার বয়স একটু বেশী। তবু কতই বা আর বয়স হবে? চোদ্দ, পনের, বড় জোর ষোল বছর।

সতীনাথ ভেবে অবাক হয়, যে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ হচ্ছে সরযু তাতে এই অল্প বয়সেই মনের এই শুচিতা ও সুরুচির শিক্ষা ও পেল কোথায়? না কি এই কিশোরী মেয়ের মনের গঠন ও রুচির শুভ্রতার উপরে আর কারও প্রভাব রয়েছে?

যদি থাকে তবে সে কার? সরযুর মায়ের কি?

সরযুর মায়ের প্রসঙ্গ মনে আসতেই নতুন করে আবার বিরক্তিতে ভরে উঠল সতীনাথের মন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কথা বলল শশীনাথ, এই ঘরেই সরযুদিদি থাকে। এই ঘরেই তাকে পড়াবেন আপনি। তাকে তো ঘরে দেখছি নে। আপনি বসুন এই চেয়ারটায়। আমি এখুনি তাকে ডেকে আনছি।

শশীনাথ ঘর থেকে চলে গেল।

চেয়ারের দিকে এগিয়ে না যেয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই ঘরের চারদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সতীনাথ।

সদ্য হোয়াইট-ওয়াশ করা দেয়াল ঝকঝক করছে। কোথাও একটুকু দাগ নেই, একটা ঝুলকালি নেই। ড্রেসিং-টেবিলের ঠিক উপরে টাঙানো আধবয়সী একটি ভদ্রলোকের ফটো ছাড়া সারা ঘরে আর কোন ছবি নেই।

ছবিটার দিকে ভাল করে তাকাল সতীনাথ।

কার এ ছবি? শ্রীমন্ত সরকার মশায়ের কি?

দ্রুতগামী কালো মেঘের মতই সতীনাথের মনের প্রফুল্লতার চাঁদকে আবার ঢেকে ফেলল শ্রীমন্ত সরকারের নাম।

ঘরে ঢুকল শশীনাথ। পিছনে সরযু

শশীনাথ বলল, এই তোমার নতুন মাস্টার সরযুদিদি। আজ থেকে ইনিই তোমাকে পড়াবেন। খুব ভাল ছেলে। কলেজে পড়েন।

মুখ ফেরাতেই সরযুকে দেখল সতীনাথ।

ঘরের দেবপূজার পরিবেশ যেন পূজারিণীকে দেখতে পেল।

সদ্য স্নান করে এসেছে সরযু। একরাশ ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়ানো। একখানা কালো পাড় সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরণে। দুটি টানা ভ্রূর ঠিক মাঝখানে একটি চন্দনের ফোঁটা।

ঠাকুর ঘর থেকে কি এইমাত্র বেরিয়ে এল সরযু?

সরযু ততক্ষণে হেঁট হয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করেছে সতীনাথকে।

সতীনাথের অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ।

সরযুকে সে পড়াতে এসেছে। সে তার শিক্ষক। প্রণম্যও বটে। ছাত্রী তাকে প্রণাম করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তবু সৌখিন বড়লোকের এক [illegible] যে [illegible] কন্যার কাছে লেখাপড়াটা নামেই, বরং খেয়াল-খুশি ছাড়া আর কিছু না হওয়াই স্বাভাবিক, তবু তার থেকে এমন দাক্ষিণ্য কোনো শিক্ষকের এত বড় পাওনার জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না সতীনাথ।

সে তাই হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হাত তুলে একটা আশীর্বাদের ভাষা উচ্চারণ করতেও যেন ভুলে গেল।

প্রণাম শেষ করে একখানা চেয়ার একটু টেনে দিয়ে সরযু বলল, আপনি বসুন মাস্টারমশায়।

শশীনাথ তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেছিল শুধু মাস্টার। কিন্তু সরযু তাকে মাস্টারমশায় বলেই সম্বোধন করল। এটুকু পার্থক্যও সতীনাথের কানকে এড়াল না।

চেয়ারটা আর একটু ঘুরিয়ে নিয়ে টেবিলের দিকে মুখ করে সে বসে পড়ল।

সরযু দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, শশীদা কি একটু বসবেন?

শশীনাথ সসম্ভ্রমে বলল, না দিদি, এখন আর বসব না। তোমরা পড়াশুনা কর। আমি যাই, তাড়াতাড়ি বাবুকে খবরটা দেই গে।

শশীনাথ যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও একবার ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আপনি একা ফিরে যেতে পারবেন তো মাস্টারমশাই?

সতীনাথ মৃদু হেসে বলল, তা পারব।

শশীনাথ চলে গেল।

সতীনাথ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল, সরযু গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে ধীর গলায় বলল, কি বই বের করব?

চেয়ারে বসতে বসতেই সতীনাথ বলল, ইংরেজি আর অংকের বই বের কর।

তারপর একটানা প্রায় দুঘণ্টা ধরে বীজগণিতের ফরমুলা আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের রীতি-নীতি বুঝিয়ে সতীনাথ যখন সেদিনকার মত পাঠ সাঙ্গ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল তখন দুটি ভীরু চোখ তুলে সরযু প্রশ্ন করল, আপনি আবার কবে আসবেন?

—কেন? কাল।

—কখন?

—বিকেলেই আসব। তবে তোমার যদি সুবিধা হয় আমি সন্ধ্যে বেলাও আসতে পারি। আমার তাতে—

মাঝপথেই তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল সরযু, না না, সন্ধ্যে বেলায় আপনি আসবেন না মাস্টারমশায়।

সরযুর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সতীনাথ।

তার সন্ধ্যেবেলায় পড়াতে আসার কথা শুনেই কেন এমন ভয়ার্ত হয়ে উঠল সরযুর কণ্ঠস্বর?

একটু চিন্তা করতেই অবশ্য সবই সে বুঝতে পারল।

দর্জিপাড়ার এই বাড়ির মালিক শ্রীমন্ত সরকার। সরযু তার রক্ষিতার মেয়ে। হয়তো এই বাড়িতেই সরকার মশায়ের সান্ধ্য আসর বসে। তাই সন্ধ্যার পরে সতীনাথের এ বাড়িতে আসার কথায় আঁতকে উঠেছে সরযু। ভয়ার্ত কণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছে।

তাই এ-বাড়ির বাইরের ঘরের দেয়ালে প্রায়-উলঙ্গ নারী মূর্তির

ছবি মোটেই বেমানান নয়। তাই এ বাড়ির প্রকাণ্ড হলঘর সারা দিনমান বন্ধই পড়ে থাকে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই একে একে দরজা জানালা সব খুলে যায়। দেয়ালগিরিতে একটার পর একটা আলো জ্বলে। বড় বড় সব ঝাড়-লণ্ঠণের আতস কাঁচে সে আলো বিম্বিত-প্রতিবিম্বিত হয়। মখমলের গদীর উপর তাকিয়া পড়ে এখানে-ওখানে। বাদশাহী আলবোলায় সুগন্ধী তামাকের কল্‌কেয় আগুন জ্বালায় খানসামা। রূপোর ট্রেতে টলমল করে রঙিণ পাণীয়। মাইফেল জমে ওঠে রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে।

অবশ্য পরে সতীনাথ জেনেছিল যে তার এ সব অনুমান সত্য নয়।

দর্জিপাড়ার এ বাড়ির নীল পর্দাঢাকা হলঘর যে আজকাল দিন আর রাত সব সময়ই ওই রকম বন্ধ থাকে, সে খবর সতীনাথ একদিন নরেনদার কাছ থেকেই জেনেছিল পরে।

আর নরেনদা জেনেছিলেন শ্রীমন্ত সরকারের বাজার সরকার শশীনাথের কাছ থেকে।

প্রথম দিন ট্যুইশনী থেকে ফিরে এসেই সরযূদের বাড়ির গল্প করেছিল সতীনাথ আমাদের কাছে।

যদিও সে-গল্পে সরযুর কথাই ছিল বেশী, তবু কথাপ্রসঙ্গে সে বসবার ঘরের উলঙ্গ নারীমূর্তি আর ডাইনের প্রায় বন্ধ হলঘরের কথাও উল্লেখ করেছিল।

কথাটা শোনা অবধি নরেনদার মনটা সর্বদাই কেমন যেন খচ্‌ খচ্‌ করত।

একদিন সতীনাথের অনুপস্থিতিতে তিনি কথাটা আমাকে বললেন, দেখুন মধুবাবু, সতীনাথের নেহাৎ দরকার বলেই এ ট্যুইশনীটা ওকে ঠিক করে দিয়েছি। নইলে আমার মশায় কিছুতেই মন সরছিল না। কিন্তু এখন দেখছি কাজটা মোটেই ভাল করিনি। ও লোকটা যে ওই বাড়িতেই অত বড় একটা ধিঙ্গি মেয়ের একেবারে নাকের সামনে এ সব বেলেল্লাপনা করে সেটা তো মশায় আমি ভাবতেই পারি নি।

আর তোকেও বলিহারী। আরে বাবা, আমোদ-ফূর্তি করবি একটু রেখে-ঢেকে কর। তা নয় একেবারে ওই বাড়িতেই—এত বড় একটা বয়স্থা মেয়ের সামনে!

কিন্তু নরেনদার এ আশংকা যে সত্যি অমূলক, শ্রীমন্ত সরকার যে সত্যি এতখানি চোখকানকাটা নন, সে তথ্য ফিকির-ফান্দ করে তিনিই জেনে নিয়েছিলেন শশীনাথের কাছ থেকে।

সেদিনও নরেনদার দোকানে তামাক কিনতে এসেছিল শশীনাথ। নরেনদা তাকে আদর করে বসিয়ে বেশ রসিয়ে এক ছিলিম তামাক সেজে নলটা তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, তা শশীবাবু, সতীনাথ আমাদের পড়াচ্ছে কেমন? বলি তার চাকরিটা থাকবে তো?

হেসে শশীনাথ বলল, সে ভয় করবেন না নরেনবাবু, এ মাস্টারের চাকরি একেবারে আঠাবো আনা পাকা।

—বলেন কি? কি করে বুঝলেন?

—বুঝি সব হাব ভাব দেখে। আপনাদের এ ছোকরা মশাই পড়ায় খুব ভাল। সরযূদিদি তো এই ক'দিনেই মাস্টারের একেবারে বশ হয়ে গেছে। বাবুরও তাই আজকাল মেজাজ বেশ শরীফ তা থেকেই সব বুঝতে পারি আর কি। দেখছেন না, তামাকের পরিমাণ কেমন বেড়ে গেছে আজকাল!

সুযোগ বুঝে এবার কথাটা পাড়লেন নরেনদা। বললেন, আচ্ছা শশীবাবু একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?

—আরে না না, আপনি অসংকোচে বলুন।

—আপনাদের কর্তামশায় তো শুনেছি লোক খুব ভাল। বুদ্ধি বিবেচনাও আছে। অথচ তিনি এ রকম একটা অবিবেচকের মত কাজ করছেন কেমন করে আমি তো ভেবে পাই না।

—আপনার কথা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নরেনবাবু একটু খুলে বলুন তো ব্যাপারটা কি।

খুলেই বললেন নরেনদা, দেখুন, তিনি বড়লোক মানুষ, অঢেল টাকা আছে, মনে সখ আছে, আমোদ-ফূর্তি করবেন, মেয়েমানুষ রাখবেন, তাতে কারও কিছু বলবার নেই। কিন্তু বাড়িতে এত বড় একটা বয়স্থা মেয়ে থাকতে তার সামনে সেই বাড়িতেই তার মাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করা, এটা কোন দেশী ব্যবস্থা মশায়?

শশীবাবু যেন আকাশ থেকে পড়ল। সবিস্ময়ে বলে উঠল, ওই দেখো, আরে এ সব বাজে কথা আপনার কানে তুলেছে কে? ওই মাস্টার ছোকরা বুঝি?

—হ্যাঁ, সেই বলেছে। আর যা সত্যি তাই বলেছে।

—না, সে যা বলেছে তা ঠিক নয়।

—মানে?

—মানে আমাদের বাবুর এখনও এতটা ভীমরতি হয় নি যে, যে মেয়েকে নিজের মেয়ের মত করে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, গান-বাজনা শেখাচ্ছেন, তার চোখের সামনে সেই বাড়িতে বসেই তার মাকে নিয়ে রাতভোর ফূর্তি করবেন। আপনি যা শুনেছেন সব স্রেফ বাজে কথা।

—সত্যি বলছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলছি। রাতের ফূর্তিটার জন্যই দেখে শুনে ও পাড়াতে ওই বাড়িখানা বাবু কিনেছিলেন। এক কালে ওখানেই তিনি রাত কাটাতেন তাও ঠিক। মাইফেল তখন ওই বাড়িতেই বসত সেটাও ঠিক। কিন্তু মেয়েটি বড় হবার পর থেকেই সে ব্যবস্থা তিনি নিজে থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন ও বাড়িতে শুধু মা আর মেয়েই থাকে। বাবু নিজে কখনো ভুলেও ও বাড়িতে পা দেন না।

—বলেন কি শশীবাবু?

—বাবু আমাদের সৌখীন মানুষ, কিন্তু অবিবেচকও নন, অমানুষও নন। ফূর্তি তিনি এখনও করেন, খুবই করেন। কিন্তু তার জন্যে তার খড়দতে বাগানবাড়ি আছে। দরকার বোধ করলে দর্জিপাড়ায়

তিনি গাড়ি পাঠিয়ে দেন। ও-বাড়ির কর্ত্রী সেই গাড়িতে চেপে শটান খড়দ'র বাগানবাড়িতে চলে যান। কিন্তু বাবু নিজে কখনও ও-বাড়ি-মুখো হন না।

খুশি মনেই সেদিন খবরটা আমাদের শুনিয়েছিলেন নরেনদা। হাসিমুখে বলেছিলেন, নির্ভয়ে তুমি ও-বাড়ির ট্যুইশনী চালিয়ে যাও সতীনাথ। তোমার কাজ ওখানে পাকা হল, আমরাও এদিকে নিশ্চিন্ত হলাম। সরকারমশায় সত্যি বনেদী বড়লোক। তাঁর আশ্রয়ে যতদিন আছ তোমার কোন ভয় নেই ভায়া।

কিন্তু সে সব আরও কিছুদিন পরের কথা।

[illegible] দিন থেকে রোজ সকালেই সে গবযুকে পড়াতে যাবে, এই ব্যবস্থা পাকা করেই সতীনাথ সেদিন দর্জিপাড়ার সেই দোতলা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল।

আর পথে যেতে যেতে বার বারই সবযব কথাই সে ভাবছিল।

মেয়েটির সম্বন্ধে যেটুকু সে শুনেছে, তার জীবনযাত্রার যে পঙ্কিল আবহাওয়ার খবর সে জেনেছে, তাতে এই একটিমাত্র সকালের পরিচয়েই সে বিস্মিত হয়েছে যতটা, মেয়েটির জন্য করুণায় সহানুভূতিতে তার অন্তর বিগলিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

ভাবতে ভাবতেই রাধানাথ মল্লিক লেনের আড্ডায় ফিরল সতীনাথ।

তালা খুলে ঘরে ঢুকল।

বিছানার উপর দু'খানা চিঠি পড়ে আছে। দু'খানা খাম।

ঝুঁকে পড়ে তাড়াতাড়ি খাম দু'খানা তুলে নিল সতীনাথ।

বাবার আর শ্বশুরের চিঠি।

বাবার চিঠিখানাই আগে খুলল।

বাবা লিখেছেন কলিকাতা যাওয়া অবধি কোন চিঠিই তুমি আমাকে লেখ নাই। এমন কি তুমি যে কলিকাতা গিয়াছ সে

খবরটা পর্যন্ত তুমি আমাকে জানাও নাই। তোমার মাতা-ঠাকুরাণীর চিঠিতেই আমি সমস্ত অবগত হইয়াছি। আমি জানি তোমার প্রতি আমি অন্যায় করিয়াছি। এ সময়ে এ ভাবে তোমার বিবাহ না দিলে দয়াময়বাবুর আনুকূল্যে তুমি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ অবশ্যই পাইতে। তাই আমার উপর তোমার রাগ বা অভিমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে জন্য তোমাকে আমি দোষ দিতেছি না। তথাপি নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়াও একটি কথা তোমাকে না লিখিয়া পারিলাম না। জীবনে বড় হওয়ার চেয়েও মানুষ হওয়াটাই বড় কথা, ইহা নিশ্চিত জানিও। যাহা হউক, তুমি বর্তমানে কি করিতেছ, কলিকাতায় পড়াশুনা চালাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলে কি না জানাইতে অন্যথা করিও না। টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইলে লিখিও, যথাসাধ্য পাঠাইতে চেষ্টা করিব।

বাবার চিঠিখানি পড়ে লজ্জায়, অনুশোচনায় সমরনাথ যেন একেবারে মাটিতে মিশে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তার সম্বন্ধে বাবা এ কী ভেবে বসেছেন! বাবার উপর তার যে কোন রাগ বা অভিমান নেই, এ কথা সে কেমন করে বোঝাবে?

অবশ্য আজ পর্যন্ত বাবাকে সে কোন চিঠি লেখে নি এ কথা ঠিক। এতে তাঁর পক্ষে দুঃখিত হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এতদিন বাবাকে চিঠিতে সে কি লিখত? লিখবার মত সংবাদ কি ছিল? কলকাতার বিপুল জনস্রোতে আশ্রয়হীন তৃণখণ্ডের মত সে চরম দুর্বিপাকের দিকে ভেসে চলেছে, এ কথা জানিয়ে কি বাবাকে চিঠি লেখা যায়? যায় না। আর যায় না বলেই তো সে চুপ করে ছিল এতদিন।

কিন্তু আজই তো সে বাবাকে চিঠি লিখত। আজ যে লিখবার মত খবর আছে তার হাতে। আশ্রয় সে পেয়েছে। প্রতি মাসে ত্রিশ টাকার আশ্রয়। কলকাতায় পাঠ-বৈতরণীর পারানির কড়ি। আজ সে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত।

তাই তো আসতে আসতে ইউনিভার্সিটি পোষ্ট [illegible] থেকে সে পোস্টকার্ডও কিনে এনেছে।

এখনই চিঠি লিখবে। মাকে—বাবাকে।

কিন্তু তার আগে অপর চিঠিখানাও তো পড়তে হবে।

একান্ত অনাগ্রহভরেই খামখানা ছিঁড়ল সতীনাথ।

কি আর থাকবে ও চিঠিতে? হয় তো সুভদ্রার সেই নাকে কাঁদুনি, আর নয় তো শ্বশুর মশায়ের দুটো উপদেশামৃত।

না, সে সব শোনবার মত মনের অবস্থা এখন সতীনাথের নেই। নিজের চেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সুযোগ সে রচনা করেছে এই নির্বান্ধব মহানগরীতে, সে শুভ খবর মাকে, বড়মাকে আর বাবাকে আগে জানাতে হবে। না জানি তার জন্য কত দুর্ভাবনাতেই তাদের দিনগুলি কাটছে!

তবু একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে চিঠিখানা পড়ল সতীনাথ।

সুভদ্রা নয়, শ্বশুরই লিখেছেন আশা করি তুমি কুশলেই আছ। সামনেই আশ্বিন মাস। পূজা উপলক্ষ্যে তোমার কলেজ ছুটি হইবে। কি নাগাদ তুমি বাড়ি আসিবে জানাইও। আমি স্বয়ং যাইয়া তোমাকে আমাদের এখানে লইয়া আসিব। সুভদ্রাও হয় তো ইতিমধ্যে তোমাকে এ বিষয়ে চিঠি লিখিয়াছে।

না—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সুভদ্রা সতীনাথকে দ্বিতীয় কোন পত্র লেখে নি। তার প্রথম পত্রের কোন জবাব সে দেয় নি। হয় তো সেই জন্যই আর কোন চিঠি লিখতে সে ভরসা পায় নি। কিংবা হয় তো অভিমান বশেই চিঠি লিখতে তার হাত ওঠে নি।

একটি পল্লী-বালিকার অভিমানক্ষুব্ধ বেদনাহত ম্লান মুখ মুহূর্তের জন্য সতীনাথের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, সামনেই আশ্বিন মাস। তাদের বাড়ির সামনের বড় আমগাছটার উপর দিয়ে এখন শরতের সোনা রোদ্দুর রোজ ভোরে উঠোনে এসে পরে। সারা রাত টুপটাপ শিশিরে ভেজা

কাঁঠালগাছটার পাতাগুলো সেই রোদ্দুর লেগে ঝিলমিল করে। তার পড়ার ঘরের সামনে শিউলিগাছের তলাটা সাদা সাদা ফুলে একেবারে ছেয়ে যায়।

আরও মনে পড়ল, নিরামিষ রান্নাঘরের উনুন দুটোকে আরও পরিষ্কার করে লেপেপুছে বড়মা কড়াই ভরা নারকেল নাড়ুর পাক দিচ্ছেন। জ্বলন্ত কাঠের তাতে এই আশ্বিন মাসেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মা রান্নাঘরের পাট সারবার ফাঁকে ফাঁকে এসে তাঁকে এটা-ওটা সাহায্য করছেন। গুড় জ্বালানোর চমৎকার একটা নেশা ধরা গন্ধে সারা বাড়িটা যেন ম ম করছে।

সব কথা মনে পড়তেই সতীনাথের মনটা গুমড়ে উঠল।

পূজা আসছে। ছুটিও হবে। কিন্তু তার তো এবার বাড়ি যাওয়া হবে না।

যাবার উপায় নেই।

একে তো হাতে টাকা নেই। এক মাস না পড়ালে টাকা আসবেও না হাতে। ততদিন এখানে থাকতে হবে এক রকম চালিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু বাড়ি যাওয়া কোন মতেই হবে না।

তাছাড়া, এ সময় বাড়ি গেলেই হয় তো শ্বশুরবাড়িও যেতে হবে। আবার সারা রাত সুভদ্রার সঙ্গে অর্থহীন বকর-বকর করতে হবে, নয় তো ঘুমের ভান করে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সত্যি ঘুমিয়ে পড়বে। আর সেই ঘুমের ঘোরেই কখন এক সময়ে একটি অভিমানক্ষুব্ধ কিশোরী বধূকে সে তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে, আর হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে নিজেকে সেই অসহায় বন্দী অবস্থায় দেখে আত্মধিক্কারে নিজেকে নিজে ক্ষতবিক্ষত করবে।

কল্পনায়ও নিজেকে সেই অবস্থায় স্থাপন করে সতীনাথ যেন ভয়ে আঁতকে উঠল।

না না, এ সময়ে বাড়ি যাওয়া তার হবে না। এখানেই সে ছুটিটা

কাটাবে। সামনেই সরযুর পরীক্ষা। এই মাসটা ভাল করে নিয়মিত না পড়ালে তার প্রতি যে অবিচার করা হবে। বেচারি সরযু! তাকে যে পাশ করতেই হবে। বড় হতেই হবে। নিজেকে উদ্ধার করতে হবে এই আকণ্ঠ পঙ্ক-কুণ্ড থেকে। তাকে ঘিরে তার মায়ের মনে যে অনেক সাধ—অনেক স্বপ্ন। সে স্বপ্ন যে তাকে সফল করতেই হবে।

সতীনাথ মনস্থির করে ফেলল।

মাকে লিখল, ত্রিশ টাকার একটা ট্যুইশনী সে পেয়েছে। কাজেই পূজোয় এবার তার বাড়ি যাওয়া হবে না। তাঁরা যেন কোন রকম চিন্তা না করেন।

ট্যুইশনীর স্বরূপটা অবশ্য সে চিঠিতে উদ্ঘাটিত করল না।

কেনই বা করবে?

সে পড়াবে, টাকা নেবে। কাকে পড়াবে, আর কার টাকা নেবে—সে ভাবনা দিয়ে তার কি দরকার? টাকার উপরে তো আর শ্রীমন্ত সরকারের হাতের ছাপ থাকবে না?

শ্বশুরমশায়কে সে ইচ্ছে করেই কোন কিছু লিখল না। তাঁর চিঠিখানা বিছানার তলায় সতরঞ্চির নিচে রেখে দিল। যেন ও পাটটাকেই চাপা দিতে চাইল মনের তলায়।

## ॥ ৮ ॥

পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য-পরিক্রমার পথে আবার একটি শরৎ ঋতুর আবির্ভাব ঘটল।

রাধানাথ মল্লিক লেনের ইট-বেরকরা চুনবালিখসা আধভাঙা জীর্ণ বাড়িটার দক্ষিণের একটি খোলা জানালা-পথে কোন ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে সেই শরতের একফালি সোনালী রোদ্দুর কেমন করে যেন একটি ঘরের এক কোণে কিছুটা সোনার গুড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে।

সেই সোনার গুড়ো মুখে হাতে মাখিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে খোলা জানালা-পথে পূব দক্ষিণ আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল সতীনাথ।

অকারণ পুলকেই মনটা যেন তার ভরে উঠেছে।

চেয়ে চেয়ে সে দেখছিল, দূরের একটা বাড়ির কার্নিশে একটা নাম-না-জানা ফুলের গাছে একরাশ ফুল যেন হাসি হয়ে ফুটে রয়েছে।

ওই গাছটিকে কেউ লাগায় নি। কেউ যত্ন করে নি। হয়তো কোন নীড় ফেরা পাখির ঠোঁট থেকে স্খলিত হয়ে অকস্মাৎ একটা পুষ্প-বীজ ওখানে পড়েছিল। সেই বীজ ক্রমে অংকুরে পরিণত হল। অংকুর থেকে গাছ। গাছ থেকে ফুল। নবাগত সোনালী শরৎকে সে যেন সাদর অভ্যর্থনা নিবেদন করছে ফুলের ভাষা দিয়ে।

সেই পুষ্পরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে সতীনাথও বুঝি আপন মনে কি একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে শরতেরই স্তবগান করছিল।

এমন সময় দরজার কাছে মুখ বাড়াল একতলার রাধানাথ ভাড়ী। হাত বাড়িয়ে একখানা খাম এগিয়ে দিয়ে হাসি মুখে বলল, আপনার চিঠি মাস্টারবাবু। নরেনবাবু দিলেন।

এ বাড়িতে প্রায় সবাই আজকাল সতীনাথকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। পণ্ডিতজন বিবেচনা করে সমীহ করে চলে।

খামখানা হাতে নিয়ে উপরের ঠিকানাটার উপর চোখ পড়তেই সকাল বেলাকার সোনালী সুরটি যেন অকস্মাৎ কেটে গেল। গভীর বিরক্তিতে ভরে গেল সতীনাথের মন।

সুভদ্রার চিঠি।

আর সুভদ্রার চিঠি মানেই হাস্যকর বর্ণাশুদ্ধি আর অসংস্কৃত সংস্কারের মাধ্যমে অসংযত ভাববিলাস আর রুচিবিহীন বাক-ভঙ্গীর এক অসহনীয় জঞ্জাল।

জীবনে এর প্রথম পত্রেই সতীনাথ সে জঞ্জালের স্বরূপ পরিচয় পেয়েছে।

চিঠি নয়, প্রিয়-সম্ভাষণ নয়, সে যেন এক বিকৃতদর্শন কিম্ভুত সরীসৃপ—অগণিত কুৎসিৎ পদক্ষেপে লেলিহ জিহ্বা বিস্তার করে তার মনের উপর দিয়ে শির শির করে চলে গিয়েছিল।

এক টানে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল সতীনাথ।

সুভদ্রারই চিঠি।

দর্শনমাত্রেই নতুন করে বিরক্তি বোধ করল সতীনাথ। চিঠি লেখবার একখানা ভাল কাগজও কি জোগাড় করতে পারেনি সুভদ্রা?

এক ফালি মেটে রঙের কাগজ। তাও সমান করে কাটা নয়, এলোমেলো এবড়ো খেবড়ো করে ছেঁড়া।

অনেক কাটাকুটি, অনেক উঁচু-নিচু-বাঁকা লাইন, অনেক বর্ণাশুদ্ধি আর রুচিবিহীনতার বেড়া ডিঙিয়ে আগাগোড়া চিঠিখানা পড়ল সতীনাথ।

পড়ল আর অধিকতর বিরক্তি বোধ করল।

সুভদ্রা লিখেছে আমার কাছে পত্র লিখিলে বোধ হয় তোমার পাপ হয়। মার চিঠিতে জানিলাম এবার পূজায় তুমি বাড়ি আসিতে পারিবে না। তা তো পারিবেই না। শুনিয়াছি কলিকাতার মেয়েরা

মেমেদের মত গোড়ালি উচা জুতা পরিয়া ঘোড়ার মত খট খট করিয়া চলে, ছেলেদের সঙ্গে এক সাথে কলেজে পড়ে, হাসি-ঠাট্টা করে, টকি দেখে। তুমি কি সেই রকম কোন মেয়ের পাল্লায় পড়িয়াছ? তাই কি বাড়িতে তোমার মন নাই? আমার কথা ছাড়িয়া দাও। আমি কালো। আমি লেখাপড়া জানি না। আমি না হয় তোমার কেউ নই। কিন্তু আমার বাবাকে তুমি অপমান করিলে কেমন করিয়া বুঝি না। তুমি তাঁহার চিঠির জবাব দাও নাই। সেকারণ তিনি খুব কষ্ট পাইয়াছেন। সেদিন বলিতেছিলেন, আমরা মুখ্খু-শুক্কু গেঁয়ো চাষী মানুষ, লেখাপড়া জানা জামাই না করাই বোধ হয় উচিত ছিল। নইলে জামাই আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দিল না! ইত্যাদি।

চিঠির প্রথম দিকটা পড়তে পড়তে সতীনাথের কখনও রাগ কখনও বা হাসি পাচ্ছিল।

কিন্তু শেষের দিকটায় এসে সে লজ্জিত বোধ করল। সত্যি শ্বশুরমশায়ের চিঠির জবাব না দেওয়াটা তার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে। আজই সেখানে চিঠি লিখবে সে।

খাতার ভাঁজ থেকে একখানা পোস্টকার্ড বের করে তখনই চিঠি লিখতে বসল সতীনাথ।

কলতলা থেকে স্নান সেরে কি একটা স্তোত্র অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকলেন নরেনদা।

দেয়ালে টাঙানো দড়িতে ভিজে কাপড় গামছা মেলে দিতে দিতে আড় চোখে একবার সতীনাথের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, কি হে ভায়া, তোমার যে আর তর সইছে না! চিঠি পেতে না পেতেই জবাব লিখতে বসে গেছ যে?

সতীনাথ একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার চিঠি লেখায় মন দিল, মুখে কিছু বলল না।

চুলে চিরুণি চালাতে চালাতে নরেনদা আবার ফুট কাটলেন, আমি

বলি কি ভায়া, এত সব ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? মন যখন চাইছে, যাও না দুদিন ঘুরে এস দেশ থেকে। তাও পণ করে বসেছ যাবে না, আবার চিঠি লিখতেও তর সইছে না। কিন্তু ভায়া, দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? কথায় বলে শোন নি?

শিশিরে কি ফুটে ফুল বিনা বরিষণে?
আর চিঠিতে কি ভরে মন বিনা দরশনে।

সতীনাথ হাতের কলম রেখে একটু বিরক্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু আপনি জানেন না যে চিঠি আমি স্ত্রীকে লিখছি না।

—এ্যাঁ, বল কি? তাহলে কাকে লিখছ চিঠি?

—শ্বশুরমশায়কে।

হেসে উঠলেন নরেনদা, তার মানে স্ত্রীকে না লিখে চিঠি লিখছ স্ত্রীর বাবাকে—এই তো? এও তো সেই একই ঘুরিয়ে নাক দেখানো হল ভায়া।

নিজের বিরক্তিকে এবার আর চেপে রাখতে পারল না সতীনাথ। বলল, অচ্ছা নরেনদা, আপনারা কি সব সময়ই আমাকে নিয়ে কেবল ঠাট্টাই করবেন? একটু সিরিয়াসলি কি অবস্থাটা ভাবতে পারেন না?

—সিরিয়াসলি তুমি ভাবতে দিচ্ছ কই ভায়া? নতুন বিয়ে করেছ। বিয়ে করেই বিরহে পড়েছ। ব্যাপারটা তো দস্তুর মত সিরিয়াস। কিন্তু তোমার হাবভাবে তো সিরিয়াস কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁ তাশ করছ না, নীল-গোলাপী খাম জোগাড় করছ না, দিস্তে দিস্তে দূরে থাক, বউমার চিঠির জবাব পর্যন্ত লিখছ না, ছুটি এসে গেছে অথচ গোড়া থেকেই বাড়ি যাবে না বলে তড়পাচ্ছ,—বলি এর মধ্যে সিরিয়াস হবার অবকাশটা কোথায় ভায়া? এর যে সবটাই ফাঁক আর ফাঁকির ব্যাপার।

খানিক গুম হয়ে বসে রইল সতীনাথ। তারপর ফ্যাকাসে মুখখানা তুলে ধীরে ধীরে ধরা গলায় বলল, দেখুন নরেনদা, আপনাকে আমি বড ভাইয়ের মত মনে করি। আছিও তিনজনে এক সঙ্গে।

তাই একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট করে বলাই আমি সঙ্গত মনে করি।

এই পর্যন্ত বলেই চুপ করল সতীনাথ।

নরেনদা ওর বলবার ধরনে এবার সত্যি সিরিয়াস হয়ে বললেন, বেশ তো, কি বলতে চাও বল।

—দেখুন, এ বিয়েতে আমি যেন সুখী হতে পারি নি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন বল তো?

—আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, এর কারণও আমি ঠিক জানি না। তবে লোকের যেমন হয় বলে শুনেছি, বিয়ে করে আমার তেমন কিছুই হয় নি। মনে কোন রোমান্স জাগে নি, কোন রঙ লাগে নি। সুভদ্রার প্রতি কোন টানই আমার হয় না। কেন যে এমন হল? আমি অনেক ভেবেছি এ নিয়ে, কিন্তু কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। সুভদ্রা দেখতে সুন্দরী নয়। লেখাপড়া জানে না। কথা-বার্তায় বা ব্যবহারে কোন ত্রুটি ধরা পড়বে না। এ সবই ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন নরেনদা, কোন সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিক মেয়েকে বিয়ে করব—এমন কোন স্বপ্ন তো কোন দিন আমি দেখিনি। তাহলে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা-বা আমার হবে কেন? কেন সুভদ্রার সঙ্গে খোলা মন নিয়ে আমি মিশতে পারছি না?

বলতে বলতে প্রায় বুঝি কেঁদে ফেলল সতীনাথ। গভীর আবেগে কথাগুলো কোন রকমে শেষ করেই সে চুপ করে বসে রইল মাথা নিচু করে।

খানিক পরে নরেনদা বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব সতীনাথ, সঠিক উত্তর দেবে তো?

মুখ তুলে সতীনাথ বলল, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না।

—আচ্ছা, এর আগে তুমি যে বাড়িতে থাকতে, যে মেয়েটিকে পড়াতে, তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ছিল?

—সম্পর্ক? বলতে গেলে কিছুই না। তবে অনেক কিছুই হয় তো হতে পারত।

—কি রকম ?

নরেনদার জেরার উত্তরে একে একে সব কথাই খুলে বলল সতীনাথ। আর না বলবার মত কোন কথাও ওর ছিল না। অন্ততঃ ওর জ্ঞাতসারে ছিল না।

সব কথা শুনে নরেনদা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ভায়া, ওই রেবা মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সহসা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সতীনাথ। বলল, রেবার মত মেয়ে হয় না নরেনদা! যেমন লেখাপড়ায় ভাল, তেমনি কথায়-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে একেবারে পারফেক্ট।

মিষ্টি হেসে নরেনদা বললেন, শেষের কথাটা কি বললে ভায়া ? পারফেক্ট না কি—ওটার মানে কি ?

—পারফেক্ট মানে জানেন না ? যাকে বলে নিখুঁত

নরেনদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, হুঁ, বুঝেছি।

—কি বুঝলেন ?

—তোমার বাবাই বল আর বড়মাই বল, এ বিয়ে দিয়ে তাঁরা ঠিক করেন নি।

—কেন ?

—কারণ তোমার মন ওই লেখাপড়া-জানা আধুনিক মেয়ে রেবার দিকেই ঝুঁকে আছে।

সশব্দে আপত্তি জানাল সতীনাথ, এটা আপনার অন্যায় সন্দেহ নরেনদা। বন্ধুবান্ধবরা মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা করলেও রেবাদের বাড়িতে যতদিন আমি ছিলাম ততদিন তো স্বপ্নেও আমি ভাবি নি যে ওই ধনীর মেয়ের সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হতে পারে। দয়াময়বাবুর মনে যে এমন একটা সংকল্প ছিল, এ কথা তখন আমিও জানতাম না, রেবাও জানত না। জানলাম তো আমার বিয়ের একেবারে আগে। কাজেই আপনার এ সন্দেহের মধ্যে কোন লজিক নেই।

—তোমাদের ও লজিক-টজিক তো আমি পড়ি নি ভায়া, ও সবের ধারও ধারি না। আমি দোকানদার মানুষ, দাড়ি-পাল্লার উঁচু-নিচুটাই বুঝি, যা বুঝি তাই বললাম। তোমার মনে না ধরে আমার কথা তুমি নিও না।

সে কথা সতীনাথ মেনে নেয়নি, নিতে পারে নি।

শুধু সেদিনই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের অন্য অনেক গুরুতর ঘটনার মুখোমুখি দাড়িয়েও নরেনদার সেদিনবার এই ইঙ্গিতটি বারবার সতীনাথের মনের পটে অগ্নির অক্ষরে জ্বলে উঠেছে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে কখনও কোন দিনই এ সত্যকে সে মেনে নিতে পারে নি।

না
কি

তাই বলে নরেনদার সে কথা নিয়ে সতীনাথ সেদিন আর কোন রকম তর্কও করে নি। হয় তো তর্ক করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। তাই সে চুপ করেই আবার এক সময় চিঠি লেখায় মন দিল।

কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না নরেনদা।

এই ভাগ্যহীন নিষ্পাপ তরুণ মানুষটির প্রতিকারহীন দুঃখের জন্য তার নিজেরও যেন বেদনার অন্ত রইল না সেদিন থেকে।

কতবার যে তিনি একান্ত দরদ দিয়ে ওর সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কত ভাবে আলোচনা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বার বার ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্ন তিনি করেছেন, তাই বলে ছেলেটার জীবনটা এমন ভাবে দুঃখে আর বেদনায়ই কেটে যাবে? এর কোন প্রতীকার হবে না?

আমি ম্লান হেসে বলেছি, দেখুন নরেনদা, জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এই তিন বিধাতায় নিয়ে। সুখ বলুন, দুঃখ বলুন, শান্তি বলুন, অশান্তি বলুন, সবই যার যার কপালে লেখা থাকে। ও কেউ খণ্ডাতে পারে না। ওর বাবা পারেন নি, ওর জেঠাইমা পারেন নি, এমন কি দয়াময়বাবু পর্যন্ত কিছু করতে পারেন নি। আপনি আমি তো কোন ছাড়। ও নিয়ে বৃথা মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। হবার হলে

সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কথায় বলে টাইম ইজ দ বেস্ট হীলার।

নবেনদা চোখ তুলে বললেন, তার মানে কি?

—মানে সময়ই সব দুঃখের রাজবৈদ্য।

সেই মহাকাল রাজবৈদ্যের হাতে সতীনাথের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে আমরা যার যার কাজের পথে এগিয়ে চলতে লাগলাম। দিনের পর দিনও এগিয়ে চলল।

কিন্তু সেই মহাকালেরই অমোঘ নির্দেশে আমাদের সকলের অজ্ঞাতে এমন কি স্বয়ং সতীনাথেরও অজ্ঞাতে আর একটি জটিল গ্রন্থি ধীরে ধীরে সতীনাথের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে লাগল।

সতীনাথ সহজ সরল মানুষ। ওর মনের অলিতে গলিতে কোথাও এতটুকু ময়লার লেশমাত্র নেই। তাই সে জটিল গ্রন্থির টান সে নিজের মনে একটুও অনুভব করেনি। সরল মনেই সব কথা সে আমাদের কাছে খুলে বলেছে। আমরাও নেহাৎই কৌতূহল বশত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জানবার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে ওর দর্জিপাড়ার টুইশনী সংক্রান্ত খবর।

তেমনি কথাপ্রসঙ্গেই একদিন একটা নতুন তথ্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হল।

সব শুনে নবেনদা উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাকে আড়ালে বললেন, পাগলা যে দেখছি উল্টো দিকে ভেসে চলেছে মধুবাবু, এর বিহিত কি?

আমি চুপ করে রইলাম। কোন জবাব দিলাম না।

মহাকালের রথচক্রের গতি কে রোধ করতে পারে?

বেশ উৎসাহ সহকারেই খবরটা আমাদের সামনে পেশ করল সতীনাথ।

বলল, জানেন মধুবাবু, একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে আজ।

ব্যাপারটা মজার কি না বুঝলাম না, তবে জবর ব্যাপার বটে।

অন্ততঃ সতীনাথের পক্ষে। তাই তো নরেনদার এত উৎকণ্ঠা সে ব্যাপার নিয়ে।

পূজোর কটা দিন বেশ আমোদ-ফূর্তি করেই কেটে গেল।

নরেনদা মহাষ্টমীর দিন রাবড়ি খাওয়ালেন আমাদের।

পূজোর মাথায় পপুলার মেডিক্যাল ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ণের কাছ থেকে কমিশন বাবদ কিছু টাকা পেয়েছিলাম। তা থেকে মহানবমী রাত্রের জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের তিনখানা টিকিট কেটে আনলাম। সতীনাথের যাবার ইচ্ছা ছিল না। আমাদের পীড়াপীড়িতে শেষটা রাজী হল থিয়েটারে যেতে।

প্রথম অঙ্কের পরে ড্রপ-কার্টেন পড়ল।

নরেনদা বললেন, চল একটু বাইরে যাই। থিয়েটার দেখতে এসে ইন্টারভালে চা না খেলে আর মজাটা কি হল!

তিন জনেই বাইরে এলাম।

চা খেয়ে আবার হলে ঢুকবার মুখেই দোতলায় উঠবার সিঁড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সতীনাথ।

আমরা একটু এগিয়ে হলে ঢুকবার মুখে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, সতীনাথ দোতলার সিঁড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

বললাম, কি হল সতীনাথবাবু? হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?

—না, কিছু না। বলে সতীনাথ আমাদের সঙ্গে এসে হলে ঢুকল।

তারপর সারাক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে হলে বসে রইল সতীনাথ। যেন সম্মুখের থিয়েটারের চেয়েও একটা বড় 'শো' তখন চলেছে তার মনের মধ্যে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আবার ড্রপ-কার্টেন পড়তেই সতীনাথ একাই বাইরে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল একেবারে অভিনয় শুরু হবার ঘণ্টা পড়লে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? কি করছিলেন?

থতমত খেয়ে সতীনাথ জবাব দিল, না, এমনি একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

রহস্যটা সতীনাথ নিজেই ভাঙল থিয়েটার দেখে হেঁটে বাসায় ফিরবার পথে।

সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে নরেনদা বললেন, প্রথম অঙ্কের পর থেকেই হঠাৎ তোমার কি হয়েছে বলতো ভায়া? একেবারে যে চুপ মেরে গেলে?

প্রথমটায় কোন জবাব দিল না সতীনাথ। তারপর এক সময়ে সকুণ্ঠ কণ্ঠে বলল, কি জানেন, আজ সেও এসেছিল থিয়েটারে।

কথাটায় রহস্যের আভাষ পেলাম আমরা। সকৌতূকে প্রশ্ন করলাম, কে? আপনার ছাত্রী সবয়ু।

—না, রেবা।

—রেবা! তোমার আগেকার ছাত্রী? এ কথা আগে বলতে হয়!

মেজাজের মাথায় সতীনাথের পিঠে একটা ছোটখাট থাপ্পড় মেরে বসলেন নরেনদা। আরও বললেন, তা কখন দেখা হল? কথাবার্তা কিছু হল?

—কি যে বলেন! কথাবার্তা কি করে হবে? সে হয়তো আমাকে দেখতেই পায় নি?

বললাম, তাহলে আপনি দেখতে পেলেন কেমন করে?

—প্রথম অঙ্কের পরে 'মিনার্ভা গ্রিল' থেকে চা খেয়ে যখন হলে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল দোতলার সিঁড়ি বেয়ে সেও উঠে যাচ্ছে উপরে। তাই তো সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম একটু।

—ওঃ, তাই বুঝি দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আর একবার বাইরে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় দর্শনের আশায়? কিন্তু দর্শন হল না, এই তো?

সতীনাথ কোন জবাব দিল না এ-প্রশ্নের। নীরবেই হাঁটতে লাগল।

ফোঁড়ন কাটলেন নরেনদা, আর একবার দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল, কি বল ভায়া? না না, এতে লজ্জা পাবার কি আছে? এ রকম হয়, আমি জানি।

—যেৎ কি যে বলেন!

নরেনদা হো হো করে হেসে উঠলেন সতীনাথের সলজ্জ কথার ভঙ্গীতে।

সারাটা পথ রেবা-সতীনাথ প্রসঙ্গের আলোচনাতেই মুখর হয়ে রইল। আড্ডায় ফিরেও চলল নরেনদার স্বহস্তে খিঁচুড়ি রন্ধন আর সেই একই আলোচনা।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম আমি। সতীনাথ আগাগোড়া একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে সে আলোচনায় যোগ দিল। কখনও খোলাখুলি ভাবে, কখনও বা লজ্জার একটা ক্ষীণ আবরণের আড়াল দিয়ে।

আরও লক্ষ্য করলাম, আলোচনার সময় সতীনাথের মুখের উপর নানা বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রলেপ।

এমনি করে আরও একটা দিন কেটে গেল।

দশমীর পরদিন সকালে উঠেই সতীনাথ সরযুকে পড়াতে গেল।

আমরা আপত্তি করে বলেছিলাম, লক্ষ্মীপূজোর আগে আবার কি পড়াতে যাবেন?

সতীনাথ সে আপত্তি শুনল না। বলল, সামনেই ওর পরীক্ষা। এখন একটা দিন কামাই করলে ওর অনেক ক্ষতি হবে।

নরেনদা মুচকি হেসে বললেন, না না, কারও ক্ষতি করা কোন কাজের কথা নয়—পরেরও নয়, নিজেরও নয়।

নরেনদার কথার ইঙ্গিতটা সতীনাথ বুঝল কি না ঠিক বোঝা গেল না। আর উচ্চ বাচ্য না করে সে বেরিয়ে গেল।

দর্জিপাড়ার বাড়ির কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল সরযূ নিজে।

অন্য দিন দরজা খুলে দেয় ঝি। লক্ষ্মীপুজোর আগেই সতীনাথ পড়াতে আসবে এটা সরযূ ভাবতে পারে নি। তাই সে নিজেই দরজা খুলে দিতে এসেছিল।

সতীনাথকে সামনে দেখতে পেয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল, সে কি! আপনি!

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে সতীনাথ বলল, কেন, আমি আজ আসতে পারি একথা কি তুমি ভাবতে পার নি?

—না না, ঠিক তা নয়। তবে আজ বিজয়ার দিন। সকলেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে যায় তো, তাই বলছিলাম। তা আপনি এসেছেন, খুব ভাল হয়েছে। চলুন উপরে।

উপরের পড়বার ঘরে পৌঁছে সরযূ প্রথমেই গলায় আঁচল জড়িয়ে একান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করল সতীনাথকে।

তারপর উঠে বলল, আপনি বসুন। আমি এখুনি আসছি।

সরযূ দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে চলে গেল।

তার চলার ছন্দের দিকে তাকিয়ে সতীনাথের মনে হল, একটা অপ্রত্যাশিত খুসিতে যেন কণায় কণায় ভরে উঠেছে তার মন।

আহা বেচারি!

এই শুভদিনে হয় তো কেউ ওকে ৺বিজয়ার স্নেহ বা ভালবাসা জানাতে আসে না। হয় তো মা ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করবার সুযোগও ওর জীবনে আসে না। তাই হয় তো সতীনাথকে পেয়ে এমন খুশি হয়েছে ও।

সত্যি, নরেনদার কথামত আজ এখানে না এলে অন্যায়ই হত।

খুশি মনে ঘরের চারদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ চমকে উঠল সতীনাথ।

দেয়ালের সেই মাঝ-বয়সী ভদ্রলোকের ছবিতে একটা টাটকা রজনীগন্ধার মালা ঝুলছে।

দুটো ধূপকাঠিও বোধ হয় জ্বালানো হয়েছিল সকালে। তার দগ্ধাবশিষ্ট কাঠি দুটো এখনও ঝুলে রয়েছে ফটোটার রিঙের ভিতরে।

এ কার ছবি ?

৺বিজয়ার এই পুণ্য প্রভাতে কার ছবিতে মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে সরযু ?

শ্রীমন্ত সরকারের কি ?

ক্ষণকাল পূর্বের সহানুভূতির সুরটা যেন সহসা একটা কর্কশ হাতের ছোঁয়া লেগে ঝন্ ঝন্ করে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল সরযু।

মৃদু হাসিতে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে বলল, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

নিরুত্তাপ গলায় সতীনাথ বলল, না, তাতে আর কি হয়েছে।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপ।

কথা বলল সতীনাথ, ও ছবিটা কার সরযু ?

—আমার বাবার।

—বাবার! মানে—শ্রীমন্তবাবুর ?

—মাস্টারমশায়!

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সরযু। আর কিছুই বলতে পারল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় থর্ থর করে কাঁপতে লাগল।

সতীনাথ হতভম্ব!

এ সে কী করল ?

নির্বোধের মত এ কী প্রশ্ন সে করে বসল ?

সবই তো সে জানে। তবু জেনেশুনে এই নিষ্পাপ কিশোরী মেয়েটিকে এমন একটা নিষ্ঠুর প্রশ্ন-বানে সে জর্জরিত করল কেন ?

ওর জীবনের যেটা সব চেয়ে বড় ক্ষত, ঠিক সেই স্থানেই ও এমন নির্মম আঘাত করল কেন ?

থতমত খেয়ে সতীনাথ বলল, আমি কিছু ভেবে কথাটা বলি নি সরযু। তুমি কিছু মনে করো না।

—না—না—না—

ঠিক তেমনি আর্তকণ্ঠে এই অস্পষ্ট শব্দ তিনটি মাত্র উচ্চারণ করতে করতে শরাহত হরিণীর মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সরযু।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন একজন বর্ষিয়সী মহিলা।

মহিলাকে দেখতে পেয়েই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সতীনাথ।

মহিলা মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমি সরযুর মা। আপনি বসুন।

এই সরযুর মা!

শ্রীমন্ত সরকারের রক্ষিতা!

সবিস্ময়ে আর একবার তাঁর মুখের দিকে তাকাল সতীনাথ। সশ্রদ্ধ নতিতে তার মাথা আপনি নিচু হয়ে এল।

সরযুর মায়ের সম্বন্ধে যত কথা সে শুনেছে, কল্পনায় তার চেহারার যে ছবি সে এঁকেছে নিজের মনে, তার সঙ্গে তো এ চেহারার কোনখানে কোন মিল নেই।

এ যে এক পরম প্রশান্ত মাতৃমূর্তি!

উচ্ছৃংখল জীবনের কালিমা-রেখার এতটুকু স্বাক্ষর নেই এর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে।

উজ্জ্বল গৌর দেহবর্ণ, আয়ত নয়ন, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, শুভ্র বসন, গম্ভীর মধুর কণ্ঠস্বর—কোথাও মালিন্যের এতটুকু ছোঁয়াও তো দেখতে পেল না সতীনাথ।

যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে যেয়ে মহিলাটির সম্মুখে উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করল সতীনাথ।

মুহূর্তের জন্য মহিলাটির দুটি ঠোট দুবার কাঠিন্যে যেন বঙ্কিম হয়ে উঠল।

কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র।

পরক্ষণেই মধুর সস্নেহ কণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি আমাকে প্রণাম

করলে, এ তোমারই মহত্ত্ব। তবু এর পরে তোমাকে আর আপনি বলতে পারলাম না। তুমি কিছু মনে কর না।

সতীনাথের কাহিনীর ঠিক এই জায়গাতেই হঠাৎ ফোঁড়ন কাটলেন নরেনদা। বললেন, আরে ভায়া তাই বলে ওই মেয়ে মানুষটাকে একেবারে প্রণাম করে বসলে তুমি? তোমার একটু সংকোচও হল না?

সতীনাথ মাথা চুলকে বলল, কি জানেন নরেনদা, কাজটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। আর ভাল-মন্দ বিচার করেই কি আমি ছাই প্রণাম করেছিলাম। তখন কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। একে তো মেয়েটা ওরকম ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল। ভারী অপরাধী মনে হল নিজেকে। তার উপর বর্ষিয়সী মেয়েদের প্রণাম করা ছাড়া আর কেমন করে যে সম্ভাষণ করতে হয় তাও তো জানি না। তাই কি রকম যেন হয়ে গেল ব্যাপারটা।

আমি বললাম, সে যা হবার তা হয়ে গেছে। তারপর কি হল তাই বলুন। ব্যাপারটা বেশ রোম্যান্টিক লাগছে।

সতীনাথ বলতে শুরু করল আবার।

সতীনাথের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সরযুর মা আবার বললেন, কি জানো, খুকিকে পড়াতে যাঁরা এ বাড়িতে আসে সব কথা না জেনেই তারা আসে। তারপর সত্যি মিথ্যায় একদিন সব জানা-জানি হয়ে গেলেই জিভ কামড় দিয়ে সরে পড়ে। আর আসে না। তার পরেও দু'চার দিন যারা টিকে থাকে, নেহাৎ টাকার লোভেই তারা থাকে। কিন্তু এমন একটা না ছুঁই না-ছুঁই ভাব তারা দেখাতে শুরু করে যে আমিই তাদের তাড়িয়ে দিতে পথ পাই না।

একটু থেমে আবার বললেন, শশার কাছে আমি শুনেছি, সব জেনেশুনেই তুমি এ-বাড়ি এসেছ। আসা-যাওয়াও করছ আজ

ক'মাস ধরে। কিন্তু খুকী আমাকে বলেছে, এ নাগাদ এ বাড়িতে আর যারা এসেছে ওকে পড়াতে, তুমি তাদের দলের নও।

সতীনাথ প্রশ্ন করল, সরযূ তাই বলেছে বুঝি আপনাকে ?

—হ্যাঁ বাবা, বলেছে। শুধু বলেছে নয়, রোজই বলে। তোমার প্রশংসায় ও তো একেবারে পঞ্চমুখ। তুমি আসার পর থেকে ওর পড়াশুনার গরজই বেড়ে গেছে।

নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে। কথাগুলো সতীনাথ বেশ খুশি মনেই শুনেছিল।

কিন্তু শুনতে শুনতেই একটা অনুশোচনার কাঁটা যেন বুকের ভিতর ফুটতে লাগল। একটু আগেই এই মেয়েটিকেই সে কিনা এমন কঠিন আঘাত হেনেছে।

সতীনাথ সকুণ্ঠ গলায় বলল, দেখুন, আমি না জেনে সরযুর মনে আজ বড় ব্যথা দিয়েছি। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

সরযুর মার প্রশান্ত মুখখানি সহসা যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে তিনি থেমে থেমে বললেন, তোমাদের কথাগুলো প্রায় সবই আমি শুনতে পেয়েছি।

—আপনি শুনেছেন সব কথা ?

—হ্যাঁ শুনেছি আড়াল থেকে তোমাকে অনেক দিন দেখেছি। কিন্তু আজ ⁄বিজয়ার দিন তুমি আমার বাড়িতে এসেছ। তাই নিজেই আসছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। দরজার কাছে এসেই খুকির উত্তেজিত গলা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। সবই শুনলাম

—ওঃ, বলে চুপ করল সতীনাথ।

—এতে তো তোমার কোন দোষ নেই। কথাটা খুকিকে যতই আঘাত করুক, এ অবস্থায় এই ধারনা হওয়াই তো তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। তবু একটা কথা তোমাকে আমার বলা দরকার বাবা।

—কি কথা বলুন ?

—অন্য কেউ হলে এ জবাবদিহি আমি করতাম না। নিজের

হাতে কপাল যখন পুড়িয়েছি, তখন আমার সম্বন্ধে কে কি ভাবল না ভাবল তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু তোমার উপর আমার অনেক ভরসা। কেন জানি না, আমার মন বলছে তুমিই পারবে সরযুকে মানুষ হবার পথ দেখাতে। তাই তোমাকে বলছি, ঐ ছবি সম্বন্ধে তুমি যে ধারণা করেছ তা ভুল।

—ভুল! চমকে প্রশ্ন করল সতীনাথ, কি ভুল?

দেয়ালের ছবিখানার দিকে সজল চোখ তুলে সরযুর মা বললেন, ও ছবি সরকার মশাইয়ের নয় সরযুর বাবার।

অজ্ঞাতেই সতীনাথের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সরযুর বাবার!

—হ্যাঁ, আমার স্বামীর। আজ তোমরা আমাকে যা দেখছ, আমার সম্বন্ধে যা শুনেছ, সেইটেই আমার সব পরিচয় নয়। আমারও স্বামী ছিল, ঘর ছিল। সেই ঘরে একদিন আমি নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। সেই আগুনেই আমি নিজে জ্বলেপুড়ে মরছি, ওই নিষ্পাপ মেয়েটাকেও পুড়িয়ে মারছি।

কথা বলতে বলতে সরযুর মার [illegible] ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিমূঢ় সতীনাথ অবাক বিস্ময়ে সেই দিকেই হাঁ করে চেয়ে রইল।

হাতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সরযুর মা বললেন, এ সব কথা আমার মুখে আজ হাসি তামাসার মত শোনায় তা জানি। তবু এতদিন তোমার কথা শুনে শুনে আর আজ তোমাকে নিজের চোখে দেখে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে তোমার উপর। তাই কথাগুলো তোমাকে না বলে পারলাম না। আমার অনুরোধ, আমার আজকের পরিচয়ের গ্লানি দিয়ে তুমি খুকিকে বিচার করো না। এ-বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। আর এ আবহাওয়া থেকে যাতে একদিন ওকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারি সেইটেই আমার জীবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সফল করতে তুমি আমাকে সাহায্য কর বাবা।

গভীর আবেগের সঙ্গে সতীনাথ বলল, করব, নিশ্চয় করব। আমার পক্ষে যেটুকু সাহায্য করা সম্ভব আমি নিশ্চয় করব।

সরযূর মা আর কোন কথা বললেন না। দেয়ালের ছবিখানির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর চোখ নামিয়ে নিলেন।

সতীনাথ তখনও চুপ করে বসেছিল।

মা [illegible] দিকে চেয়ে বললেন, [illegible] বিদায়ের দিন [illegible] শুধু মুখে বাড়ি থেকে যেতে নেই। [illegible] আমার গোপালের প্রসাদ আছে। [illegible] তুমি আপত্তি [illegible] না।

সতীনাথ তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না, না, আপত্তি করব কেন? [illegible] নিশ্চয় খাব।

[illegible] সরযূর মা বললেন, [illegible] মন বলেছিল, যেতে তুমি [illegible] রেখে এসেছি। [illegible] আছে।

[illegible] দেখল একবার। [illegible] দিকে।

তারপর বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল সতীনাথের মুখে।

বিচিত্র জীবনের গতি।

কোথাকার ঢেউ কোথায় যে গড়ায় তা কেউ বলতে পারে না।

স্বামী [illegible] নিয়ে একদিন [illegible] সুখের ঘর না জানি গড়েছিল এই নারী। নিজের হাতেই একদিন সে ঘর সে ভেঙে দিল। তবু সে ঘরের স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারল না জীবন থেকে। মুছে ফেলতে চাইলও না। মেয়ের শয্যাশিয়রে টাঙিয়ে দিল সেই গৃহ-দেবতার ছবি। মেয়ের জীবনকে গড়ে তুলতে চাইল সেই দেবতার পূজার নির্মাল্য করে।

কিন্তু এই বিষামৃতের মিশ্রিত পাত্রে ওষ্ঠ স্পর্শ করে সরযূ কী পাবে তার জীবনে?

বিষের তীব্র যন্ত্রনা ?

না, অমৃতের জ্যোতির্ময় অধিকার ?

এই প্রশ্নই সেদিন সতীনাথের অন্তরে বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

সবিস্তারে এই নাটকীয় ঘটনাটির বর্ণনাই আমাদের সামনে পেশ করে ঠিক এই প্রশ্ন সেদিন সতীনাথ আমাদেরও জিজ্ঞাসা করেছিল।

আর তার মুখে বার বার এই একই প্রশ্ন শুনে উৎকণ্ঠিত নরেনদা আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন, পাল্লা যে কেবলি উল্টো দিকে ভারী হয়ে চলেছে মধুবাবু, এর বিহিত কি ? উনি তো এখানে এক ফুল থেকে আব এক ফুলে বেশ উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু বেচারি বৌমা যে ওদিকে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন, তার কি হবে ?

এ প্রশ্নের কোন জবাব আমি দেই নি। জানি, জবাব হয় না।

মহাকালের রথ-চক্রের গতি কেউ রোধ করতে পারে না।

না, পারে.

একমাত্র মহাকাল নিজেই পারে তার রথ-চক্রের মোড় ঘুরিয়ে দিতে।

সতীনাথের জীবনের মোড়ও একদিন ঘুরে গেল।

সরযুর সঙ্গে তার সব সম্পর্ক একদিন ছিন্ন হয়ে গেল। সতীনাথ নিখোঁজ হয়ে গেল আমাদের চেনা জগৎ থেকে।

সেদিন ভেবেছিলাম, সরযুর সঙ্গে সতীনাথের সব সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু তা হয় নি, হবার নয়।

সরযুর সঙ্গে সতীনাথের জীবন যে এক অদৃশ্য বিধাতার হাতে গাঁটে গাঁটে বাঁধা, সে সত্য সেদিন আমরা অনুভব করতে পারি নি।

যেমন সেদিন বুঝতে পারি নি, তিলমাত্রও আশংকা করতে পারি নি যে, যে-সমস্যার সমাধানের জন্য সেদিন নরেনদা এতখানি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, সে সমস্যার এমন সমাধান মহাকাল নিজের হাতেই

একদিন করে দেবেন যার পরিণতি বেচারি সতীনাথের পক্ষে এমন ভয়ানক মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেবে। তার জীবনের সব স্বপ্ন সব সাধনা ভেঙে চুড়ে গুড়িয়ে পথের ধূলায় ছড়িয়ে পড়বে।

না, আমরা কেউ সেদিন তা বুঝতে পারি নি।

আমি না, নরেনদা নয়, সতীনাথ নয়, এমন কি সুভদ্রা পর্যন্ত নয়।

বেচারি সুভদ্রা!

একটা অন্ধ আবেগে স্বামীকে সে যত কাছে টানতে চাইল, স্বামী ততই তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল দিনের পর দিন।

অবরুদ্ধ অভিমানে যতবার সে আঘাত করেছে সতীনাথের মনের তটপ্রান্তে, জীবন-সমুদ্রের আকাংখিত তীর ততই তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

দুজনের মাঝখানে বয়ে গেছে শুধুই হাহাকারের কল্লোল।

॥ ৯ ॥

পরদিন সকালে যথারীতি পড়াতে গেল সতীনাথ।

দরজা খুলে দিল বুড়ি ঝি।

সটান দোতলার পড়বার ঘরে ঢুকল সতীনাথ।

টেবিলে বই খুলে মাথা নিচু করে বসে ছিল সরযূ। সতীনাথ ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল। মুখে কোন কথা বলল না। অন্য দিনের মত মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাল না,—আসুন মাস্টারমশায়।

সতীনাথ বুঝল, কালকের ব্যাপারটা এখনও হজম করতে পারে নি সরযূ। তাই লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না ওর দিকে।

সতীনাথও এ নিয়ে কোন রকম উচ্চবাচ্য করল না। ইংরেজি বইয়ের পাতা খুলে সোজাসুজি পড়াতে শুরু করে দিল।

মাঝে মাঝে দুটো একটা প্রশ্ন যা জিজ্ঞাসা করল, সরযূ কোন মতে হুঁ 'না' দিয়েই তার জবাব সেরে দিল

পড়ানো তাই কিছুতেই জমল না যেন।

অগত্যা সতীনাথ সেদিনের মত উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। সহজ গলায় বলল আজ তাহলে এই পর্যন্তই রইল। বাকিটা কাল হবে।

এবার কথা বলল সরযূ, একটু বসুন মাস্টারমশায়।

—কেন বল তো?

—এমনি।

চেয়ার টেনে বসল সতীনাথ। সকৌতুক দৃষ্টিতে চাইল সরযূর দিকে। সরযূ কিন্তু তেমনি সংকুচিত, নতমুখ।

—কি বলবে বল।

—আমার কালকের ব্যবহারের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মাস্টারমশায়।

—সে কি? এতে ক্ষমার কি আছে?

—না না, ও ভাবে আপনার মুখের উপর কথা বলে চলে যাওয়া আমার খুব অন্যায় হয়েছে।

—না না, বরং অন্যায় কিছু হয়ে থাকলে সেটা আমারই হয়েছে। [illegible] না জেনে তোমাকে আঘাত দিয়েছি [illegible]।

—ও আঘাত তো আমার পাওনা মাস্টারমশায়। আপনি তো না জেনে কথাটা বলেছেন। [illegible] শুনেই [illegible] কোটায়। তাই তো [illegible] সব [illegible] সহ্য করি। [illegible] আপনার কথা শুনেই বা এমন অধীর হয়ে [illegible] কেন?

—[illegible] প্রত্যাশা করব না [illegible]।

কথা শুনে [illegible] মুখ তুলে তাকালো সরযূ।

সতীনাথ দেখল, চোখ দুটি জলভরা চোখ। কি এক অধীর আনন্দে সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছে।

বিস্মিত হল সতীনাথ। সত্যি কি সরযূর মনে কোন দুরধিগম্য [illegible] আছে তার কাছে? না সত্যি কি সরযূ মনে করে যে, সতীনাথ কখনও কোন অবস্থাতেই তাকে আঘাত করতে পারে না?

আবার কথা বলল সরযূ। ধীর শান্ত, কেবল একটু অশ্রুভারাক্রান্ত তার কণ্ঠ।

—দেখুন মাস্টার মশায়, আমি আগে জানতাম আর সকলের মত আপনিও আমাদের কথা কিছু না জেনেই [illegible]মাকে পড়াতে এসেছেন, আর যেদিন সব জানতে পারবেন সেইদিনই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আর সকলের মতই এ বাড়ি থেকে চলে যাবেন। কিন্তু ক্রমে জানলাম, সব জেনেশুনেই আপনি এসেছেন। জেনে বিস্মিত হলাম। ভাবলাম

আমাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে, ঘৃণার বদলে দিনের পর দিন আমার সঙ্গে সরল ভাবে কথা বলতে পারে, এমন মানুষও তাহলে আছে পৃথিবীতে?

কথা বলল সতীনাথ, কেন থাকবে না সরযু? নিশ্চয় আছে। আমি তো সামান্য মানুষ। টাকার দায়েই তোমাকে পড়াতে আসি। কিন্তু এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে যাদের কাছে কুল, শীল, সমাজের চাইতে মানুষটাই বড়।

একটা বিপুল প্রত্যাশায় যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সরযুর সারা মুখ। আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে সে বলল, এতদিন এ কথা আমি বিশ্বাস করতাম না মাস্টারমশায়। কিন্তু আপনাকে দেখে আজ আমি এ কথা বিশ্বাস করি। আমার মার বড় দুঃখ মাস্টারমশায়। তাঁর বড় সাধ এই কলংকিত আবহাওয়া থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। তাঁর সে সাধ কি পূর্ণ হবে না? আমি কি সাধনা করলে মানুষের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না?

সতীনাথ বলল, কেন পারবে না সরযু? নিশ্চয় পারবে মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।

শুধু সেদিনই নয়, এমনি আর্ত প্রশ্নের সম্মুখে সতীনাথকে আরও একদিন দাঁড়াতে হয়েছিল।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা।

সকালে সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে সতীনাথ দেখল ঘর শূণ্য। সরযু নেই।

একটু নজর করে চারিদিকে চাইতেই বুঝতে পারল, ঘরটা যেন একটু বিশেষ ভাবে সাজানো-গোছানো।

ধোপ-ধোয়া একটা ফুল-তোলা ঢাকনা দিয়ে টেবিলটা ঢাকা। তার মাঝখানে পিতলের ফুলদানিতে একরাশ টাটকা ফুল। টেবিলে কোথাও একখানি বই নেই।

দেয়ালে সরযূর বাবার ফটোতে রজনীগন্ধার একটা টাটকা মালা ঝুলছে। ফটোর চারধারে নতুন করে চন্দনের আলপনা আঁকা হয়েছে।

ঘরে ঢুকল সরযূ।

ঠিক প্রথম দিন যেমনটি দেখেছিল তাকে তেমনি।

সদ্যস্নাতা। কালো পাড়ের সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরণে। শুধু কপালে একটি মাত্র চন্দনের ফোঁটার পরিবর্তে চন্দনের একটু অলংকরণ।

স্মিত হাসিতে মুখখানি ভরে তুলে এগিয়ে এসে সতীনাথকে প্রণাম করল সরযূ।

—কি ব্যাপার? একটা উৎসবের আয়োজন বলে মনে হচ্ছে সরযূ?

—আজ্ঞে না, তেমন কিছু নয়।

-তবু

—আজ আমার জন্মদিন। মা কিছুতেই ছাড়লেন না। তাই একটু ব্যবস্থা করা হয়েছে।

—তাই নাকি? তা বেশ—বেশ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও।

—না মাস্টারমশায়, আশীর্বাদ করুন যেন মানুষ হতে পারি।

একটু থেমে আবার বলল, জানেন মাস্টারমশায়, আজ সকালে বাবার ওই ছবিতে মালা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে বার বার বলেছি, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর বাবা, আমি যেন তোমার মেয়ে বলে পরিচয় দিতে পারি কিন্তু ছবি তো কথা কয় না। শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। তারপর প্রণাম করলাম মাকে। মাও নীরবে মাথায় তাঁর হাতখানা রাখলেন। বেশ বুঝতে পারলাম, তাঁর হাতখানা থর্ থর্ করে কাঁপছে। মুখ তুলে তাকালাম, দুটি চোখে জল টলমল করছে। মাথা নিচু করেই সরে এলাম তাঁর কাছ থেকে। মনটা

কেবলি ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। কেবলি মনে হতে লাগল, আজকের দিনে কেউ আমাকে একটু আশীর্বাদ করবে না মুখ খুলে? দুটো ভরসার বাণী শোনাবে না? তখন বার বার শুধু আপনার কথাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, এই এত বড় পৃথিবীতে মা ছাড়া আপনার মত শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আর বুঝি কেউ নেই। আজকের দিনে আপনার আশীর্বাদের আমার বড় প্রয়োজন।

সরযূর কথাগুলি শুনতে শুনতে সতীনাথও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। বলল, তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারি এমন পুঁজি আমার নেই। তবে তুমি আমার ছাত্রী। সেই হিসাবে বলছি, আজকের পৃথিবীতে কোন মানুষই চিরকাল অবহেলিত হয়ে থাকবে না। চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, যে কোন মানুষই দশজনের একজন হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তুমিও পারবে। তোমার মনে যে আকাঙ্ক্ষা, যে নিষ্ঠা আমি দেখেছি তাতে তুমি নিশ্চয় একদিন বড় হতে পারবে।

—আপনি বলছেন মাস্টারমশায়, আমি পারব? উঃ, আজ যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে, সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। আজকের এই শুভদিনে আপনার এ আশীর্বাদের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। শুধু আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।

—তোমার ভরসা তুমি নিজে সরযূ। মনে রেখ, পৃথিবীতে কেউ কারো ভরসা নয়। তবে আমার দিক থেকে এই কথা দিতে পারি যে আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয় তা আমি নিশ্চয় করব।

টুইশনি শেষ করে বেশ একটু বেলাতে রাধানাথ মল্লিক লেনের বাসায় ফিরেই অবাক হয়ে গেল সতীনাথ।

শুধুই অবাক নয়, দুই হাতে তালি বাজিয়ে আনন্দে একবারে

চীৎকার করে বলে উঠল, আরে শূলপানি যে! তুই কতক্ষণ? কি ব্যাপার? হঠাৎ কি মনে করে?

—ব্যাপার কিছুই নয়। ক'দিনের জন্য একটু বেড়াতে এলাম। সকালের ট্রেনেই এসেছি। খুঁজে-পেতে তোর এই অপূর্ব বাসস্থান তো বের করলাম। তারপর সেই থেকেই হাঁ করে বসে আছি তোর অপেক্ষায়।

—হ্যাঁ, ট্যুইশনী করে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। আজ আবার একটু খাওয়া দাওয়া ছিল সেখানে তাই। তা তুই তো বললি সকালের ট্রেনে এসেছিস? ট্রেন তো শিয়ালদায় ইন করে ভোরে। তাহলে তো [illegible] একেবারে [illegible] তোর এখানে পৌঁছবার কথা। ঠিকানা বের করতে খুব ঘুরতে হয়েছে বুঝি?

—তা একটু হয়েছে বটে, তবে এখানে পৌঁছাতে দেরী হয়েছে অন্য কারণে। ট্রেনটা আজ প্রায় দু ঘণ্টা লেট ছিল।

—ওঃ তাই বল। আগেভাগে একটা চিঠি লিখে তোর আসা উচিত ছিল। তাহলে আমি নিজে গিয়ে তোকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে পারতাম। যাকগে, সে যা হবার তা হয়েছে। বলি, এখানে এসে অসুবিধা কিছু হয় নি তো? চা-টা খেয়েছিস্?

—নারে, অসুবিধা কিছু হয় নি। তোর আর দুজন রুম-মেট ছিলেন। তারাই আদর করে ঘরে ডেকে আনলেন। হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করলেন। চা-জলখাবার খাওয়ালেন। বিশেষ করে নরেনবাবু বলে যে মোটা মতন ভদ্রলোক, তিনি তো ভারী আমুদে। তোর বাড়ির কথা, শ্বশুর বাড়ির কথা খুঁটিনাটি কত জিজ্ঞেস করলেন। কত রকম রসিকতা করলেন। বেশ লোকটি, কি বলিস?

—হ্যাঁ খুব ভাল লোক। তাছাড়া, আমাকে খুব ভালবাসেন। একেবারে ছোট ভাইয়ের মতন।

—আচ্ছা হ্যাঁরে সন্তু, তুই কখন ফিরবি জিজ্ঞেস করতেই নরেনবাবু অন্য ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে চোখ টিপে মিটি মিটি হেসে কেন

বললেন রে যে তোর ট্যুইশনী করে ফিরতে বেশ একটু দেরিই হবে?

প্রশ্নটার সামনে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল সতীনাথ।

নরেনদা সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে নাকি?

পাল্টা প্রশ্ন করল সতীনাথ, নরেনদা আর কি বলেছে রে?

—না, আর কিছুই বলেন নি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। তবে হাবে-ভাবে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু রহস্যময় বলে বোধ হল, তাই তোকে জিজ্ঞেস করলাম। তা হ্যারে তুই যে ট্যুইশনী করিস, সে ছেলে না মেয়ে?

আবার চমকাবার পালা সতীনাথের। থতমত খেয়ে বলল, একটি মেয়েকেই পড়াই।

—ওঃ তাই বল। একটু রোমান্সের গন্ধ যেন পাচ্ছি রে ভাই।

—ধেৎ, কি যে বলিস্। ছাত্রী ছাত্রী, তার আবার রোমান্স কিসের? নরেনদারা একটু হাসি-ঠাট্টা করেন এই আর কি। ও সব কথায় কান দিসনে।

শূলপানি অবশ্য কান না দিয়ে পারে নি।

পারবে কেমন করে? শোনা যে কানের ধর্ম। শব্দ হলেই তা কানে ঢুকবে। আর কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মনে। অনেক সময় মর্ম পর্যন্ত।

কিন্তু সতীনাথের বেলায় সেই কানে শোনা যে এমন মর্মান্তিক হবে তা কে জানত।

সেদিনও সকাল বেলা যথারীতি দর্জিপাড়ায় পড়াতে বেরুচ্ছিল সতীনাথ।

শরীরটা একটু অসুস্থ বলে নরেনদার সেদিন দোকানে বেরুবার তাড়া নেই। আমার তো সারা দিনমান ইচ্ছে করলেই ছুটি। কাজের মধ্যে সন্ধ্যে বেলায় একবার মোক্তারশিপ কলেজে ঢু মারা। শূলপানিও

এই কয়দিনেই আমাদের আড্ডায় বেশ জমে গেছে। বেশ সোজা সরল মানুষ। কোন প্যাঁচগোচ নেই।

নরেনদাই তাই প্রস্তাবটা করলেন এক পয়সা-দামের সিঙারার সঙ্গে চা খেতে খেতে, আমি বলি কি ভায়া, আজকের দিনটা তুমি ট্যুইশনীতে কামাই দাও। চারজনে মিলে এখানে বেশ নরক গুলজার করি!

সশব্যস্তে সতীনাথ বলে উঠল, তা হয় না নরেনদা। সামনেই ওর অ্যানুয়াল। এখন কামাই করলে খুব ক্ষতি হবে।

নরেনদা মিষ্টি করে বললেন, ক্ষতি যে একটু হবে সে তো জামা-কাপড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কি বলেন শূলপানিবাবু?

ঘটনাচক্রে সতীনাথ সেদিন ডাইং ক্লিনিং থেকে আনা সদ্য পাট-ভাঙা জামা-কাপড়ই পরে এসেছিল। তাই বিরক্ত হয়ে বলল, একটু ফর্সা জামা-কাপড় পরাও কি দোষ নাকি? না আজই প্রথম ডাইং-ক্লিনিং এর জামা-কাপড় পরলাম?

নরেনদার মুখে কেমন একটি হাসি, আহা, তুমি চটছ কেন ভায়া? দোষের কথা কি আমি কিছু বলেছি? যাও যাও, তাড়াতাড়ি যাও, তোমার আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে। কি বলেন মধুবাবু?

কথার শেষে হেসে উঠলেন নরেনদা।

সে-হাসি যেন অট্টহাসি হয়ে সতীনাথের কানে বাজতে লাগল। মরীয়া হয়ে সে বলল, তুই স্নানটান সেরে তৈরী হয়ে থাকিস, আমি এসে এক সঙ্গে খেতে যাব।

হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সতীনাথ।

হাসতে হাসতে নরেনদা বললেন, একেবারে পাগল!

শূলপানি জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি নরেনদা? ট্যুইশনীর কথায় সতু হঠাৎ অমন চটে উঠল কেন?

—ও কিছু নয় ভায়া। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমাদের এই একঘেয়ে কিম্ভুতকিমাকার জীবন। এর মধ্যেই ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে দিন কাটান আর কি।

এ-ব্যাপারে শূলপানিরও কৌতূহল কম নয়। নতুন বিয়ে করেছে, অথচ এত বড় পূজোর ছুটিটা কলকাতায় বসেই কাটিয়ে দিয়েছে সতীনাথ। এ নিয়ে দেশে-গাঁয়েও আলোচনা হয়েছে অনেক। শূলপানি অবশ্য কলকাতায় নেহাৎ বেড়াতেই কয়েক দিনের জন্য এসেছে। তবু আসবার সময় আড়ালে-আবডালে কেউ কেউ কিছুটা উপদেশামৃত বর্ষণ করতেও ছাড়ে নি। ফিস্ ফিস্ করে বলেছে, বাবাজী, যাচ্ছই তো, একটু খোঁজ-খবর নিয়ে এসো ভাল করে।

শূলপানি তাই আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা নরেনদা, যে মেয়েটিকে ও পড়ায় তার কথা আপনাদের কাছে কিছু বলেছে ও?

—তা বলেছে বৈ কি? সতীনাথ তো কিছুই গোপন করে না আমাদের কাছে।

—মেয়েটি কোন ক্লাসে পড়ে?

—ক্লাস সেভেনের স্ট্যাণ্ডার্ডেই পড়ে বলে তো শুনেছি।

—ওদের অবস্থা কেমন? বাবা কি করেন?

শূলপানির প্রশ্নের ধরন শুনে একটু কৌতুক বোধ করলেন নরেনদা। তাকে আড়াল করে চোখ টিপলেন আমাকে। মনের ভাবখানা, আসুন, একে নিয়ে একটু খেলানো যাক।

বললেন, সে কি শূলপানিবাবু? এত সব কথা জানতে চাইছেন কেন? বিয়ের সম্বন্ধ করবেন না কি?

—না না, সম্বন্ধ আর করব কার সঙ্গে? সতুর তো বিয়ে হয়েই গেছে। আপনারা জানেন না?

—তা তো জানি। আচ্ছা শূলপানিবাবু, একটা কথা ঠিক ঠিক বলুন তো।

—কি?

—আচ্ছা, বৌয়ের সঙ্গে সতীনাথের বুঝি তেমন মিলমিশ হয় নি?

—সেই তো হয়েছে এক বখেরা নরেনদা। তাই তো ভাবছি,

ওর যে মন এমন উড়ু উড়ু তার সঙ্গে এই ট্যুইশনীর কোন সম্পর্ক নেই তো ?

মাছ টোপ গিলেছে দেখে খুশিতে নরেনদা বালিশের উপর একটা মোক্ষম থাপ্পড় কসিয়ে বলে উঠলেন, আপনি ঠিক ধরেছেন ভায়া, ভায়ার আমার নিশ্চয় এখানেই মন বসেছে। নইলে আপনি বন্ধু মানুষ, বন্ধুকে দেখবার জন্য দুদিন এখানে এসেছেন। কোথায় দুদিন কাজ কামাই করে আপনাকে নিয়ে ফূর্তি করবে, তা নয় নিত্যি তিরিশ দিন ফুলবাবুটি সেজে উনি ট্যুইশনী করতে যান। কী আমার সাধের ট্যুইশনীরে !

এমনি ধারা টীকা টিপ্পনি ও মন্তব্যের ঝড় বইয়ে দিলেন নরেনদা। আর সেই ঝড়ে বেচারি শূলপানির সরল বুদ্ধির ফুটো নৌকো এক সময়ে একেবারে অতলে তলিয়ে গেল।

নরেনদা নাকে দড়ি দিয়ে যেমন নাচালেন ও বুঝি তেমনি নাচল। ও ঠিক বুঝল, এই ট্যুইশনীর ঘুর্ণিতেই সতীনাথ ডুবেছে।

সেদিন সন্ধ্যায়ই সতীনাথকে একলা পেয়ে সে সোজাসুজি চার্জ করে বসল, এ সব কি হচ্ছে তোর সতু ?

সতীনাথ অবাক হয়ে বলল, কি বলছিস্ তুই ?

—ঠিকই বলছি। বাড়িতে বৌকে ফেলে রেখে এখানে এসে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিস্, তোর লজ্জা করে না ?

—কে বলেছে এসব কথা ?

—সব কথা বলে বোঝাতে হয় না। চোখ-মুখ, হাব-ভাব দেখেই বোঝা যায়, বুঝলি ?

—বেশ, সব যখন বুঝেইছিস্, তখন তুইই বল্ কার সঙ্গে আমি প্রেম করছি ?

—ও সব ন্যাকামি রাখ সতু, এ ট্যুইশনী তুই ছেড়ে দে।

—ট্যুইশনী ! ও-হো !

বলেই হো-হো করে হেসে উঠল সতীনাথ। বলল, এইবার বুঝেছি। আরে বোকা, নরেনদার ওই একটু ঠাট্টাতেই একেবারে ভড়কে গেলি ?

কিন্তু শূলপানি না-বুঝ। ওর মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। ও তবু জিদ ধরে বলল, এ সব হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। সব আমি বুঝতে পেরেছি। কেন তুই বৌদিকে চিঠি দিস না, কেন পূজোর ছুটিতে বাড়ি যাবার তোর ফুরসুৎ হল না, সব ধরা পড়েছে এবার। ছাখ্ সতু, এখনও এ খেয়াল ছাড়। এতে কখনও ভাল হয় না। আমি তোর বন্ধু, আমি বলছি, এ ট্যুইশনী তুই ছেড়ে দে।

এর পরে সতীনাথও ধৈর্য রাখতে পারল না। কঠিন গলায় বলল, ট্যুইশনী ছেড়ে দিলে এখানে খাব কি ? পড়াশুনা চালাব কেমন করে ?

—তাই বলে বৌদির প্রতি তুই এমন অবিচার করবি ?

—তোকে আমি কেমন করে বোঝাব শুলু যে তোর বৌদির প্রতি আমি ইচ্ছা করে কোন অবিচার করি নি। আর যদি করেও থাকি তবে তার সঙ্গে এ ট্যুইশনীর কোন সম্পর্ক নেই। তুই যা শুনেছিস, যা বুঝেছিস, সব ভুল, সব মিথ্যা।

—না, ভুল নয়, মিথ্যা নয়। নইলে এত বড় কলকাতা শহরে কি ওই একটি ছাড়া আর ট্যুইশনী মেলে না যে ওই মেয়েটিকে না পড়ালেই তোর সব কিছু ডুবে যাবে ?

এ কথার কি জবাব দেবে সতীনাথ ?

মাসিক ত্রিশ টাকার আর একটি ট্যুইশনী যে ইচ্ছা করলেই জোটানো যায় না এই কলকাতা শহরে, সে কথা বললেই কি শূল-পানি বিশ্বাস করবে ?

তাছাড়া যে মেয়েটি একটা দম-আটকানো বদ্ধ অন্ধকার থেকে আলোয় আসবার আপ্রাণ সাধনায় আজ একান্ত ভাবে তার উপরেই নির্ভর করে আছে, তাকে পড়াতে যাওয়া বন্ধ করা যে আজ সতীনাথের

পক্ষে কতখানি হৃদয়হীনতার পরিচয়, সে কথাই বা সে শূলপানিকে বোঝাবে কেমন করে?

তবু একবার শেষ চেষ্টা করল সতীনাথ। শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করল। আবেদন জানাল শূলপানির মানবিকতার কাছে।

কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য নিক্ষিপ্ত সে অস্ত্র যে ব্যুমেরাং হয়ে তারই মর্মে এসে বিদ্ধ হবে সে কথা কি সতীনাথ জানত!

সরযুর প্রকৃত পরিচয় ও তার বর্তমান মানসিক অবস্থায় সতীনাথের সাহায্যের অনিবার্য প্রয়োজনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সতীনাথ বলল, তবেই ভেবে দেখ্ শুলু, এ রকম একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে ভেসে পড়ব এমন বড় অধঃপতন আমার নিশ্চয় ঘটে নি; আবার এ অবস্থায় মেয়েটাকে পড়ানো বন্ধ করে তার উচ্চাশার সকল পথ বন্ধ করে দেব এমন অমানুষও নিশ্চয় আমি নই।

সতীনাথ সব কথা খোলাখুলি বলল এক উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ফল ফলল ঠিক তার উল্টো।

সতীনাথের কাহিনী শুনে শূলপানির আজন্মলালিত সংস্কারের ভিত্তিমূল সবেগে থর থর করে কেঁপে উঠল।

ঘৃণা, ক্রোধ ও বিস্ময়ের একটা মিশ্রিত অনুভূতি তার সব ভাবনা চিন্তাকে একেবারে যেন গ্রাস করে ফেলল।

আচ্ছন্নের মত সে শুধু বলল, একটা বক্ষিতা—মানে প্রস্—তার মেয়েকে তুই পড়াস্? আবার তার সঙ্গে রোমান্স করেও বেড়াস্? ছিঃ ছিঃ সতু, ছিঃ!

সতীনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করল তাকে প্রকৃত পরিস্থিতিটা বোঝাতে।

কিন্তু শূলপানি তার কোন কথাই বুঝল না। বুঝতে চাইল না।

প্রস্। প্রসের মেয়ে। এই একমাত্র দুশ্চিন্তার কাল-কেউটে তার সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে অবিরাম কিল্‌বিল্ করতে লাগল।

তারপর আর একটি বেলা মাত্র সে কলকাতায় ছিল। যতক্ষণ

ছিল, কারও সঙ্গে কথা বলে নি। হাসে নি। ভাল করে মুখ তুলে চায় নি।

সতীনাথ বুঝিয়েছে। নরেনদা বুঝিয়েছেন। এমন অশোভন ঠাট্টা করেছেন বলে জোড়হাত করে ক্ষমা চেয়েছেন। আমিও বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু সব বৃথা। শূলপানি যা বুঝেছে তার থেকে তাকে এক চুলও নড়ান গেল না।

পরদিন দুপুরের গাড়িতেই সে দেশে রওনা হল।

যাবার আগে হাত তুলে আমাদের নমস্কার জানাল শুধু। মুখে কিছু বলল না।

আমরাও যেন কোন কিছু বলতে ভুলে গেলাম।

শুধু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, শূলপানির দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

তার পিছু পিছু সতীনাথও সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল।

মাঝ সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে শূলপানি বলল, থাক। একা যখন এখানকার পথ চিনে আসতে পেরেছি তখন শিয়ালদা স্টেশনে ফিরবার পথটাও চিনে নিতে পারব। তোমাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। তুমি ট্যুইশনীর জন্য তৈরী হও গে।

'তুই'-র বদলে তুমি।

সতীনাথ ভাঙা সিঁড়ির দুই ধাপে দুই পা রেখে ত্রিশংকুর মত দাঁড়িয়ে বন্ধুর গমন-পথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

শূলপানি নিঃশব্দ পদক্ষেপে রাধানাথ মল্লিক লেনের জরাজীর্ণ বাড়িটাকে পিছনে ফেলে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

## ॥ ১০ ॥

ভাবাক্রান্ত মন নিয়েই পর দিন সকালে সরযুকে পড়াতে গেল সতীনাথ।

গত একটা দিন শূলপাণির কয়েকটি ক্রুদ্ধ কথাই অহরহ তার মর্মে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধেছে।

একটা রক্ষিতা—মানে প্রস্—তার মেয়েকে তুই পড়াস? আবার তার সঙ্গে রোমান্স চবে বেড়াস? ছিঃ ছিঃ সতু, ছিঃ।

সত্যি কি সরযুকে কেন্দ্র করে তার মনে কোন রকম রোমান্সের ছোঁয়া লেগেছে?

অকপট ভাবে নিজের মনকে বার বার নেড়ে চেড়ে দেখেছে সতীনাথ। সরযুকে সে করুণা করে, তার প্রতি তার মনে সহানুভূতির অন্ত নেই, হয়তো তাকে সে স্নেহও করে। কিন্তু না, যৌবনের আবেগ বলতে যা বোঝায় তেমন কোন আকর্ষণ সে সরযুর প্রতি পোষণ করে না।

আর তা যদি না করে তাহলে হোক না সে রক্ষিতার মেয়ে, তাকে পড়ানোতে দোষের কি আছে?

ঘটনাচক্রে তার মায়ের একটা পদস্খলন হয়েছে বলেই সে বেচারির সম্মুখে মানুষের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সব সুযোগ চিরদিনের মত রুদ্ধ করে দিতে হবে এই বা কেমন বিচার?

সরযুর মাকে সে দেখেছে। সরযুর আচার ও আচরণকেও সে লক্ষ্য করেছে দিনের পর দিন। তাতে আর কিছু না হোক অন্তত এইটুকু সে বুঝেছে যে, সরযু ও তার মা চিরদিনই এই পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয় নি। তাদের জীবনেও একদিন সূর্যোদয়

ছিল, সামাজিক মর্যাদা ছিল, স্বামী-স্ত্রী-কন্যার সুখের সংসার ছিল। আর সে সংসারের শ্রী ও সৌন্দর্য বাংলা দেশের আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত সংসারের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। তারপর একদিন প্রতিকূল ঘটনার আবর্তে পড়ে সরযূর মা কেমন করে যে এই পঙ্কিল পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল সে ইতিহাস সতীনাথ জানে না। কিন্তু এটা সে ভাল করেই জানে যে সেদিনের সেই ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আজ মা ও মেয়ে কঠোরতম তপস্যার জন্যও প্রস্তুত। আর সেই তপস্যার পথেই তাঁরা আজ সতীনাথের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করছে। তাঁদের সেই নির্ভরতার মূল্য দিতে সে যদি সরযূকে নিয়মিত পড়াতে যায় তাতে দোষ বা অপরাধের কি থাকতে পারে?

তাছাড়া, সতীনাথ কিছু নিঃস্বার্থ পতিতোদ্ধারের প্রেরণায় সরযূকে পড়াতে যায় না। তার এই কর্মের বিনিময়ে সে পায় প্রতি মাসে ত্রিশটি করে রৌপ্য মুদ্রা, আর সেই মুদ্রাই এই বিশাল কলকাতা শহরে তার পরীক্ষা-বৈতরণী পার হবার জন্য অতি-প্রয়োজনীয় একমাত্র পারাণীর কড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে সতীনাথের মন বলে, এতো তার নিজের দিককার সাফাই। সকলে তো ব্যাপারটাকে এ ভাবে নেবে না। তাকে এই ট্যুইশনী যোগাড় করে দিতে প্রথমটায় নরেনদাও তো যথেষ্ট সংকোচ করেছিলেন। আজও তার এখানে নিয়মিত হাজিরা দেবার ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝেই তিনি টীকা-টিপ্পনি করেন।

তাছাড়া তার বাবা-মা-বড়মা, আত্মীয়স্বজনরাই বা ব্যাপারটাকে কেমন চোখে দেখবে তা কে জানে? সাহস করে সে তো তাঁদের সব কথা জানায় নি।

সুভদ্রাই বা কেমন চোখে এটাকে দেখবে তারও তো কোন পরীক্ষা আজ পর্যন্ত হয় নি।

অন্তত শূলপানি যে এ ব্যবস্থাটাকে কিছুতে মেনে নেয় নি সে তো তার ব্যবহার থেকেই বোঝা গেল। বরং এই একটিমাত্র খবর

জানামাত্র তার আবাল্যসঞ্চিত বন্ধুত্ব ও প্রীতি যেন মুহূর্তের মধ্যে কর্পূরের মত উবে গেল।

বন্ধুর মনেরই যখন এই প্রতিক্রিয়া, তখন স্ত্রী—বিশেষতঃ সুভদ্রার মত স্ত্রী, কি এ ব্যাপারকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারবে?

যদি না পারে, প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সঙ্গেই যদি তীব্র ধিক্কারে তাঁদের অন্তর জ্বলে ওঠে, সমস্বরে যদি এ ব্যবস্থার অবসান তাঁরা দাবী করে, তাহলে? তাহলে কি করবে সতীনাথ?

বাপ-মা, আত্মীয়-বন্ধু, স্ত্রীর প্রতিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে কি সরযূকে তার জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করতে পারবে?

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সতীনাথ হাজির হল দর্জিপাড়ার বাড়িতে।

যথারীতি পড়াতেও আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণ পরে এক ফাঁকে সরযূ প্রশ্ন করল, কাল থেকেই আপনাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে মাস্টারমশায়। আপনার শরীর ভাল আছে তো?

চমকে উঠে সতীনাথ বলল, না, শরীর আমার ভালই আছে। একটি বন্ধু এসেছিল দেশ থেকে। কাল সে চলে গেল। তাই হয় তো মনটা একটু খারাপ লাগছে।

—ওঃ, বলে সরযূ আবার পড়ায় মন দিল।

একটু পরে সতীনাথ প্রশ্ন করল, আচ্ছা সরযূ, তুমি স্কুলে ভর্তি হয়ে না পড়ে বাড়িতে প্রাইভেট পড়ছ কেন?

সরযূ কি যেন লিখছিল। প্রশ্নটা শুনেই একটা ঝাঁকুনি লেগে তার হাতটা থেমে গেল। ম্লান দুটি চোখ তুলে তাকাল একবার। তারপর চোখ নামিয়ে নিল। কোন জবাব দিল না প্রশ্নের।

সতীনাথ কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, মানে, স্কুলে ভর্তি হলে পড়াশুনার অনেক সুবিধা হয় তো, তাই বলছিলাম।

এবার দৃঢ় সংকল্পে সমস্ত শরীরটাকে ঋজু করে সতীনাথের

মুখের দিকে তাকাল সরযূ। বলল, আমার মত মেয়ের পক্ষে স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করা কত কঠিন তা কি আপনি জানেন না মাস্টারমশায় ?

সতীনাথ সত্যি কিছু জানে না। এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই। তাই সরল ভাবেই সে বলল, কেন ? কঠিন হবে কেন ? তোমার চেয়ে কত খারাপ মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়ে ক্লাসের পর ক্লাস পাশ করে যাচ্ছে, আর তুমি পারবে না ? বরং, প্রাইভেটের চেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা পাশ করা অনেক সহজ।

—তা হয় তো ঠিক। কিন্তু স্কুলে আমাকে ভর্তি করবে কে ?

—কেন ? আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দেব।

অনেক দুঃখেও হাসি পেল সরযূর। ম্লান হেসে বলল, মাস্টার-মশায়, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। লেখাপড়াও অনেক করেছেন। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা আপনার বড়ই অল্প। তাই ও কথা বলছেন। আপনি জানেন না মাস্টারমশায়, কোন স্কুলই আমাকে ভর্তি করবে না।

—কেন করবে না শুনতে পারি কি ?

সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রশ্নের কোন জবাব সরযূ দিতে পারল না। চুপ করে রইল।

সতীনাথ বলল, তাছাড়া, তুমি জানলে কেমন করে যে তোমাকে ভর্তি করবে না ? তুমি কখনও ভর্তি হতে চেষ্টা করে দেখেছ ?

—করেছি মাস্টারমশায়, চেষ্টা করেছি। ভর্তি হয়েও ছিলাম একবার। কিন্তু তারপর একদিন সেই স্কুল থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিল।

সবিস্ময়ে সতীনাথ প্রশ্ন করল, কেন ? তাড়িয়ে দিল কেন ?

—কেন তাড়িয়ে দিল ? এখনও আপনি বুঝতে পারলেন না মাস্টারমশায় ? তাড়িয়ে দিল কারণ আমার মা—

সরযুর গলা দিয়ে আর কথা বেরুল না। দুই চোখ ফেটে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পরতে লাগল।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে লজ্জায় ও বেদনায় সতীনাথ যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তবু এ রকম একটা ঘটনা যে মানুষের সমাজে ঘটতে পারে এটাকে যেন সে স্বচ্ছন্দ মনে মেনে নিতে পারল না।

বলল, এ তুমি কি বলছ সরযু? মানুষ স্কুলে ভর্তি হবে তার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়ে। তার বাপ-মা কি করে না করে তাতে কি আসে যায়?

—কি যে আসে যায় তা শুধু আমিই জানি!

সরযু চুপ করল ভাঙা ভাঙা স্বরে কথা কয়টি বলে।

নিজেকে ভারী অসহায় বোধ হতে লাগল সতীনাথের। তবু এক সময় সে বলল, তুমি কি বলতে চাও যে তোমার মত ছেলে-মেয়েরা কেউ স্কুল-কলেজে পড়ে না?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল সরযু, আমি ঠিক জানি না। হয় তো পড়ে। তবে সে নিজেদের পরিচয় গোপন করে। যেদিন সে পরিচয় প্রকাশ পায় সেই মূহূর্তেই তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় রোগগ্রস্ত কুকুর-বেড়ালের মত।

এর পরে আর কোন কথা জোগাল না সতীনাথের মুখে। সে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল।

অনেক বছর পরে আর একদিন সরযু নিজের মুখেই খোলাখুলি ভাবে সব কথা বলেছিল সতীনাথকে।

বলেছিল, জানেন মাস্টারমশায়, আজ যখন সমাজের অনেক হোমড়া-চোমড়া মহাশয় ব্যক্তিরা মোটর হাঁকিয়ে আমার বাড়িতে এসে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে যায়, উৎসবে-ফাংশনে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা আমার একটা অটোগ্রাফ পাবার আশায় চারপাশে ভীড়

জমায়, তখন আমার ভয়ানক হাসি পায়। মনে পড়ে যায়, অনেক দিন আগে ক্লাস ফোরের একটি কিশোরী মেয়েকে একদিন এরাই কুকুর-বেড়ালের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল স্কুলের খাতা থেকে নাম কেটে। কেন? না তার মায়ের জীবনে ছিল একটা অবাঞ্ছিত কলঙ্কের দাগ।

আরও বলেছিল সেদিন সরযূ, জানেন মাস্টারমশায়, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসে বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সব কথা যখন বললাম মাকে, মা তখন পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক দিন এক রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল ঘরের দরজা বন্ধ করে। আমি কেঁদে কেঁদে কত ডাকলাম। সাড়া দিল না। পরদিন ভোর বেলা মা যখন বেরিয়ে এল ঘর থেকে সে যেন আর এক মানুষ। সেই থেকে বদলে গেল তার পোশাক পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ। দর্জিপাড়ার বাড়ির দোতলার বড় হল ঘরে প্রায় সন্ধ্যায়ই যে গানের আসর বসত, সেই দিন থেকেই তা বন্ধ হয়ে গেল। একমাত্র আমি ছাড়া সে বাড়িতে আর কেউ কোন দিন সেতারের ছড় টানে নি, মুখে গানের কলি ভাঁজে নি। কয়েক দিন পরেই বাড়িতে এল কালো পাথরের গড়া এক গোপাল মূর্তি। ঘটা করে মহাসমারোহে বাড়িতে গোপালের প্রতিষ্ঠা হল। সেই থেকে আমারও স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। পড়ার ব্যবস্থা হল বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে। তার কিছুদিন পরেই তো আপনার দেখা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

চোখের জল মুছে এক সময় সরযূ বলল, হঠাৎ আমার স্কুলে ভর্তি হবার কথা আপনার মনে পড়ল কেন মাস্টারমশায়? এর আগে তো কোন দিন এ কথা বলেন নি?

—না, এমনি বলছিলাম। তবে কি জান, আমি তো আর এক

বছর আছি। বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই তো এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—কেন মাস্টারমশায়? আপনি এম. এ. পড়বেন না?

—এম. এ. পড়া কি আর হবে? সংসারের যা অবস্থা, হয় তো বি. এ. টা পাশ করতে পারলেই একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিতে হবে।

অসহায় ভাবে সরযূ বলে উঠল, তাহলে কি হবে? আমি কার কাছে পড়ব তার পরে?

হেসে উঠল সতীনাথ, তোমাকে পড়াবার লোকের অভাব কলকাতা শহরে হবে না। সে ভয় করো না।

—পড়াবার লোকের অভাব হয় তো হবে না। কিন্তু আপনার অভাব কি তাতে পূর্ণ হবে?

তেমনি হেসেই সতীনাথ জবাব দিল, কেন? আমি কি এতই ভাল শিক্ষক নাকি?

এ প্রশ্নের যে জবাব সরযুর ঠোঁটের গোড়ায় এসেছিল সেটাকে এড়িয়ে সরযূ শুধু বলল, সে আপনি বুঝবেন না মাস্টারমশায়।

কি যে সে বুঝবে না, কেনই বা সে বুঝবে না, মনে মনে অনেক ভেবেও সে প্রশ্নের কো মীমাংসা সতীনাথ করতে পারল না। চুপ করেই রইল।

হঠাৎ এক সময় সরযূ আবা বলল, মাস্টারমশায়, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?

—মনে আবার কি করব? তুমি বল।

একটু ইতস্তত করে সরযূ বলল, আপনার একটা ফটো আমাকে দেবেন?

চমকে উঠল সতীনাথ। বলল, ফটো?

—হ্যাঁ, আপনার ফটো?

—কেন? ফটো দিয়ে কি করবে?

—কি আর করব। এমনি কাছে রেখে দেব।

একটু পরে আবার বলল, তাছাড়া, একদিন তো আমাকে পড়ানো ছেড়ে দিয়ে আপনি চলেই যাবেন। তখন আপনার একটা স্মৃতি আমার কাছে থাকবে।

—আমি তো আজই কিছু চলে যাচ্ছি না। যখন যাব সে তখন দেখা যাবে।

—না মাস্টারমশায়, কখন কি অঘটন ঘটে যায় কিছুই তো বলা যায় না। আপনার একখানা ফটো আমাকে এখুনি দিন।

—বেশ তো, ফটো একখানা তোমাকে দেব। তাও তো কয়েক দিন দেরী হবে। ফটো তুলতে হবে তো।

সরযুর বক্তব্য ও তার ব্যগ্রতায় সভানাথের মনের ভিতরেও কেমন যেন একটা পুলক-শিহরন বয়ে যাচ্ছিল।

তারই আবেশে সে বলল, আচ্ছা সরযু, আমি চলে গেলে তোমার খুব কষ্ট হবে না?

দুটি ভীরু চোখ তুলে আলতো ভাবে ঘাড় কাৎ করে সরযু বলল, কষ্ট? তা তো হবেই।

বুঝি বা সান্ত্বনা দিতেই সভানাথ বলল, তুমি ভেব না সরযু, তুমি কষ্ট পাও, এমন কাজ আমি করব না।

সরযুর চোখ দুটি যেন এ কথায় একটা গভীর প্রত্যাশায় জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। অধীর কণ্ঠে সে বলল, আপনি ঠিক বলছেন মাস্টারমশায়?

—হ্যাঁ।

—কথা দিলেন?

—দিলাম।

পেট-ফাঁপা বেলুনের মত একটা প্রচণ্ড আত্মপ্রসাদের হাওয়ায় উড়তে উড়তে সেদিন আড্ডায় ফিরল সভানাথ।

নিজের অপরাধে নয়, এমন কি জন্মগত অপরাধেও নয়, শুধুমাত্র প্রতিকূল ঘটনার আবর্তে পড়ে অবহেলা আর অপমানের পঙ্কে প্রায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটি নিষ্পাপ কিশোরী তাকেই আশ্রয় করে নব জীবনের তীরে উত্তীর্ণ হবার স্বপ্ন দেখছে, একান্ত ভাবে নির্ভর করছে তারই সাহায্য আর আশ্বাসের উপরে, সতীনাথের মত একজন বি. এ ক্লাসে পড়া স্বপ্নদর্শী যুবকের পক্ষে একি চারটিখানি কথা ?

তার শক্তি ও সামর্থ্যকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে আকাশচুম্বী করে তোলার পক্ষে এই তো যথেষ্ট অনুপ্রেরণা।

তাই তো এক-চক্ষু হরিণের মত সতীনাথ সেদিন শুধুমাত্র সরযুর অসহায় আকুলতা ও তার উপর একান্ত নির্ভরতার দিকটাই দেখেছে। তার নিজের দেওয়া আশা ও আশ্বাস যে এ ব্যাপারে কতখানি ঠুনকো ও অনির্ভরযোগ্য তা কি সে একবারও তলিয়ে দেখেছিল ?

অথচ পদ্মপাতে এক ফোঁটা জলের মত তার সব আশ্বাস ও নির্ভরতা একটিমাত্র আকস্মিক ঘটনার দমকা হাওয়ায় একদিন কাল-সলিলে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল।

বুঝি তাই হয়।

প্রকৃতির গতিই এমনি।

যা ভাবা যায়, যা প্রত্যাশা করা যায়, ঘটনার একটি আকস্মিক আঘাতে সে সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

মানুষ বিমূঢ় হয়, ব্যর্থতায় ও বেদনায় হাহাকার করে। ভাবে—কেন এমন হল ? এমনটি তো হবার কথা নয় ?

যেন মানুষের বুদ্ধি আর বিচারের মাপ-কাঠি অনুসারেই জীবনের দুর্বার রহস্যময় গতিকে মাপা যায় !

যেন মানুষের হাতেই রয়েছে বিশ্ববিধানের রথরশ্মি !

দুপুরে সেদিন সতীনাথ একাই ঘরে ছিল

শূলপানি চলে যাবার পর থেকেই ভারী মনমরা হয়ে আছে বেচারি।

বন্ধু এল দেশ থেকে বেড়াতে। কোথায় দুদিন তাকে নিয়ে আমোদ ফূর্তি, হৈ চৈ করবে। না এমন একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে চোখের জলে নাকের জলে এক করে সে চলে গেল।

চুপচাপ ঘরে শুয়ে ছিল সতীনাথ।

বাইরে পিওনের গলা শোনা গেল, সতীনাথবাবু ঘরে আছেন? 'তার' আছে।

'তার' আছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নিচে নেমে গেল সতীনাথ।

কম্পিত হাতে খাতায় সই করে খামখানা নিয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেলল।

না জানি কি দুঃসংবাদ আছে এত খামের ভিতরে। বড়মার অসুখ নয় তো?

না, সে রকম কিছু নয়।

বড়মাই তার করেছেন। সুভদ্রার অসুখ। তারে লেখা আছে বৌমা সিরিয়াস কাম শার্প।

॥ ১১ ॥

কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে মনের অবরুদ্ধ ক্রোধ আর চেপে রাখতে পারল না শূলপানি।

শুধু ক্রোধই বা বলি কেন, বন্ধুর আসন্ন অপঘাতের আশংকাও বুঝি তাকে অস্থির করে তুলেছিল।

তাই কালবিলম্ব না করে সেই দিন রাতেই সে গিয়েছিল সতীনাথ-দের বাড়ি। তার জেঠাইমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে সরযূ সংক্রান্ত সব কথাই অনুচ্চ আতংকিত কণ্ঠে তাঁকে সবিস্তারে বলেছিল। কিছুটা বা অতিরঞ্জনও ছিল তার বর্ণনায়।

সব কথা শুনে আতংকে যেন শিউরে উঠলেন জেঠাইমা। চাপা গলায় সত্রাসে বললেন, তুই বলিস কি শূলু, আমাদের সতু শেষে এই করল?

তবে আর বলছি কি জেঠাইমা? এখনও যদি আপনারা সতর্ক না হন তাহলে খোকাবাবুর আর কিছু বাকি থাকবে না। বাবু তো সেখানে দিনরাত সেই ট্যুইশনী নিয়েই মেতে আছেন। এ নিয়ে তার রুম-মেটরা কত হাসিঠাট্টা করে। সে সব বাবুর কানেই যায় না।

আবেগের আতিশয্যে শূলপানির গলাটা বোধ হয় একটু চড়েই গিয়েছিল। ফিস্ ফিস্ করে জেঠাইমা বললেন, আস্তে বল্ বাবা, আস্তে বল্। ও অভাগী যদি শোনে এসব কথা, কেঁদে-কেটে তাহলে যে অস্থির কাণ্ড করে তুলবে। এমনিতেই তো রাতদিন চোখের জল ফেলছে।

কিন্তু কাণ্ড যা ঘটবার তা ততক্ষণে ঘটে গেছে।

মাটির ভিত কাঠের বেড়ার টিনের ঘর সতীনাথদের। অন্ধকার দাওয়ায় বসে শূলপানি যখন এই ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করছিল জেঠাইমার কাছে, প্রবাসী স্বামীর সংবাদ প্রত্যাশার কৌতূহলে সুভদ্রা তখন ঘরের ভিতর থেকে আড়ি পেতে সে সবই শুনেছিল।

শুনেছিল আর তীব্র অন্তর্জ্বালায় জ্বলে উঠেছিল।

যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল ঘরের ভিতরে তেমনি নিঃশব্দেই আবার চলে গেল সেখান থেকে।

ছিন্নকণ্ঠ ছাগশিশুর মত অসহায় যন্ত্রনায় তখন ছট্ ফট্ করতে লাগল তার সারা অন্তর।

সতীনাথ কোনদিন ভাল করে তার সঙ্গে দুটো কথা বলে নি, বিয়ে হওয়া অবধি আজ পর্যন্ত একখানা চিঠি দিয়েও তার সংবাদ নেয়নি, পর পর চিঠি লিখে কোন জবাব পায়নি কোন দিন, সে দুঃখ তবু সে সয়েছে, কিন্তু এখন কি করবে সে?

এ দুঃখ সে সহ্য করবে কোন শক্তিতে?

কেমন করে এ জ্বালার উপশম করবে?

উপায়ান্তর না পেয়ে আত্মনাশের সহজ পথই সে বেছে নিল।

গোয়াল ঘরের বাঁশের আড়ার সঙ্গে কাপড় ঝুলিয়ে ফাঁস পড়িয়ে দিল নিজের গলায়।

ফাঁস দিল, কিন্তু মৃত্যু তার হল না।

একটা যন্ত্রণাকাতর গোঙানীর আওয়াজ শুনে কেরোসিনের ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে গোয়াল ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়েই আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন জেঠাইমা, ওরে! এ কী সর্বনাশ হলরে আমার! এ তুই কী করলি রে!

এদিকে বড়মার জরুরী টেলিগ্রাম পেয়েই কলকাতা থেকে বাড়ি রওনা হল সতীনাথ।

ভোরবেলা ট্রেন থেকে নামল জেলা শহরের স্টেশনে। শেয়ারের ভাড়াটে গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে, টিনের সুটকেশটা হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটেই গ্রামের পথ ধরল।

গ্রামে ঢুকবার মুখেই দেখা হয়ে গেল বাল্যবন্ধু নগেশের সঙ্গে। কোথায় যেন যাচ্ছিল সাত সকালে। সতীনাথকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। বলল, টেলিগ্রাম পেয়েই আসছিস বুঝি। কোন ভয় নেই আর। বিপদ কেটে গেছে।

সতীনাথের ইচ্ছা করছিল জিজ্ঞেস করে কি অসুখ হয়েছে সুভদ্রার। কিন্তু নগেশ নিজে থেকে কিছু বলল না দেখে বলি বলি করেও কথাটা আর বলা হল না।

কিছুক্ষণ পরে অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করল নগেশ, এ তুই কি করেছিস রে সতু? গ্রামে যে একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে।

—কি এমন অন্যায় করেছি রে নগেশ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তা পারবি কেন? একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিস, তোর বুকের পাটা তো কম নয় রে!

—কে বলেছে এ সব বাজে কথা? নিশ্চয় শুলু বলেছে।

—হ্যাঁ বলেইছে তো একশোবার বলবে। তুই বুঝি ভেবেছিলি গভীর জলে ঘাই মেরে বেড়াবি, আর কাকপক্ষীও টের পাবে না। তা হয় না রে, তা হয় না। ধমে কল বাতাসে নড়ে। আমি শুধু ভাবি এত দূর অধঃপতন তোর হল কেমন করে? বউটার কথাও কি একবার তোর মনে পড়ল না। সে বেচারি যে মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিল।

আতংকে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল সতীনাথ, কি বললি! সুভদ্রা গলায় দড়ি দিয়েছে? তবে যে এইমাত্র তুই বললি বিপদ কেটে গেছে?

—ঠিকই বলেছি। গলায় দড়ি দিয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে

পারে নি। তোমা হেন গুণনিধির হাতে যখন পড়েছে, এত অল্পে রেহাই পেলে চলবে কেন!

সতীনাথ জানে নগেশ কীর্তনের দলে গান-টান গায়। সুযোগ বুঝে তারই এক পদ কাজে লাগিয়ে দিল। অন্য সময় হলে হয় তো মুখের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে একটু সুর করেই গেয়ে দিত।

সতীনাথ ব্যগ্রভাবে বলল, কি হয়েছিল সব কথা আমাকে খুলে বল ভাই।

ঠাট্টা করে উঠল নগেশ, ইস্, দরদ যে একেবারে উথলে উঠল বৌয়ের জন্য।

মনে মনে অনেকক্ষণ থেকেই চটছিল সতীনাথ।

এবার আর রাগ সামলাতে না পেরে পাল্টা জবাব দিল, নাঃ, আমার দরদ উথলে উঠবে কেন? দরদ উথলে উঠবে তোমাদের! যত সব!

কথা বলতে বলতে ততক্ষণ গ্রামের প্রায় মাঝখানে এসে পড়েছে দুজনে। সামনেই সতীনাথদের বাড়ি। তর্ক বিতর্ক তাই আপাতত স্থগিত রইল।

কিছুটা দুশ্চিন্তা আর অনেকটা ক্রোধ মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে সতীনাথ তাদের কাছারি বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, বড়মা— বড়মা—

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে একটা কোলাহল পড়ে গেল। নানা-বিধ গলার আওয়াজ থেকে সতীনাথের অনুমান করতে অসুবিধা হল না যে প্রতিবেশিনীদের অনেকেই তখন তাদের বাড়িতে সমবেত হয়ে তার সম্বন্ধেই মুখরোচক সব আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল।

জেঠাইমা ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে বললেন, কে? সতু এলি? আয় বাবা, আয়—

সুটকেশটা একপাশে ফেলে রেখে সতীনাথ এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম করল।

কিন্তু জেঠাইমার মুখ থেকে আশীর্বাদের একটা শব্দও বের হল না দেখে অবাক হয়ে সে মুখ তুলে তাকাল।

ডান হাতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে নিশ্চল পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

এতক্ষণে যেন সমগ্র পরিস্থিতিটার গুরুত্ব ঠিক ঠিক অনুভব করতে পারল সতীনাথ। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এতটুকু পর্যন্ত সুযোগ না দিয়ে ছোট-বড়, দূর নিকট, আপন পর সবাই যে একযোগে তার বিরুদ্ধ পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরে যুগপৎ বেদনায় ও অসহ্য ক্রোধে সতীনাথের বুকের ভিতরটা যেন দাবদাহের মত জ্বলতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে সব ঘটনাটাই সতীনাথ জানতে পারল।

জেঠাইমার চিৎকার শুনেই সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ছুটে এসেছিল পাশের বাড়ি থেকে।

সুভদ্রার অচেতন দেহটাকে ফাঁস থেকে খুলে এনে শুইয়ে দেওয়া হল দাওয়ায়। জল ঢালা হল তার মাথায়। জলের ঝাপটা দেওয়া হল চোখে মুখে। ডাক্তার ডাকা হল।

খানিক পরেই জ্ঞান ফিরে এল সুভদ্রার।

কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসতেই সে শুরু করল আর এক কাণ্ড। তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে কপালে করাঘাত করতে করতে সে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল সতীনাথের কুকীর্তি আর নিজের মৃত্যুকামনার সখেদ ঘোষণা।

যে মুখরোচক কুৎসা স্বভাবতই লেলিহজিহ্ব হুতাশনের মত বিস্তারশীল, এক কণ্ঠ হতে শতকণ্ঠে সে কুৎসা দেখতে দেখতে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

চারিদিকে একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেল।

প্রমাদ গুণলেন জেঠাইমা। এ কি চোরা আগুনের মধ্যে তিনি

পড়লেন? কি করবেন তিনি? কেমন করে সকলের মুখরক্ষা করবেন?

পরদিন ভোরেই তিনি পাশের বাড়ির নগেশকে পাঠালেন শহরে। সুভদ্রার অসুখের সংবাদ জানিয়ে সতীনাথকে অবিলম্বে বাড়ি আসবার জন্য একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে আসুক সে। আরও একটা টেলিগ্রাম করে দিক সতীনাথের বাবা দাননাথকে। তার সংসার সে নিজে এসে সামলাক।

সারা সন্ধ্যাটা একলা বসে সতীনাথ শুধু ভাবতে লাগল, এ কী করে সম্ভব হল? তার উপরে এতটুকু বিশ্বাস বা ভরসা কেউ রাখতে পারল না?

গ্রামবাসীরা নয, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নয়, সুভদ্রাও নয়, এমন কি মা-বড়মা পর্যন্ত নয়। তার এত দিনের আচার আচরণের প্রদীপ একটি মাত্র ঘটনার দমকা হাওয়ায় মুহূর্তে নিভে গেল? পড়ে রইল শুধু রাশি রাশি অন্ধকার। কুৎসিত জঘন্য কুৎসার অন্ধকার?

এ কী করে সম্ভব হল?

এতখানি অধঃপতন যে তার হতে পারে একথা সবাই নির্বিবাদে মেনে নিল? কেউ এই মিথ্যা রটনার প্রতিবাদ করে বলতে পারল না যে না, সতীনাথ কখনও এমন কাজ করতে পারে না। সতীনাথ কখনও চরিত্রহীন হতে পারে না?

যতই ভাবতে লাগল ততই সংসার-বিমুখতার একটা তীব্র সংকল্প তার মনে দানা বাঁধতে লাগল।

এ সংসারে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না, তার উপরে ভরসা রাখে না। তাহলে সেই বা বিশ্বাস করবে কাকে। কার উপর ভরসা রাখবে? কাকে আপন বলে গ্রহণ করবে?

না, কেউ তার আপন নয়, কেউ তার আত্মীয় নয়। কারও সঙ্গে তার আত্মার যোগ নেই।

এই নিয়ে সংসারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য মনে মনে সে তৈরী হতে লাগল।

সংঘর্ষটা প্রথম বাঁধল মার সঙ্গে।

রাতে এক সময় মাকে সতীনাথ রুষ্ট কণ্ঠেই প্রশ্ন করল, এ কথা তোমরা বিশ্বাস করলে কেমন করে মা ?

—কি করব বাবা, শুনু যে এসে বলল। তা ছাড়া সবাই তো এসে ঐ একই কথা বলাবলি করতে লাগল।

—সবাই বলল আর অমনি তোমরা তাই মেনে নিলে। সবাই যদি বলে ঘরে আগুন দাও তাহলেই তোমরা দেবে ?

এ কথার কোন জবাব দিলেন না মা। একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, তাই বলে ওই মেয়েটাকে তুই পড়াতেই বা গেলি কেন ?

জ্বলে উঠল সতীনাথ, আমার মহা অপরাধ হয়েছে যে হাত পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে বসে অন্ন ধ্বংস না করে সেই নিবান্ধব পুরীতে যেয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পড়াশুনার একটা চিল্লে করেছিলাম। তা তোমাদের সইবে কেন ? তোমরা তো আমার আপন নও, তোমরা সব আমার শত্রু।

মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, এমন করে তুই বলিস নে সতু, মা হয়ে ছেলের মুখে এমন কথা শুনতে নেই।

রাগের মাথায় সতীনাথও বলে উঠল, শুনতে তোমাদের আর কোন দিন হবে না। আমার মুখে তো চুণ-কালি মেখেইছ। কিন্তু ভুলেও ভেব না যে এই চুণ-কালিমাখা মুখ তোমাদের আঁচলে ঢেকে আমি এখানে বসে থাকব।

—ওরে, তাহলে তুই কি করবি ?

—যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাব।

আশ্চর্য শক্তি মানুষের এক একটা কথার। স্নেহে সহানুভূতিতে মার যে কণ্ঠ এতক্ষণ ছিল অশ্রুসিক্ত, সতীনাথের এই কথাগুলি

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধে ও বক্রতায় তা হয়ে উঠল ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ।

মা কাঁদতে কাঁদতেই তীব্রকণ্ঠে বললেন, ওরে তা তো যাবিই। এখন যে তোর পাখা হয়েছে। উড়তে শিখেছিস। এখন যে তোর বড়লোক আপনার জন জুটেছে। গরীব বাপ-মার কাছে আর থাকবি কোন্ দুঃখে? যা যা, তাই যা—

ঠিক একই ভঙ্গীতে রুদ্র রুক্ষ হয়ে ফেটে পড়েছিল সুভদ্রারও কণ্ঠস্বর।

সে আরও অনেক পরে। গভীর রাতে।

দীর্ঘ বিরহের পরে স্বামী-স্ত্রীর প্রথম মিলন রাত।

অথচ সতীনাথ সুভদ্রার মন্দভাগ্যে কি অপরিসীম গ্লানি আর তিক্ততার ভিতর দিয়েই সে রাত অতিবাহিত হয়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল অনেক কথাও ভাবছিল সতীনাথ।

নতুন পাটভাঙা শাড়ির খস্ খস্ আওয়াজে চোখ ফিরিয়ে দেখল, শংকিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকছে সুভদ্রা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল সতীনাথ। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছাদের দিকে।

ধীরে ধীরে এসে সতীনাথের পায়ের কাছে বসল সুভদ্রা। একখানা হাত রাখল পায়ের উপরে।

না, এ সব ন্যাকামিতে ভুলবে না সতীনাথ। যারা তার মুখে চুণ-কালি দিয়েছে তাদের সে বিশ্বাস করবে না আর।

আস্তে পাখানা সরিয়ে নিল সতীনাথ।

আবার অন্য পায়ের উপর হাত রাখল সুভদ্রা। সে পাও সরিয়ে নিল সতীনাথ।

আহত গলায় সুভদ্রা বলল, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল সতীনাথ, রাগ ছাড়া আর কি করতে পারি বলে তোমার মনে হয়?

—দেখ, আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। কখন যে কি করে ফেলেছি বুঝতেই পারি নি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

দুই হাতে সতীনাথকে জড়িয়ে ধরল সুভদ্রা।

সতীনাথের মনের মধ্যে তখনও অভিমানের আগুন জ্বলছে। এক ঝটকায় নিজেকে সুভদ্রার বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে সে উঠে বসল। নিচু অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ও সব ন্যাকামী রাখ। আমি তো চরিত্র-হীন, বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে আমি প্রেম করি। আমাকে জড়িয়ে ধরতে তোমার লজ্জা করে না?

কিসে কি হল, সহসা সুর পাল্টে গেল সুভদ্রার গলায়। গ্রীবা বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে সেও বলে উঠল, লজ্জা করাই তো উচিত। আমি তো আর শহরে নাচনেওয়ালী নই যে লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খেয়ে বসে থাকব।

—মুখ সামলে কথা বল।

—কেন? মারবে নাকি?

—কি বলব, তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার গায়ে হাত তোলা পাপ নইলে জুতিয়ে তোমার মুখ ভেঙে দিতাম।

—আগো, তা তো তুমি এখন পারবেই। তোমার যে এখন অনেক জুতো হয়েছে। তুমি যে বড় গাছে নাও বেঁধেছ গো। কিন্তু এও বলে রাখছি, এ খুঁটিনি তোমার বেশী দিন থাকবে না। তোমার আসল পরিচয় যেদিন ধরা পড়বে ঐ শহরে নাচনেওয়ালীই সেদিন জুতো মেরে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। সেদিন আবার এই সুভদ্রার কাছে এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে তুমি পথ পাবে না।

সতীনাথ আর সহ্য করতে পারল না সুভদ্রার এই অসংযত বাচালতা। তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দরজা খুলে বাইরে যাবার জন্য তক্তপোষ থেকে নেমে পড়ল সে।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য পরিবর্তন হল সুভদ্রার। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে সতীনাথের দুই পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে।

কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগল, আমাকে তুমি মার, কাট, যা খুশি কর। কিন্তু দোহাই তোমার, তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে এমন ভাবে রেখে তুমি চলে যেও না ঘর থেকে।

চলে যেতে সতীনাথ পারে নি।

শুধু সেই রাতে সুভদ্রার কাছ থেকে চলে যেতে পারে নি তাই নয়, তার পরের দিন এবং তার পরেও অনেক দিন সেই গ্রামেই সে রয়ে গেল। কলকাতার দিকে যাওয়া আর তার হল না।

এত বড় একটা জঘন্য কুৎসার সামনে বাপ মা বড়মা, সুভদ্রা, আত্মীয়-স্বজনকে কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে কলকাতায় সরে যেতে তার মন চায় নি।

সেদিন রাগের মাথায় যেদিকে চোখ যায় সেদিকে চলে যাবার সংকল্প যতই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুক না কেন পরে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটাকে যতই সে ভেবে দেখেছে ততই তার মন বলেছে, এ অবস্থায় তার কলকাতায় ফিরে যাওয়া চলে না। সে যদি এখন সাত-তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যায় তাহলে কুৎসার সহস্র কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠবে। ঘোলাআনির সমাজকে সে সুযোগ সে দেবে না। যতই ভিত্তিহীন, মিথ্যা হোক, এ কুৎসার বিষাক্ত ছোবল থেকে বাপ-মা, আত্মীয় স্বজনকে সে রক্ষা করবেই।

আর তার একমাত্র পথ কলকাতায় ফিরে না যাওয়া।

তার ভবিষ্যৎ জীবনের সব আশা সব স্বপ্ন তাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, তা যাক।

একটি নিষ্পাপ কিশোরীর জীবন সাধনা তার সহায়তার অভাবে হয়তো ব্যর্থতার অন্ধকারে গুমরে মরবে, তা মরুক।

ভবিষ্যতে যা হয় তা হবে, বর্তমানে সে তো বাঁচুক। মা-বড়মার অশ্রুজল, সুভদ্রার নীরব দীর্ঘশ্বাস তো বন্ধ হোক।

সতীনাথ আর কলকাতায় ফিরে গেল না।

## ॥ ১২ ॥

এদিকে অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন গুণতে লাগল সরযু।

সতীনাথকে সে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। সতীনাথের উদার মানবিক ব্যবহারে তার প্রতি সরযুর কৃতজ্ঞতাও গভীর।

কিন্তু সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতার সীমানাকে পার হয়ে তার মন যে তার অজ্ঞাতেই সতীনাথের প্রতি এমন তীব্র ভাবে ঝুঁকে পড়েছে এ সত্য সে আবিষ্কার করল সতীনাথের অনুপস্থিতিতে।

প্রথম দু'একদিন সে নীরবেই সতীনাথের আসার অপেক্ষায় রইল। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালেও যখন সে এল না তখন আর স্থির থাকতে পারল না সরযু। ব্যগ্রভাবে মাকে যেয়ে বলল, মাস্টারমশায় তো আজও এলেন না মা?

—তাই তো রে, তার কোন অসুখ বিসুখ করে নি তো? নইলে তো কামাই করবার মত লোক সে নয়।

—তুমি তার মেসে একটু খোঁজ করবে মা?

—খোঁজ নেওয়া তো আমাদের কর্তব্যও। মেসে-হোটেলে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তো বড্ড কষ্ট হয়েছে তার।

একটু চুপ করে থেকে সরযু বলল, আচ্ছা মা, মাস্টারমশায় যদি অসুস্থই হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলে হয় না কয়েক দিনের জন্য?

মেয়ের মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে মা বললেন, না খুকি, তা হয় না। আমি বরং দেখি কাউকে দিয়ে তার একটা খবর নিতে পারি কি না।

অপ্রসন্ন মনে সরযূ আবার তার পড়ার ঘরে চলে গেল।

ঘটনাচক্রে সেই দিন বিকেলেই কি একটা কাজে শশীনাথ এল দর্জিপাড়ায় আর সরযূর মা তাকেই বার বার করে অনুরোধ জানালেন, সতীনাথের মেসে যেয়ে একবার তার খোঁজ করতে

সতীনাথকে নিয়ে মা ও মেয়ের এই আন্তরিক আগ্রহ দেখে মনে মনে হাসল শশীনাথ। ভাবল, টুকটুকে ছেলেটিকে দেখে বৃথাই তার দিকে তোমরা হাত বাড়িয়েছ সরযূর মা, যা ভেবেছ তা হবার নয়।

বলল, নিজে বলছেন আজই আমি খোঁজ নিয়ে আসব। তবে কি জানেন, ও খোঁজা নিছক বৃথা। আবার বুঝি নতুন মাস্টারের খোঁজে বেরুতে হবে আমাকে।

মাথা নেড়ে বলে উঠলেন সরযূর মা, না না, সে রকমের ছেলে সতীনাথ নয়। ওকে আমি ভাল করেই চিনি। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ, নিশ্চয় তার অসুখ করেছে।

সেই দিন সন্ধ্যায়ই খবর নিয়ে ফিরল শশীনাথ। বলল, আমি যা বলেছিলাম সেই ঘটনাই মা। হঠাৎ 'তার' পেয়ে মাস্টার দেশে চলে গেছে। তার স্ত্রীর খুব বাড়াবাড়ি অসুখ।

স্ত্রীর অসুখ। সতীনাথ বিবাহিত।

খবরটা শুনেই বুকের ভিতরটা যেন ধ্বক্ করে উঠল সরযূর অথচ কেন যে এমন হল, যে খবর শুনে স্বভাবতই তার চিন্তিত হবার কথা, চিন্তার বদলে কেন সে খবর শুনে একটা বোবা যন্ত্রণায় তার ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠল, অনেক ভেবেও সেটা সে ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

হায়রে মানব-মনের দুর্বিগম্য রহস্য। তার তল কি কেউ কোনদিন পেয়েছে? সরযূ তো বালিকা মাত্র।

সেদিন থেকেই কেমন যেন একটা ভাবান্তর ফুটে উঠল সরযূর আচারে-ব্যবহারে। যে পড়াশুনার ব্যাপারে ইদানীং সে অতিমাত্রায়

সজাগ ও মনোযোগী হয়ে উঠেছিল, তাতেই যেন সব চেয়ে বেশী ঔদাসীন্য ও গাফিলতি দেখা দিল।

সরযুব এ পবিবর্তন তাব মায়েবও নজবে পড়ল।

একদিন তিনি সবযুকে ডেকে বললেন, পড়াশুনা যে তুই একে-বারেই ছেড়ে দিলি খুকি? এ রকম করলে শেষটায় পাশ করবি কেমন করে?

মনের কথা গোপন করে সরযু বলল. কার কাছে আমি পড়ব মা? মাস্টারমশায় যে আসছেন না?

—তিনি দেশে গেছেন। তার স্ত্রীর অসুখ ভাল হলেই ফিরে আসবেন। এতে তোর মুষড়ে পড়বার কি আছে?

—তিনি কি আর পড়াতে আসবেন মা?

—কেন আসবে না? কলকাতায় তো তাকে আসতেই হবে। তার নিজেরও তো কলেজ রয়েছে।

—তার মেসে আর একবার কি খোজ করাবে মা? এত দিনে হয় তো তিনি ফিরে এসেছেন।

—দূর্ পাগল, কলকাতা ফিরলে সে নিশ্চয় এখানে আসত।

—তবু তুমি আর একবার লোক পাঠাও। না হয় মেস থেকে মাস্টারমশায়ের বাড়ির ঠিকানাটাই আনাও। এ বিপদে তার খবর নেওয়াও তো আমাদের উচিত।

—তুই ঠিকই বলেছিস খুকি। দেখি, শশীকে আর একবার সেখানে পাঠাতে পারি কি না।

নরেনদার দোকান থেকে ভগ্নদূত হয়েই ফিরে গেল শশীনাথ। সতীনাথ কলকাতা ফেরে নি। তার বাড়ির ঠিকানাও কেউ জানে না।

সরযুর পীড়াপীড়িতে আরও অনেক বারই নরেনদার দোকানে গেল শশীনাথ। কিন্তু সতীনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

এদিকে সরযু ও তার মায়ের এই আগ্রহ লক্ষ্য করে একটা নতুন

সংবাদের সম্ভাবনা যেন কিল্‌বিল্‌ করতে লাগল শশীনাথের মাথায়।

সরযুর মায়ের মনের গোপন কামনার খবরটি সে ভাল ভাবেই জানে। মেয়েকে লেখা-পড়া গান-বাজনা শেখাবার মূলে কোন প্রবল ইচ্ছা যে কাজ করছে তাও তার অজানা নয়। তিনি চান, লেখা পড়া গান-বাজনা শিখিয়ে মেয়েকে নতুন করে সমাজে তুলবেন। কোন দরিদ্র সদ্বংশের ছেলে দেখে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

তাই এই সুযোগে একটা নতুন ফন্দি জট পাকাতে লাগল শশীনাথের মনে। ফূর্তিবাজ বড়লোকের বাড়ির খাস চাকর সে। কেমন করে কোন মওকায় টাকা-সিকেটা পকেটস্থ করা যায় সে জ্ঞান তার টনটনে। সেই প্যাঁচোয়াবি বুদ্ধির জোরেই শশীনাথ বুঝতে পারল, পাকা হাতে খেলিয়ে তুলতে পারলে সরযুর মায়ের সিন্দুকের বেশ কিছু নগদ টাকা হাতিয়ে নেওয়া তার পক্ষে খুব অসম্ভব নাও হতে পারে।

তাছাড়া শ্রীমন্ত সরকারের চাকরিও আর তার পোষাচ্ছে না। যে কারণেই হোক ইদানীং যেন বাবুর আমোদ-ফূর্তিতে ক্রমেই ভাঁটা পড়ে আসছে। অন্য দিন তো দূরের কথা, ফি শনি-রবিবারেও আজ-কাল আর খড়দ'র বাগান-বাড়িতে মজলিস জমে না। ফলে চুরি-চামারি করে বা বাবুর ইয়ার-বক্সীদের কাছ থেকে উপরি-বকশিস মেরে দশ-পাঁচ টাকা যা পকেটে আসত, ইদানীং তাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রীমন্ত সরকারের চাকরির তাল পুকুরে আজকাল আর ঘটি ডোবে না। কাজেই এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য কোন রইস আদমির খোঁজে তাকে বেরুতে হবেই—এ কথাটা শশীনাথ অনেক দিন থেকেই ভাবছিল।

এখন তার মনে হল, এ চাকরি ছেড়ে যখন যেতেই হবে তখন যাবার আগে একটু ভেল্কি খেলিয়ে কিছু হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

সেই মতলব নিয়ে সরযুদের দর্জিপাড়ার বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত

তলে তলে সব ব্যবস্থাই পাকা করে এনেছিল শশীনাথ।

এক গ্রাম-সম্পর্কের ভাগ্নেকে খবর দিয়ে আনল কলকাতায়। ছেলেটি দেখতে-শুনতে ভাল। কিন্তু লেখাপড়ায় একেবারে দিগ্‌গজ। ম্যাট্রিক ফেল করে গ্রামেই বসে বসে সখের যাত্রাদলের রিহার্সেল দিচ্ছিল। গানের গলাটি তার ভাল।

বেড়াবার নাম করে তাকেই একদিন দর্জিপাড়ার বাড়িতে নিয়ে হাজির করল শশীনাথ।

সরযুর মাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, আমাদের গাঁয়েই এর বাড়ি। খুব বড় বংশের ছেলে। ওদের উঠোনে এক সময় হাতি বাঁধা থাকত মা। অবস্থার ফেরে আজ আর কিছুই নেই। শুধু বংশের নামটাই আছে। তবে দেশ-গাঁয়ে কিছু থাকল না থাকল তাতে আপনার কি। এখানে আপনার যা আছে তাতেই ওদের চলে যাবে হেসে-খেলে। কি বলেন?

সরযুর মা বললেন, তা তো বটেই। কিন্তু ছেলেটি লেখা-পড়া কতদূর করেছে? খুকিকে আপাতত পড়াতে পারবে তো? পড়ানোর ফাকে ফাঁকে খুকির মনটা না বসাতে পারলে তো বিয়েতে ওকে রাজী করানো যাবে না। যা জেদী মেয়ে আমার।

—তা তো বটেই। গনেশ আমাদের লেখাপড়ায়ও ভাল। মহকুমা সদরের কলেজে বি. এ. পড়ছিল পরের বাড়িতে 'জায়গির' থেকে। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিলে এখানেই কোন কলেজে ভর্তি হয়ে যাবে। তাছাড়া, গনেশের যা গানের গলা। চাই কি সরযুদিদিকে ও গানও দু'দশখানা শিখিয়ে দিতে পারবে।

একটু যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন সরযুর মা। বললেন, তাই নাকি? তাই নাকি?

—তবে আর বলছি কি মা? আমি কি আর হেজি-পেজি ছেলে এনে হাজির করেছি? বেশ তো, ওর একখানা গানই না হয় শুনুন আজ।

যাত্রার দলে শেখা বিবেকের একখানা 'একাঙ্গী' গান শুনিয়েই সেদিনকার, মত গনেশকে সঙ্গে নিয়ে দর্জিপাড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল শশীনাথ।

আবার এল পরদিন সন্ধ্যায়।

সরযু তখন নিজের পড়ার ঘরে চুপটি করে বসে ছিল। হয় তো বা সতীনাথের কথাই ভাবছিল। আগের দিন শশীনাথ তার জন্য যে নতুন টিউটরকে নিয়ে এসেছিল তাকে ওর কেন যেন একটুও ভাল লাগে নি। সতীনাথের বদলে ওরই কাছে দিনের পর দিন পড়তে হবে, সতীনাথ আবার কলকাতা ফিরে এলেও তার কাছে আর তার পড়া হবে না, এ কথা ভাবতেও যেন বড় কষ্ট বোধ হচ্ছিল সরযুর।

সেই ফাঁকে সরযুর মাকে একা পেয়ে নিজের মতলবটা এবার পেশ করল শশীনাথ। মিষ্টি হেসে বলল, কি বলেন মা, ছেলে তাহলে আপনার পছন্দ? যদি বলেন তো আমি ঘটকালিতে লেগে যাই।

—ছেলে তো ভালই শশী। তবে ওর মা-বাবা কি রাজী হবে? সবই তো তুমি জান?

—জানি বলেই তো বলছি মা। সে ভার আমার।

—বেশ, তুমি তাহলে চেষ্টা দেখ।

এবার একটু বিগলিত হয়ে আদুরে গলায় শশীনাথ বলল, একটা কথা ছিল মা—

—কি কথা বল।

—কিছু টাকা না হলে তো কাজে নামা যাবে না।

—টাকা?

—আজ্ঞে হ্যা। কিছু টাকা ছেলের বাপকে না খাওযালে তো তার মন গলানো যাবে না। বুঝতেই তো পারছেন?

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন সরযুর মা। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, কত টাকা?

—তা দেখুন, অন্তত হাজার খানেক টাকার কম কি আর কথা

পারা যাবে? তাদের কত বড় বংশটা সেটাও তো দেখতে হবে। এক সময়ে তাদের উঠোনে হাতি বাঁধা থাকত—

—এক হাজার টাকা। নিজের মনেই কথা কয়টি উচ্চারণ করলেন সরযুর মা।

কথাটা লুফে নিয়ে শশীনাথ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এক হাজার টাকা। ভেবে দেখুন, সরযুদিদির কত বড় ঘরে বিয়ে হবে, বিয়ের পরে ওরা দেশের বাড়িতে চলে যাবে, গা-ভরা গয়না নিয়ে দুর্গা প্রতিমার মত রূপ নিয়ে সরযুদিদি আমাদের শ্বশুরবাড়ি যাবে। সেখানে মান পাবে, মর্যাদা পাবে, আদর ভালবাসা পাবে—

এর পরে আর বেশী কথা বলতে হয় নি শশীনাথকে। তার প্রস্তাবেই রাজী হয়ে গেলেন সরযুর মা। বললেন, কবে চাই তোমার টাকাটা?

—আজ্ঞে যত তাড়াতাড়ি হয়। কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রং।

—বেশ, তুমি কালই এসে টাকাটা নিয়ে যেও।

—যে আজ্ঞে।

দ্রুতচরণ খরগোসের মত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যাবার জন্য কয়েক পা বাড়িয়েই আবার ফিরে এল শশীনাথ। সরযুর মার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, কথাটা কিন্তু আপনি গোপন রাখবেন মা। বলা তো যায় না। দু'কান থেকে পাঁচ কান হতে হতে ছেলেটাকে কেউ আবার ভাঙচি দিয়ে না বসে। খুব সাবধান।

খুব সাবধানই হলেন সরযুর মা। কারও কাছে ভাঙলেন না কথাটা। এমন কি সরযুর সঙ্গে পর্যন্ত একবার পরামর্শ করলেন না।

আর তাঁর সেই গোপনতার সুযোগ নিয়ে নগদ এক হাজার টাকা তাঁর সিন্দুক থেকে হাতিয়ে শশীনাথ তার গ্রাম-সম্পর্কের ভাগনেকে নিয়ে সুযোগ মত একদিন কলকাতা মহানগর থেকে উধাও হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে একদিন দুদিন করে সপ্তাহ পার হয়ে গেল। অধীর অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন সরযুর মা।

শেষটায় তিনিও অধৈর্য হয়ে উঠলেন। নানরকম অশুভ চিন্তা তাঁর মনকে নাড়া দিতে লাগল। শশীনাথের প্রস্তাব শুনে তার শুধু ভাল দিকটাই প্রথমটা তাঁর মনের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে যে ফাঁক ও ফাঁকির কিছু থাকতে পারে সে বিষয় তিলমাত্র সন্দেহও তখন তাঁর মনে উদয় হয় নি।

কিন্তু এখন যতই দিন যেতে লাগল ততই নানা রকম সন্দেহ তাঁর মনকে বিব্রত করে তুলতে লাগল।

শশীনাথ তাঁকে ধোঁকা দেয় নি তো?

তাঁকে ভুল বুঝিয়ে এক হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়ে নি তো?

কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? সে যে চাকরি করে সরকার মশায়ের বাড়িতে?

তবু এত সব সন্দেহের দোলায় তিনি আর অনির্দিষ্ট কাল দুলতে পারলেন না। যাহোক এর একটা মীমাংসা তাকে করতেই হবে। কেন শশীনাথ আজও ফিরল না?

বাড়ির ঝি হিমির মাকে ডেকে তিনি বললেন, তুই একখানা গাড়ি নিয়ে আয় তো হিমির মা। আমি একবার পটলডাঙায় যাব।

তখন যে সরযু তার পাশেই বসে ছিল গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় এ খেয়ালও তখন তাঁর ছিল না। তাই সরযুর সামনেই কথাটা তিনি বলে ফেললেন।

সবিস্ময়ে মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে সরযু প্রশ্ন করল, তুমি পটল-ডাঙায় যাবে মা?

এই প্রশ্ন শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন সরযুর মা। গম্ভীর গলায় বললেন, হ্যাঁ।

—কেন মা?

—জরুরী দরকার আছে। তুমি তোমার কাজে যাও। সব কথাতেই এত কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি না বাপু।

মায়ের এই রুষ্ট বিরক্ত কণ্ঠের জবাবে আহত হল সরযু। তীব্র

অভিমানে তার বুকের ভিতরটা যেন দুলতে লাগল। কোন কথা না বলে মুখ নিচু করে সেখান থেকে উঠে গেল সে।

তার গমন-পথের দিকে চেয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন সরযুর মা। তারপর নিচে নেমে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরেই পটলডাঙা থেকে ফিরে এলেন তিনি। যা আশংকা করেছিলেন তাই। শশীনাথ সত্যি সত্যি উধাও হয়েছে। সরকার মশায়ের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মাইনে-পত্তর চুকিয়ে নিয়ে সে চলে গেছে। কোথায় গেছে সে বাড়ির কেউ তা জানে না।

বড় আশায় তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন গত কয়েকটা দিন। সদ্বংশের একটি বি. এ. ক্লাসে-পড়া দারুণ ছেলের সঙ্গে সরযুর বিয়ে দেবেন। বিয়ের পরে সালংকারে সরযু দুর্গা প্রতিমার মত শ্বশুর-ঘরে যাবে। সংসার পাবে, সমাজ পাবে, হাসি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে!

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোতলার ঘরে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। পরনের জামা-কাপড় ছাড়বার কথাও ভুলে গেলেন বুঝি।

ধীর পায়ে এক সময়ে ঘরে ঢুকল সরযু।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই লক্ষ্য করল, পাষাণ মূর্তির মত চুপ করে বসে আছেন তার মা। তার দুই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুর ধারা।

বিস্ময়ে ও বেদনায় আর্তনাদ করে উঠল সরযু, কি হয়েছে মা?

চমকে সরযুর মা বললেন, ও কিছু নয়। তুই আয়। আমার কাছে আয়।

সরযুর মুখখানাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তিনি বলতে লাগলেন, আমারই ভুল হয়েছে খুকি, আমারই ভুল। তোকে লুকিয়ে একাজ করতে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে।

চোখ তুলে সরযু বলল, কি হয়েছে মা? তুমি কি বলছ?

একে একে সব কথাই খুলে বললেন তিনি।

কান পেতে সব কথাই শুনল সরযু। অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বলল, আমি কি তোমার গলায় এতই কাঁটা হয়ে ফুটছিলাম যে ঘুষের টাকা কবুল করেও তুমি আমাকে তাড়াবার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলে?

—তা নয় রে খুকি, তা নয়। তোর ভাল হবে ভেবেই আমি এ কাজ করেছিলাম।

বাধা দিল সরযু, কিন্তু মা, তুমি কেন ভাবলে না যে এত সহজে আমার বিয়ে দিতে পারবে না? যাকে টাকা নিয়ে তাড়াবার লোক জোটে না, তাকে বিয়ে করবার লোক তুমি এত অনায়াসেই পেয়ে যাবে ভেবেছ?

—কিন্তু তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা না করতে পারলে যে কিছুতেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না মা।

—আমাকে এ ভাবে বাজারের আলু-পটলের মত বিক্রি করে দিলেই কি তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে ভেবেছ? তুমি এই সহজ কথাটা কেন বুঝলে না মা, টাকার লোভে যারা আমার মত মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হবে, টাকাটা ফুরিয়ে গেলেই তারা আমাকে ছেঁড়া কাপড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে? আমার জীবনে সেই দুর্ভাগ্য নেমে আসুক এই কি তুমি চাও?

কথার শেষের দিকে কান্নায় ভেঙে পড়ল সরযুর গলা। আঁচলে চোখ ঢেকে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সরযুর মা পিছন থেকে ডাকলেন, খুকি, শোন্—শোন্—

ঘরের বাহির থেকে শুধু ভেসে এল সরযুর আর্ত কণ্ঠ, না—না—না—

নিজের ঘরে যেয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সরযু।

আর ঠিক সেই সময়ই একখানা চিঠি হাতে করে দরজার সামনে

এসে থমকে দাঁড়াল হিমির মা। একটু ইতস্তত করে ডাকল, দিদিমণি।

মুখ না তুলেই কান্নাজড়িত গলায় সরযু বলল, কি?

—দেখ দেখি এ কার চিঠি? পিয়ন দিয়ে গেল এই মাত্তর।

চিঠি।

তাদের বাড়িতে কে পাঠাবে চিঠি?

সতীনাথ নয় তো?

কী এক যাদুতে যেন মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল তার বুকের তলার যত কান্নার উত্তরোল।

কোন রকমে চোখ মুছে উঠে বসতে বসতেই সে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে বলল, কই দেখি।

ঘরের ভিতর ঢুকে চিঠিখানা সরযুর হাতে দিল হিমির মা।

ঠিকানার উপরে চোখ বুলিয়েই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সরযুর সমস্ত মন।

তাকেই চিঠি লিখেছে সতীনাথ। পোস্ট কার্ডের চিঠি।

কার্ডটা উল্টে ধরে এক নিঃশ্বাসে সবটা চিঠি পড়ে ফেলল সরযু। পড়তে পড়তেই ক্ষণকাল পূর্বের বন্ধ হয়ে যাওয়া কান্নার স্রোতটা যেন দ্বিগুণ তিনগুণ বেগে তার সমস্তটা সত্তাকে একেবারে ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

কার্ডখানাকে দুই চোখের উপর চেপে ধরে আবার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল সরযু।

ঠিকানা-হীন তারিখবিহীন পোস্টকার্ডে সতীনাথ লিখেছে: কল্যাণীয়াসু, সরযু, একটা জরুরী 'তার' পেয়ে হঠাৎ তোমাদের কোন খবর না দিয়েই বাড়ি চলে এসেছি। ভেবেছিলাম, দুদিনের জন্য আসা। কিন্তু এখন দেখছি, কলকাতা থেকে আমার চিরদিনের মত নির্বাসন ঘটল। তোমাদের কাছ থেকে হাত পেতে উপকারই শুধু নিলাম। বিনিময়ে দিতে পারলাম না কিছুই। কিন্তু কেন যে

পারলাম না সে কথা তোমাকে চিঠি লিখে বোঝাবার নয়। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ কর, এই কামনা করি। ইতি শুভার্থী—

সতীনাথ

মাথা তুলে চোখের জলে ভেজা চিঠিখানা আর একবার পড়ল সরযূ।

কল্যাণ—প্রতিষ্ঠা—শুভার্থী—সতীনাথের চিঠির এই শব্দ তিনটি যেন বার বার উদ্বত তরঙ্গাভিঘাতে তার হৃদয়ের তটপ্রান্তকে ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিতে লাগল।

## ॥ ১৩ ॥

সতীনাথের জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠল প্রথম যবনিকা উত্তোলনের প্রায় দশ বছর পরে। ইংরেজি ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎপট এবং দৃশ্য-সজ্জারও পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর।

কলকাতার উপকণ্ঠে মিউনিসিপ্যাল শহর বরাহনগরের প্রশস্ত রাজপথের পাশে একটি পুরনো একতলা বাড়িতে একটি ছোটখাটো মুদিখানার দোকান। সামনে খোপ খোপ সাজানো কাঠের সব বাক্সে বাক্সে চাল-ডাল নুন-তেল এমনি গৃহস্থের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সব জিনিষপত্র। তার পিছনে একটি উঁচু কাঠের চৌকি মাদুর দিয়ে ঢাকা। তার এক কোণে সিঁদুরের পুতুল-আঁকা একটা কাঠের হাত-বাক্স। তার উপরে খেরো-বাঁধানো একখানি জাবদা খাতা। চৌকির শেষে প্রায় ছাদ-সমান উঁচু কাঠের র‍্যাকে নানা আকার ও বর্ণের সব শিশি-বোতল-কৌটা-বাক্স থরে থরে সাজানো। একটু নজর করলেই চোখে পড়বে, একেবারে উপরের তাকের মাঝখানে বসে আছেন সিদ্ধিদাতা গনেশ।

গনেশ ঠাকুরের ঠিক পায়ের নিচেই বসে দোকানের সন্ধ্যাবেলার ধূপ-ধুনো দেবার পালা শেষ করে হাত-বাক্সটার উপরে পিতলের বিবর্ণ ধূপদানিটাকে রেখে ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনীর সাহায্যে সশব্দে তিনটি তুড়ি মেরে কাঠের হাত-বাক্সটার উপরে ভক্তি ভরে তিনবার মাথা ঠেকাল যে মানুষটি, বলা বাহুল্য সেই এ দোকানের মালিক এবং আমাদের কাহিনার নায়ক সতীনাথ।

এ কথা শুনে সহৃদয় পাঠকের হয় তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। জেলা কোর্টের ঝানু উকীল যার মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডবের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে একদিন তাকে নিজের জামাই করবার সংকল্প করেছিলেন, দর্জিপাড়ার সরযুকে কেন্দ্র করে যাকে নিয়ে পাঠকের মনে একটা সরস রোমান্সের কমল সবে দল মেলতে শুরু করেছিল, অভিমানিনী সুভদ্রার উদ্বন্ধনের সংবাদে সতীনাথের জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার একটা নাটকীয় পরিণতির প্রত্যাশায় যারা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে এ কাহিনীর পাতা উল্টে আসছিলেন, সেই সতীনাথকে হঠাৎ একটা সাধারণ মুদিখানা দোকানের একজন অতি সাধারণ মালিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখে পাঠক নিশ্চয় আমার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু আমি নিরুপায়।

কারণ সতীনাথের জীবন-কাহিনীর আমি স্রষ্টা নই, শ্রোতামাত্র। যেমনটি শুনেছি—তাও সতীনাথের নিজের মুখে, তেমনটিই লিখছি। সে রকম কেন হল না, আর এ-রকম কেন হল, তার কোন কৈফিয়ৎ দেবার দায় আমার নেই।

অতএব মুদিখানার মালিক সতীনাথকে নিয়েই এ কাহিনীর দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল।

হাত-বাক্সের উপর থেকে মাথা তুলে চোখ মেলে তাকাল সতীনাথ। রাজপথে অন্যদিনের মতই লোকজন চলাফেরা করছে। অফিস-ফেরৎ বাবুরা চলেছে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ তুলে। মাঝে মাঝে রিক্সার টুংটাং। একখানা যাত্রীবোঝাই বাস চলে গেল কলকাতার দিকে।

সেদিকে এক দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সতীনাথ হাত-বাক্সের ডালাটা একবার খুলল।

ভিতরে বসানো এলুমিনিয়ামের দুটো ছোট বাটি। বিক্রি-বাটা

যা হয়, ওই দুটো বাটিতেই সে রাখে। একটাতে রূপোর টাকা আর নোট যা পায়। অন্যটাতে খুচরো রেজকি আর পয়সা।

বাটি দুটোর মধ্যে যেটি কুলীন সেটি প্রায় শূণ্য। অপরটির অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

সারাদিন বাজার বড় মন্দ গেছে। খদ্দেরপত্র বড় একটা কেউ আসে নি। হয় তো মাসের শেষ তাই।

কিন্তু পেট তো তা বুঝবে না। মাসের শেষ বলে তার আগুন তো কম উত্তাপে জ্বলবে না।

সংসারে নিজেকে নিয়ে তিনটি প্রাণী। তাদের পেটের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র আর মাথা গুঁজবার আশ্রয়ের ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

হাত-বাক্সটাকে বন্ধ করে আর একবার পথের দিকে চাইল সতীনাথ। খদ্দেরপত্র আজ আর তেমন কেউ আসবে বলে তো ভরসা হচ্ছে না।

এমনিতেই এ অঞ্চলে লোক বসতি খুব অল্প। অবশ্য দোকানের সংখ্যাও কম। তাই তো অনেক ভেবে চিন্তে বরাহনগরেই দোকানটা খুলেছিল সতীনাথ।

খাস কলকাতার ওপরে একখানা ঘর পাওয়াও যেমন কঠিন, তার ভাড়াও তেমনি আকাশ-ছোঁয়া। তাছাড়া কলকাতার মত জায়গায় একটা নতুন ব্যবসা দাড় করানো যে অনেক টাকার ব্যাপার। সে সঙ্গতিই বা তার কোথায়?

একটা আকস্মিক দুর্বিপাকের ফলে কলকাতার বড় কলেজে বি. এ. পড়ার পাট যেদিন তাকে চিরদিনের মত বন্ধ করে দিতে হল, মিথ্যা এক কুৎসার সহস্র ফণার বিষোদ্গার বন্ধ করবার জন্য কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সুদূর পল্লীর দেশের বাড়িতেই যেদিন সে ফিরে গিয়েছিল, তার কিছুদিন পরেই সতীনাথের বাবার মৃত্যু হয়।

বিদেশে তিনি সামান্য চাকরি করতেন। তার সামান্য আয়ে

সংসারের চাকা কোন রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সে চাকা একেবারে অচল হয়ে পড়ল।

চোখে অন্ধকার দেখল সতীনাথ।

একে সদ্য স্বপ্ন-ভঙ্গের ক্ষত তার মন থেকে শুকোয় নি তখনও। একটি কিশোরী মেয়ের আহত-স্বপ্ন ব্যথা-ম্লান মুখ তখনও তার মনকে মাঝে মাঝেই উন্মনা করে তোলে। সুভদ্রার দৈনন্দিন আচার-আচরনের স্থূলতা ও রুচিহীনতা আঘাতে আঘাতে জর্জর করে তোলে তার স্বপ্নপাগল তরুণ মনকে। তার উপর সংসারের আর্থিক বোঝার এই গুরু দায়িত্ব।

আতংকে আশংকায় সতীনাথ যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

অনেক ভাবল, সংকট-মোচনের অনেক পরিকল্পনা করল মনে মনে।

অবশেষে একদিন সংসারের যৎসামান্য সঞ্চয় যা ছিল তাই সম্বল করে বেড়িয়ে পড়ল ভাগ্যের সন্ধানে।

এ-ঘাটে ও-ঘাটে অনেক ঘুরল। নোঙর ফেলতে চেষ্টাও করল অনেক ঘাটে। কিন্তু কিছুতেই যেন তল পেল না কোথাও। পায়ের তলে দাঁড়াবার মত মাটি ঠেকল না কোথাও।

তবু একদিন সাময়িক আশ্রয় একটা যদি বা জুটল, সতীনাথের দগ্ধ কপালে তাও টিকল না বেশী দিন।

দয়ালু মহাজন কৃষ্ণচরণের কৃপায় একান্ত অনভিজ্ঞ হাতেও গৌরী-পুরের বাজারে ছোট একটা দোকানকে চালু করে তুলতে না তুলতেই সেখান থেকেও একদিন তাকে পালিয়ে যেতে হল।

গৌরীপুর।

নামটা মনে পড়তেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকের ভিতর থেকে।

কেন তাকে নিয়ে বার বার ভাগ্যের এই নির্মম খেলা?

জীবনের সমস্ত ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু মাত্র কোন

মতে ছুটি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার প্রেরণায় অনেক ঘাটের জল ঘোলা করে অবশেষে অনেক পরিশ্রমের ফলে সুদূর গৌরীপুরের মত একটা উপশহরের একটি ছোট ঘরে যেদিন একটি ছোট ব্যবসাকে সে প্রায় দাঁড় করিয়ে এনেছিল, সেদিন কেন তার নির্মম ভাগ্যদেবতা রেবার ছুটি অশ্রুছলছল চোখকে তার সামনে এনে হাজির করেছিল ?

কেন তার জীবনের সেই শ্রান্ত ক্লান্ত মুহূর্তে রেবার কল্যাণ হস্তের একটু সেবা, একটু মমতার অমিয় ধারা তার রিক্ত মাথায় ঝরে পড়তে না পড়তেই একদিন অসহায় আর্তকণ্ঠে রেবাকে বলতে হয়েছিল, আমার চোখের সামনে দিনের পর দিন আপনার এই দুর্দশা দেখব অথচ কিছুই আমি করতে পারব না, এ যে আমার পক্ষে অসহ্য মাস্টারমশায় ? এর চেয়ে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই যে ভাল ছিল।

অতীত স্মৃতির রোমন্থনের অতলে বুঝি মুহূর্তের জন্য তলিয়ে গিয়েছিল সতীনাথের মন।

অকস্মাৎ একটা মোটর গাড়ির ব্রেক কসার শব্দে তার চমক ভাঙল।

একখানা অতি আধুনিক মডেলের ঝকঝকে নতুন মোটর আচমকা ব্রেক কসেছে একেবারে তারই দোকানের সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নেমে এল একটি অল্প বয়সী ছোকরা। রাস্তার পাশের খোলা নর্দমা পার হয়ে হাজির হল একেবারে সতীনাথের দোকানের সামনে।

এমন মোটরবিহারী খরিদ্দার এ অঞ্চলে বিরল। সতীনাথ তাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল দোকানের সামনে।

সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই আপনার ?

ছোকরা জবাব দিল, সিগ্রেট আছে ?

—আছে।

—দিন এক কৌটো।

—আজ্ঞে, কৌটো তো নেই। প্যাকেট আছে।

—প্যাকেট! তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে ছোকরাটি গাড়ির কাছে ফিরে গেল।

দোকানের আলো আর রাস্তার আলোয় মিশে যেটুকু চোখে পড়ল তাতে সতীনাথ বুঝতে পারল গাড়ির ভিতরে পুরুষ এবং মহিলা দুই-ই আছেন।

ছোকরাটি ফিরে এসে বলল, প্যাকেটই দাও দুটো।

—কি সিগেট দেব?

—কেন? গোল্ড ফ্লেক।

—গোল্ড ফ্লেক তো নেই।

—তাহলে কি আছে? ধমকে উঠল ছোকরাটি।

থতমত খেয়ে সতীনাথ বলল, 'কাঁচি' আছে, 'পাসিং শো' আছে

সতীনাথের কথার শেষে টিপ্পনি জুড়ে দিল ছোকরাটি, 'হাওয়া গাড়ি' আছে, 'রাম রাম' আছে। যত্ত সব।

আবার ছোকরাটি ফিরে গেল গাড়ির কাছে। কি যেন জিজ্ঞাসাবাদ করে তক্ষুনি ফিরে এসে বলল, ঠিক আছে, 'কাঁচি'ই দাও দু প্যাকেট।

—এখুনি দিচ্ছি।

পড়ি কি মরি করে সতীনাথ দোকানের চৌকির উপর উঠে উঁচু র‍্যাক থেকে একটা ফ্রেস প্যাকিং খুলে দু প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বের করে এনে ছোকরাটির হাতে দিতে যাবে, এমন সময়—

বেচারি সতীনাথকে একেবারে দিশেহারা করে দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে একটি সুবেশা মহিলা বেড়িয়ে এসে দাঁড়াল একেবারে সতীনাথের সামনে।

দুটি চোখে গভীর বিস্ময় এঁকে নিয়ে বলল, আপনি! এখানে! নির্জন সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত নবকুমারকে বুঝি এমনি পরম বিস্ময়ের

সঙ্গেই কপালকুণ্ডলা একদিন প্রশ্ন করেছিল, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

চমকে উঠল সতীনাথ।

বিস্ময়ে হতবাক, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহিলার দিকে চেয়ে। তার কথার কোন জবাবই দিতে পারল না।

মহিলা আবার বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

চমক ভাঙল সতীনাথের। জবাব যে একটা দিতেই হবে।

কিন্তু কি জবাব সে দেবে? বিদ্যুৎগতিতে স্মৃতির অনেকগুলো পাতা হাতড়েও এই মোটরবিহারিণী সুবেশা আধুনিকার সঙ্গে তার পরিচয়ের ক্ষীণতম সূত্রও সে আবিষ্কার করতে পারল না।

আমতা আমতা করে বলল, আমি—মানে আপনি—মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটু মিষ্টি হাসি খেলে গেল মহিলার মুখে। বলল, বুঝেছি।

ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, মিঃ দাস, আমার ব্যাগটা একটু দিন না দয়া করে।

—ওঃ ইয়েস্, বলে ভিতরে উপবিষ্ট মিঃ দাস হাত বাড়িয়ে একটি দামী ভ্যানিটি ব্যাগ মহিলার দিকে এগিয়ে দিল।

ব্যাগের ভিতর থেকে একখানি সুদৃশ্য আইভরি-ফিনিস কার্ড বের করে সতীনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে মহিলা বলল, এই কার্ডে আমার ঠিকানা আছে। যে কোন দিন সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে দয়া করে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সতীনাথ।

আমতা আমতা করে বলল, আমি—মানে আপনি আমাকে দেখা করতে বলছেন?

মহিলাটি চকিতে একবার চারদিকটা চোখ বুলিয়ে নিল। তাদের ঘিরে এরই মধ্যে কৌতূহলী জনতার একটা ছোটখাটো ভিড় জমে উঠেছে।

মুখ ফিরিয়ে সতীনাথের দিকে চেয়ে বলল, আজ্ঞে হাঁ, আপনাকেই বলছি। আমার বিশেষ দরকার আপনাকে দিয়ে। শিগগির যাবেন কিন্তু।

সতীনাথ হ্যাঁ না কিছুই বলবার সময় পেল না। কথা কয়টি বলেই মহিলাটি দ্রুত পায়ে গাড়ির ভিতরে যেয়ে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিল।

গাড়ি চলে যেতেই কৌতূহলী জনতা ঘিরে ধরল সতীনাথকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, নানা রকম সরস টীকা-টিপ্পনি কেটে তাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

—বলি ও দাদা, আপনি তো সোজা লোক নন। দিনরাত থাকেন তো এই একরত্তি দোকানের মধ্যে চোখ-মুখ বুজে বসে, ওদিকে তো দেখছি 'লাও' আপনার বেশ বড় গাছেই বাঁধা।

—হুঁ হুঁ বাবা, চালাকিটি নট্। খলসে নয়, পুঁটি নয়, একেবারে সিনেমা জগতের হিরোয়িন।

একজন তো সতীনাথের মুখের সামনে মুখ এনেই জিজ্ঞাসা করলেন, তা ভায়া ওর সঙ্গে তোমার পরিচয়টা হল কোন্ সূত্রে ?

বিহ্বলকণ্ঠে সতীনাথ বলল, কার কথা বলছেন আপনারা ?

—সেকি হে ? তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লে ? ওই যে গো, এইমাত্র যিনি তোমাকে যেচে কার্ড দিয়ে দেখা করতে বলে গেলেন ?

—ওঁকে তো আমি চিনি না।

—চেন না ? বল কি হে ? সিনেমা ওয়ার্লডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী সুলোচনা নন্দীকে চেন না ! কখনও ছবিও দেখ নি সিনেমার পোস্টারে ? ন্যাকা।

ল্যাম্প-পোস্টের স্বল্প আলোয় কার্ডখানা তুলে ধরে একনজর চোখ বুলিয়ে নিল সতীনাথ। কার্ডে লেখা : সুলোচনা নন্দী,......সাদার্ণ এভেনিউ।

চারিদিক থেকে নানারকম প্রশ্ন-বাণ তখনও সমানেই চলেছে।

—ও সব এড়িয়ে যাবার ফন্দি ছাড় ভাই। কবে যাচ্ছ বল সুলোচনা দেবীর বাড়ি আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবই।

—আমাকেও কিন্তু নিয়ে যেতে হবে।

বিমূঢ়ের মত সতীনাথ বলল, আপনারা বিশ্বাস করুন, সত্যি আমি ভদ্রমহিলাকে চিনি না। হয়তো ওর কোন রকম ভুল হয়েছে।

চারিদিক থেকে আবার মন্তব্যের ঝড় উঠল।

—খুব যে 'র‍্যাইস' মারছ দাদা?

—বড্ড গ্যাস দিচ্ছে রে। মওকা পেয়েছে কি না। চ—, কেটে পড়ি এখন। পরে চুপি চুপি এসে কাজ বাগাতে হবে।

একে একে সবাই সরে পড়ল।

জনবিরল রাস্তা ক্রমে জনশূন্য হয়ে এল।

স্বল্পান্ধকার দোকানঘরের চৌকিতে হাত-বাক্সটার সামনে বসে বিহ্বল বিমূঢ় সতীনাথ মনের খাতার পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে।

কে এই সুলোচনা নন্দী?

জীবনের কোন লগ্নে কোন্ সূত্রে ওঁর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল? পরিচয় কি সত্যি কখনও ঘটেছিল?

কিছুই তো মনে করতে পারে না সতীনাথ।

অথচ পরিচয়ের সূত্র যদি একটা নাই থাকবে কোথাও তাহলে ওই মহিলাই বা যেচে তাকে দেখা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবেন কেন?

সতীনাথের শৈশব কেটেছে পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে। স্কুলের লেখাপড়াও সেখানেই করেছে। আই. এ. পাশ করেছিল মফস্বল শহরের এক কলেজে পড়ে পিসিমার বাড়িতে থেকে। কাজেই অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার কোন সুযোগই কখনও আসে নি তার জীবনে।

তাহলে আজ অকস্মাৎ কোন্ পরিচয়ের সূত্র ধরে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী সুলোচনা নন্দী ?

চকিতেই একটি কিশোরীর একখানি ফুল্ল মুখ সতীনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রেবা। দয়াময়বাবুর মেয়ে।

দয়াময়বাবুর কল্যাণেই তো কলিকাতায় বি. এ. পড়তে গিয়েছিল সতীনাথ। সেখানেই তো রেবার সঙ্গে পরিচয়। অনাত্মীয় অপরিচিত সতীনাথের হৃদয়কে সেই তো একদিন ভরে দিয়েছিল সেবায় ও মমতায়।

কিন্তু রেবার পক্ষে তো সুলোচনা নন্দী হওয়া সম্ভব নয়। মাত্র কিছুদিন আগেও তো রেবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু সে যেন আর এক রেবা। অশ্রুমুখী বিষন্নবদনা। ব্যর্থ বধূ জীবনের দুঃসহ বেদনার ভারে অবনমিতা।

মাত্র দুটি বছরের ব্যবধানে তার পক্ষে তো সর্বজনস্নেহধন্যা লাস্যময়ী অভিনেত্রীতে পরিণতি লাভ করা সম্ভব নয়।

তাহলে কে এই সুলোচনা নন্দী ?

চকিতেই আর একটি কিশোরীর একখানি ধীর গম্ভীর মুখ সতীনাথের মনের সামনে ভেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রহস্যের কুয়াসা-জাল ছিন্ন হয়ে সুলোচনা নন্দীর পরিচয় সতীনাথের কাছে যেন দিনের আলোর মতই পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

অথচ কী আশ্চর্য, মাত্র কয়েক মিনিট আগে সরযুকে নিজের চোখের সামনে দেখেও সতীনাথ তাকে চিনতে পর্যন্ত পারে নি।

সরযু।

সতীনাথের দর্জিপাড়ার ছাত্রী।

ছায়াছবির মত একের পর এক অনেক ছবিই সতীনাথের মনের পর্দার উপর দ্রুত প্রতিফলিত হতে লাগল।

## ॥ ১৪ ॥

সেই সরযূ আজ ফিরে এসেছে বিখ্যাত সিনেমা-স্টার স্থলোচনা নন্দী হয়ে।

শুধু ফিরেই আসে নি, তেমনি মমতায় আবার তাকে ডাক দিয়েছে।

এমনি একান্ত করেই একদিন তাকে কাছে ডেকেছিল সরযূ। তার উপর নির্ভর করেছিল। সেদিন সতীনাথ ছিল কলকাতার নামকরা কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। তার সম্মুখে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোনালি সম্ভাবনা। তাই হয় তো জীবনের পংককুণ্ড থেকে উদ্ধার লাভের সাধনায় সরযূ সেদিন তাকে আকড়ে ধরতে চেয়েছিল।

কিন্তু আজ?

সরযূ আজ স্থলোচনা। দর্জিপাড়ার ছোট দোতলা বাড়ি হয় তো রূপান্তরিত হয়েছে সাদার্ণ এভেনিউর এক আধুনিক প্যালেসে। যশ-খ্যাতি-সমৃদ্ধির একেবারে শিখরচুড়ায় আজ সমাসীন হয়েছে সে।

আর জীবন-যুদ্ধে পরাস্ত পর্যুদস্ত ক্ষতবিক্ষত সতীনাথ ধাপে ধাপে নামতে নামতে আজ এসে দাঁড়িয়েছে একেবারেই নিচের তলায়। স্বপ্ন নেই, সাধনা নেই, বুঝিবা কোন সাধও নেই। শুধু দিন যাপনের আর প্রাণধারনের প্রাত্যহিক গ্লানি সয়ে সয়ে জীবনের পথে একঘেয়ে ক্লান্তিকর পদক্ষেপ।

তবু কেন স্থলোচনা এমন অপ্রত্যাশিত মমতায় তাকে আজ ডাক দিয়েছে আবার?

চিন্তায় অভিভূতচিত্তে দোকান ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দুই কামরা টালির ঘরের বাসায় ফিরবার পথে এই একটি মাত্র প্রশ্নই সতীনাথের মনকে বার বার নাড়া দিতে লাগল।

ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরল সতীনাথ।

কোন রকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরের রকে চুপটি করে বসে সেই একই ভাবনায় যেন বিভোর হয়ে রইল সে।

সংসারের কাজকর্ম সেরে এসে সুভদ্রা পর পর দুবার শুতে যাবার তাগিদ দিল। সতীনাথ যেন শুনেও শুনতে পেল না।

অগত্যা বিরক্ত হয়ে ঘরের কপাট টেনে দিয়ে সুভদ্রা শুয়ে পড়ল।

একবার সতীনাথ ভাবল, সুভদ্রাকে কাছে ডেকে সেদিনের সব কথা খুলে বলে। তার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে।

আবার পরক্ষণেই মনে হল, সুভদ্রাকে এ কথা জানানো বৃথা, তার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করাও বৃথা। তাতে ফল কিছু হবে না। শুধু অনর্থক তিক্ততাই বাড়বে।

অনেক রাত পর্যন্ত অনেক চিন্তার দোলায় দুলতে দুলতে এক সময়ে মনস্থির করে ফেলল সতীনাথ। সরযূর সঙ্গে দেখা সে করবে। এবং পরদিন সকালেই।

পরদিন সকালে একটু ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে সতীনাথ বালিগঞ্জে যাবার উদ্দেশ্যে বাসে চেপে বসল।

কার্ডের নম্বর মিলিয়ে ঠিক বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সতীনাথ।

কালো পাথরের নক্সা-করা গেটের গায়ে পিতলের ঝকঝকে নেম-প্লেট লাগানো : শিল্পী সুলোচনা নন্দী।

মুখ তুলে বাড়িটার দিকে একবার তাকাল সতীনাথ।

একেবারে আধুনিক প্যাটার্ণের নতুন বাড়ি। তকতক ঝকঝক করছে।

গেটের কাছে এগোতেই উর্দিপরা নেপালী দরোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল একটা।

বিস্মিত হল সতীনাথ। তার মত দীনহীন লোককেও সেলাম!

পরে সতীনাথ জেনেছিল এটা এ বাড়ির নিয়ম। সুলোচনার কড়া নির্দেশ, যে কোন অতিথিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

পকেট থেকে কার্ডখানা বের করে দেখাতেই তাকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেল দরোয়ান। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার বাইরের কলিং বেলের বোতামটি টিপল। একটু পরেই নিচে নেমে এল বুড়ো চাকর নীলমণি।

তাকে কার্ডখানা দেখাতেই সসম্ভ্রমে সতীনাথকে ঘরের ভিতর নিয়ে একখানা আসন এগিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি দরকার বলুন।

কার্ডখানা তার দিকে এগিয়ে ধরে সতীনাথ বলল, এখানা তোমাদের মনিবকে দাও গে।

কার্ডখানা নিতে নিতেই সে প্রশ্ন করল, কি নাম বলব

—বলবে, সতীনাথবাবু এসেছেন।

—আচ্ছা।

নীলমণি চলে গেল। সতীনাথ ঘরখানার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল।

আধুনিক রুচি অনুযায়ী সাজানো ঘর।

দেয়ালে দুখানি অয়েল পেন্টিং। সতীনাথ দেখেই চিনতে পারল, সরযুর বাবা ও মা।

সরযুর মা কি তাহলে বেঁচে নেই?

ঘরে ঢুকল সুলোচনা।

সদ্য স্নান সেরে এসেছে। এলো চুল পিঠের উপর ছড়ানো। পরনে ঢাকাই শাড়ি। কপালে চন্দনের ফোঁটা।

দর্জিপাড়ার বাড়িতে সরযুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটির কথা মনে পড়ে গেল সতীনাথের।

আশ্চর্য। ঢেউয়ের অবিশ্রাম আঘাতে আঘাতেও কি বেলাভূমির কোন পরিবর্তন হয় না? মানুষ কি সব উত্থান-পতন আঘাত-সংঘাতের ঊর্দ্ধে চির অপরিবর্তনীয়?

সুলোচনা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল সতীনাথ। গলায়

আঁচল জড়িয়ে তাকে প্রণাম করে সুলোচনা বলল, আপনি বসুন মাস্টারমশায়।

সতীনাথ বসল। একটা মোড়া টেনে নিয়ে তার মুখোমুখি বসল সুলোচনা। মৃদু হেসে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি তো?

—চিনতে আমি পেরেছি। তবে একটু দেরিতে।

—তবু আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। উঃ, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল বলুন তো? এ জীবনে আর কখনও যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে এ তো আমি ভাবতেই পারি নি।

সতীনাথ কোন কথা বলতে পারল না। একবার সুলোচনার মুখের দিকে চেয়েই অপরাধীর মত মাথা নিচু করল।

কথা বলল সুলোচনা, কাউকে কিছু না বলে সেই যে একদিন আপনি কলকাতা থেকে চলে গেলেন, তারপর থেকে আপনার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। মা লোক পাঠিয়ে আপনার মেসে খোঁজ নিয়েও কিছুই জানতে পারল না। আপনার বাড়ির ঠিকানা তাঁরা কেউই জানতেন না। আপনি চিঠি দিলেন একখানা। তাতেও ঠিকানা দিলেন না।

সতীনাথ কোন মতে জবাব দিল, সে অনেক কথা। আজ থাক। যদি সময় পাই, একদিন সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব। সব কথা শুনলে আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

সুলোচনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলবেন না মাস্টারমশায়। ওতে আমার অপরাধ হয়। কিন্তু যাক সে সব কথা। আপনি এখন কেমন আছেন তাই বলুন।

—আমি—মানে—

—দোকানটা কার?

—আমিই করেছি দোকানটা। ওতেই কয়েকটা প্রাণীর কোন রকমে চলে যায়।

—তা হয় তো যায়। কিন্তু এ আপনি কী করেছেন?

সুলোচনার কণ্ঠস্বর যেন আর্তনাদের মত শোনাল।

চমকে সতীনাথ বলল, কি করেছি?

—এই মুদিখানার দোকান। এতো আপনার করবার কথা নয়।

—কি করবার কথা যে কার কপালে লেখা থাকে তা কি কেউ বলতে পারে? তুমিই কি কোন দিন জানতে—

বাধা দিল সুলোচনা, আমার কথা এখন থাক মাস্টারমশায়। আপনার কথা শোনবার জন্যই আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। আমি বলি কি, ও আপনি ছেড়ে দিন।

—কি ছেড়ে দেব?

—ওই দোকান।

—সে কি? ও দোকান ছেড়ে দিলে খাব কি?

দৃঢ়কণ্ঠে সুলোচনা বলল, ওই দোকান ছাড়া করে খাবার আরও অনেক পথ আছে পৃথিবীতে।

—তা হয় তো আছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু করবার শক্তি আমার নেই।

—মিথ্যে কথা। নিজের শক্তির কথা আপনি নিজেই জানেন না, তাই ও কথা বলছেন। নিজেকে এ ভাবে তিলে তিলে ক্ষয় করে ফেলতে আপনি পারবেন না।

—বেশ তো, তাহলে তুমিই বলে দাও, ও দোকান ছেড়ে দিয়ে আমি কি করব?

—আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন। যে কোন বড় ভাল কাজ। বেশ তো, ব্যবসা করাই যদি আপনার ইচ্ছে তাহলে তাই করুন। বেশ বড় দেখে যে কোন একটা ব্যবসায় হাত দিন।

সুলোচনার কথাগুলো যে কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিল সতীনাথ। তবু বলে উঠল, বড় ব্যবসায় হাত দেব আমি? তুমি বলছ কি সরযু?

—কেন? অন্যায় কিছু বলেছি কি?

—কাল আমাকে যে অবস্থায় দেখেছ তাতেও কি আমার এখনকার অবস্থা তুমি বুঝতে পার নি?

—পেরেছি মাস্টারমশায়, বুঝতে খুবই পেরেছি। বুঝতে পেরেছি বলেই তো কাল সারাটা রাত একটা দারুণ অস্বস্তিতে আমি ছটফট করেছি। কেবলি মনে হয়েছে, এ কী হল? কোথাকার মানুষ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন?

—কিন্তু বড় ব্যবসা যে করব আমার সে সামর্থ্য কোথায়?

—আপনি টাকার কথা বলছেন তো? দেখুন মাস্টারমশায়, আপনাদের আশীর্বাদে আজ আমার টাকার কোন অভাব নেই। কিন্তু এমন কোন মানুষ আজ আমার আশেপাশে নেই, একটু স্নেহ একটু আদরের জন্য যার মুখের দিকে মুখ তুলে আমি তাকাতে পারি?

—কিন্তু আমি—

—এর মধ্যে আর কোন কিন্তু আপনি করবেন না। আপনার মনের কথা আমি হয় তো ঠিক জানি না। কিন্তু যেদিন আপনাকে প্রথম দেখেছি সেই দিন থেকেই আপনাকে আমি পরমাত্মীয় বলেই মনে করেছি। কি জানেন মাস্টারমশায়, চারদিক থেকে অনবরত ছিঃ ছিঃ আর দুর্ দূর্ শুনে শুনে বড় যন্ত্রণায় যখন আমার দিন কাটছিল, তখন একমাত্র আপনিই শুনিয়েছিলেন আশার বাণী। সে কথা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।

—কিন্তু সরযু, তোমার জন্য আমি তো কিছুই করতে পারি নি।

—যা চোখে দেখা যায় সেইটেই কি সব মাস্টারমশায়? আপনি আমার জন্য যে কী করেছেন সে কথা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আজ যদি মা বেঁচে থাকত—

—তোমার মা কতদিন মারা গেছেন?

—তা প্রায় দু বছর হবে। মরবার সময় চোখের জলে দুই চোখ ভরে কতবার যে মা আপনার কথা বলেছিল—

—কি বলেছিলেন তিনি আমার কথা?

—বলেছিলেন, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যে পথে তুই এসে পড়েছিস খুকী, তাতে অর্থের অকুলান হয় তো আর কোন দিন তোর হবে না। তবু যদি কখনও কোন বিপদে পড়িস, এ জগতে দুটি লোক তোর সহায় রইল জানিস। একজনের কাছে তোকে যেতে বলবার মুখ আমার নেই। আর একজন সতীনাথ। কেন যে সে বলে না কয়ে এমন করে সে একদিন চলে গেল কে জানে। তবু যদি কখনও তার দেখা পাস, একান্ত আপনার জন মনে করেই তার উপর তুই ভরসা রাখিস।

—বল কি সরযু, এমন কথা তিনি বলেছিলেন?

—তাই তো বলছি মাস্টারমশায়, এতদিন পরে যদি ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েছি, আর আপনাকে আমি ছেড়ে দেব না। আপনি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকলে তবেই তো আমি সুখী হতে পারব। আপনি ছাড়া আমার দিক থেকে কারও যে আর কেউ নেই।

সুলোচনার দুটি টানা চোখের পাতে দুটি অশ্রুবিন্দু টলমল করতে লাগল।

সেদিকে চেয়ে সতীনাথ বলে উঠল, আমি কথা দিচ্ছি সরযু, আমার পক্ষে তোমার জন্য যদি কখনও কিছু করা সম্ভব হয় আমি তা নিশ্চয় করব।

রৌদ্রস্নাত শিশিরবিন্দুর মত সুলোচনার দুটি অশ্রুসিক্ত চোখ উৎসাহে ও আনন্দে যেন নেচে উঠল। সহাস্যে সে বলল, তাহলে আপনি কথা দিলেন. বরানগরের ও-পাট তুলে দিয়ে বড় দেখে একটা ব্যবসা করবেন আপনি? আর সে জন্য যত টাকা লাগে আমি দেব? আপনি তাতে বাধা দেবেন না বলুন?

সতীনাথ সংযত কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সরযু, সে কথা তোমাকে আমি দিতে পারব না।

—কিন্তু কেন পারবেন না? এতে বাধাটা কোথায়?

—না না, তা হয় না সরযু, তা হয় না?

—কিন্তু কেন হয় না সেইটেই যে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মাস্টারমশায়।

—দেখ সরযু, শুধু তোমাকে আর আমাকে নিয়েই তো এ সংসার নয়। আমার পরিবার আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে, তারা এটাকে সহজ ভাবে তো নাও নিতে পারে। কেন এই দেনা-পাওনার হিসেব টেনে এনে অকারণে ঝঞ্ঝাট বাড়াবে? তাছাড়া কি জান, টাকা-পয়সা বড় খারাপ জিনিষ। মানুষের সহজ সম্পর্কের মধ্যে ওরা ঘুণ ধরায়—

নিজের ঝোঁকেই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল সতীনাথ। মাঝপথেই বাধা দিল সুলোচনা, ও কথা থাক মাস্টারমশায়, ও কথা থাক। আমারই ভুল হয়েছে, আমিই ভুলে গিয়েছিলাম যে পৃথিবীতে আর সকলের মতই আপনারও পরিবার আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে, শুধু আমারই কিছু নেই, কেউ নেই। আত্মীয়-পরিজনহীন সমাজের এক জঞ্জাল আমি।

অভিমানে বিক্ষুব্ধ সুলোচনার গলার স্বর। সে স্বর শুনে বড়ই বিব্রত বোধ করল সতীনাথ। বলল, এটা তোমার অকারণ অভিমান। নইলে তুমি ভালভাবেই জান যে সমাজের জঞ্জাল তুমি নও। বরং আজকে তুমি সমাজের মাথার মণি। তোমাকে নিয়ে মানুষের আজ যত কৌতূহল, যত আকর্ষণ, এত আর কাউকে নিয়ে নয়। তোমার এই বাড়ি, গাড়ি, সমাজে এই প্রতিপত্তি—

গভীর আবেগে বাধা দিল সুলোচনা, ভুল মাস্টারমশায়, আর দশ জনের মত এও আপনার ভুল। আমাকে নিয়ে, আমার এই বাড়ি-গাড়ি নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই, সে আমি জানি। কিন্তু সে যে শুধুই কৌতূহল, সার্কাসের খাঁচার ভিতরকার বাঘকে দেখবার জন্য মানুষের যে কৌতূহল, অবিকল সেই কৌতূহল মাত্র। দূর থেকে তারা আমাকে দেখতেই চায়। কাছে এলেই আঁতকে ওঠে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত পরিহার করে চলে।

—এ তুমি কি বলছ সরযু?

—ঠিকই বলছি মাস্টারমশায়, অনেক দুঃখেই বলছি। কি জানেন মাস্টারমশায়, আজ যখন সমাজের উপরতলার হোমরা-চোমরা লোকগুলো দামী মোটরে চেপে ফুলের মালা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসে, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা যখন তখন তাদের সব সাংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবার প্রস্তাব নিয়ে এসে আমার একটা অটোগ্রাফের জন্য ধর্ণা দেয়, তখন আমার একদিকে যেমন হাসি পায়, তেমনি কান্নাও পায়। তখন আমার কেবলি মনে পড়ে, এরাই একদিন একটি নিরীহ কিশোরীকে স্কুল থেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এদের পাশে বসবার একটু জায়গা পর্যন্ত দেয় নি।

সুলোচনার অন্তরের গভীর বেদনটা যে কোথায়, আজকের এই গাড়ি-বাড়ি যশ-খ্যাতির প্রলেপেও যে সে বদনার ক্ষতটা ঢাকা পড়ে নি, এতক্ষণে যেন সেই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল সতীনাথ।

আর সেই উপলব্ধির সঙ্গেই সুলোচনার প্রতি একটা গভীর স্নেহ ও মমতায় আগেকার দিনের মতই তার সমস্ত মনটা যেন কাণায় কাণায় ভরে উঠল। সাদর কণ্ঠে সে বলে উঠল, ও সব কথা থাক। আমি বুঝতে পেরেছি। ভুল আমারই হয়েছিল। তোমার আজকের এই ঐশ্বর্য ও আরামের ছবি দেখে সেদিনের সব কথাই কেমন যেন ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

সাগ্রহে বলে উঠল সুলোচনা, মাস্টারমশায়, অন্তত আপনি যেন এ ভুল আমাকে বুঝবেন না কোনদিন। আপনি বিশ্বাস করুন মাস্টারমশায়, আজ আপনি আমাকে যা দেখছেন, যে রূপে দেখছেন, এ আমি হতে চাই নি। এই গাড়ি-বাড়ি যশ-খ্যাতি এ আমি আজও অন্তর দিয়ে চাই না। এ সবের মূল্য আমার কাছে খুব বেশী নয়।

সতীনাথের ইচ্ছা হল একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কি তুমি চাও সরযু তা তো খুলে বললে না। কিন্তু সে কথা বলবার আগেই

আবার কথা বলল সুলোচনা, এই দেখুন, কথায় কথায় আপনাকে চা দেবার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছি। আপনি একটু বসুন মাস্টার-মশায়, আমি এখুনি আসছি।

সুলোচনা চলে গেল। সতীনাথ ঐশ্বর্য ও আরামের বহু উপকরণ ছড়ানো সেই নির্জন ঘরে একলা বসে আকাশ-পাতাল অনেক কথাই ভাবতে লাগল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল নীলমণি। হাত জোড় করে বলল, আপনি উপরে চলুন, মা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

নীলমণির পিছনে পিছনে দোতলার একখানি অনাড়ম্বর শোবার ঘরে ঢুকল সতীনাথ। বুঝতে পারল, সুলোচনার শোবার ঘর এখানা।

দর্জিপাড়ার [illegible] কোটি [illegible]র কথা চকিতেই মনে পড়ে গেল। সতীনাথের [illegible], দুখানা ঘরের [illegible] সত্ত্বেও [illegible] মধ্যে। মনে কিন্তু আছে, [illegible] ঠিক [illegible] সেদিনের সবটু[illegible] সুলোচনার মধ্যে। [illegible] থালার [illegible]।

একখানি [illegible] পায়ের উপর প্রচুর জল-খাবার সাজিয়ে নিয়ে সু[illegible] এটি কোণ [illegible] দাঁড়িয়েছিল। সতীনাথ ঘরে ঢুকতেই [illegible] বলল, আসুন।

আসনখানা একটু [illegible] দিয়ে বলল, বসুন।

আসনে বসতে বসতেই সতীনাথ বলল, তুমিও বস।

সুলোচনা কোন কথা বলল না। একটু হাসল শুধু।

ছোট খাট সাধারণ আলাপের ভিতর দিয়ে খাওয়া শেষ করল সতীনাথ। টেবিল থেকে একটা সুদৃশ্য মশলার কৌটো এগিয়ে দিল সুলোচনা।

এক সময়ে সতীনাথ বলল, কবে একদিন দুদিনের জন্য তোমাকে পড়াতে গিয়েছিলাম। তাও নিঃস্বার্থ ভাবে নয়, নিজের টাকার

গরজেই, সেই কথা এতদিন পরেও তুমি এমন ভাবে মনে করে রেখেছ, আমার মত একটা নেহাৎই পথের লোককে ডেকে এনে এমন আদর যত্ন করছ, এ আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য লাগছে সরযু।

সুলোচনা ভাঙা গলায় বলল, জানি না, হয় তো আশ্চর্য লাগবারই কথা। কিন্তু কি জানেন, আমার কাছে এর চেয়ে স্বাভাবিক যেন আর কিছুই হতে পারে না। আপনাকে এমন ভাবে পাশে বসে খাওয়াবার সৌভাগ্য আমার কোন দিন হবে এ যে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। অথচ কাল সন্ধ্যায় আপনাকে দেখবার পর থেকে আমার কেবলি মনে হচ্ছে, মানুষের মনের সব ইচ্ছাকেই ভগবান চিরকাল অপূর্ণ রাখেন না।

নিজের অজ্ঞাতেই সত্যনাথ আবার বলে উঠল, আশ্চর্য।

আবার একটা মৃদু মধুর হাসি খেলে গেল সুলোচনার ঠোঁটে। ধীর পায়ে হেঁটে যেয়ে দেয়ালে লাগানো আলমারিটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা দেরাজ টেনে বের করল।

সযত্নে একটা পুরনো খাম তার ভিতর থেকে হাতে নিয়ে সত্যনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দেখুন তো এখানা চিনতে পারেন কি না।

হাত বাড়িয়ে খামখানা নিল সত্যনাথ। উল্টে-পাল্টে দেখল। নেহাৎই একখানা সাদা খাম। কোন নাম-ঠিকানা লেখা নেই। ছাপ নেই কোন ডাক-ঘরের।

বিস্মিত চোখ তুলে সুলোচনার দিকে তাকাল সত্যনাথ।

সুলোচনা তেমনি মৃদু হেসে বলল, খামখানা খোলাই আছে।

গভীর কৌতূহলে খামখানা খুলে তার ভিতর থেকে একখানা পুরনো লেখা পোষ্টকার্ড বের করল সত্যনাথ।

পোষ্ট-কার্ড খানার উপর চোখ পড়তেই যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল সত্যনাথ।

পৃথিবীতে এমন ঘটনাও কি ঘটে!

তুচ্ছ জিনিষও কি এমন মহামূল্যবান হয়ে ওঠে কখনও!

• আশ্চর্য! কার্ডখানার উপর বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে সতীনাথ হতভম্বের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কথা বলল সুলোচনা, চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়। দেশের বাড়ি থেকে যে চিঠি আপনি আমাকে লিখেছিলেন তাই।

—সেই চিঠি তুমি এতদিন ধরে যত্ন করে রেখে দিয়েছ?

—না রেখে কি করি বলুন? আপনার একখানা ফটো চেয়েছিলাম, তা তো আর আপনি দিলেন না?

নিজেকে যেন বড্ড অক্ষম, বড়ই অপরাধী বলে মনে হতে লাগল সতীনাথের। জীবনের আর্থিক জয়-পরাজয়ের দৌড়ে সে হেরে গেছে, সে জন্য তার মনে দুঃখ কিছুটা থাকলেও কোন গ্লানি নেই। সে মনে করে, ভাগ্যের মারের উপরে তার কোন হাত নেই। সে এখানে একান্তই নিরুপায়। কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম ভাবের ক্ষেত্রেও একটি মেয়েমানুষের কাছে যে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই সে এমন ভাবে হেরে একেবারে ভূত হয়ে আছে, সে সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় সতীনাথের যেন লজ্জা ও অপরাধ-বোধের আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

অভিভূত গলায় সে বলে উঠল, কিন্তু তোমার জন্য তো আমি কিছুই করতে পারি নি কোনদিন। আর কোনদিন যে পারব তারও তো কোন ভরসা নেই।

এ কথার তখনি কোন জবাব দিল না সুলোচনা। আলমারির টানার ভিতর থেকে বের করে আনল একটা দামী নক্সা-কাটা কাশ্মিরী কাঠের বাক্স। তার ডালাটা খুলে সেটাকে রাখল সতীনাথের সামনে টি-পয়ের উপরে।

সতীনাথ প্রশ্ন করল, কি আছে এতে?

—দেখুন।

বাক্সের ভিতর থেকে বের হল কয়েক খানা পুরনো এক্সারসাইজ খাতা। তার উপরে সরযুর নাম লেখা।

খাতার পাতা উল্টে সতীনাথ দেখল, সরযুর ছাত্রী-জীবনের নানা

রকম কাজের খাতা সেগুলো। মুখ তুলে বলল, এগুলো ?

—আপনি যখন পড়াতেন আমাকে সেই সময়কার খাতা ওগুলো। আপনার নিজের হাতে অনেক কারেকশন করা আছে। আপনার নামের সই-ও আছে। একদিনের কাজের উপর 'রিমার্ক' লেখা আছে 'গুড্'। লেখাপড়ায় তো আর 'গুড্' হতে পারলাম না, তবু মাঝে মাঝে ওগুলোর পাতা উল্টে একটু সান্ত্বনা পাই। মনে মনে ভাবি, পৃথিবীটা যদি আমার বিরুদ্ধে এমন করে না লাগত তাহলে হয় তো আমি 'গুড্' হতে পারতাম। অন্তত আপনার ব্যবহারে, আপনার কথা শুনে সেদিন সেই বিশ্বাসই তো আমার হয়েছিল।

সতীনাথ সবিস্ময়ে বলে উঠল, আমার কথা শুনে ?

—হ্যাঁ, মাস্টারমশায়। একটু আগেই আপনি বলছিলেন না আমার জন্য আপনি কিছুই করতে পারেন নি। ওটাও আপনার ভুল ধারনা। যেটা চোখে দেখা যায় সেইটেই কি মানুষের কাছে সব ? তা নয় মাস্টারমশায়, তা কখনও নয়। কি জানেন, চারদিক থেকে টিকটানা ছিঃ ছিঃ শুনতে শুনতে নিজের উপরেই নিজের যখন প্রায় ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে আপনিই বুঝি সর্বপ্রথম আমাকে মানুষ বলে গ্রহণ করলেন, মানুষের মত বাঁচবার অধিকারের কথা আমাকে শোনালেন। সেদিন আপনার কাছ থেকে সে আশ্বাস পেয়েছিলাম বলেই হয় তো আজও এই পৃথিবীতে মানুষের মত মাথা উঁচু করে চলতে পারছি। একে কি আপনি কম পাওয়া বলেন মাস্টারমশায় ?

—তোমার এ প্রশ্নের কোন জবাব আজ আমি দিতে পারছি না সরযু। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার মাথার মধ্যে। তুমি আমার কাছ থেকে কি পেয়েছ তা তুমিই জান। কিন্তু তোমাকে দেখে আজ যেন আমি নতুন করে নিজেকে ফিরে পেলাম। দুঃখী শুধু তুমি একাই নও সরযু, দুঃখের অন্ত আমারও নেই। না

না, টাকা-পয়সার দুঃখের কথা আমি বলছি না। সংসারের অভাব-অনটনের ঊর্ধ্বে যে মানুষের বাসা সেই মানুষের দুঃখের কথা বলছি। সেখানে যে তুমি-আমি সমান দুঃখী।

—এ আপনি কি বলছেন মাস্টারমশায়?

—সব কথা আজ তোমাকে আমি খুলে বলতে পারব না সরযু। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে আজ তুমি আমাকে যে সম্মান যে মর্যাদা দিলে, নিজেকে তার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। আর তার জন্য যদি তোমার কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়, তাহলে হাত পাততে এতটুকু সংকোচ আমি করব না।

—করবেন না মাস্টারমশায়, সংকোচ করবেন না। দেখুন, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যে পথে আজ আমি এসে পড়েছি, তাতে অর্থের আজ আর আমার অভাব নেই। কিন্তু চারদিকে যখন তাকাই তখন এমন একটি মানুষকেও দেখতে পাই না জীবনের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ সব কিছু নিয়ে যার উপর নির্ভর করতে পারি। এ যে মানুষের পক্ষে কত বড় দুঃখ তা আপনি বোঝেন। তাই তো কাল ঘটনাচক্রে যখন আপনাকে খুঁজে পেয়েছি, আপনার উপরেই আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে দিন।

—দেখ সরযু, আমার মধ্যে এমন কি তুমি দেখেছ যাতে পরম নিশ্চিন্ততায় আমার উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভর করতে চাইছ তা তুমিই জান। কিন্তু নিজেকে তো আমি জানি। আমার যে কত অক্ষমতা, কত অসহায়তা, তার প্রমাণ তো তুমি একবার পেয়েছ। তোমাকে আশ্বাস দিয়ে, ভরসা দিয়ে আবারও যদি তা রক্ষা করতে না পারি!

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল সুলোচনার। একটু ভেবে সে বলল, একদিন আপনি আমাকে একটা কথা দিয়েছিলেন মাস্টারমশায় মনে পড়ে?

—কি কথা?

—বলেছিলেন, আমি যাতে কষ্ট পাই এমন কোন কাজ আপনি কোনদিন করবেন না। মনে আছে?

—আছে।

—তাহলে আরও একটা কথা মনে রাখবেন।

—কি?

—আপনি বরানগরের সেই দুঃখের মধ্যে পচে মরবেন আর এখানে আমি টাকার উপর শুয়ে ঘুমুব, এর চেয়ে বড় কষ্ট আজ আর আমার কিছু নেই।

সুলোচনার কথা শুনে আর একবার হতবাক হয়ে গেল সতীনাথ। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সুলোচনাই আবার বলল, এর বেশী আর কিছু আমার বলবার নেই। এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।

কোন রকমে কথা কয়টি শেষ করে মুখ নিচু করে বসে রইল সুলোচনা।

সতীনাথও চুপচাপ বসে রইল অনেক ক্ষণ। তারপর এক সময়ে বলল, আজ আমি উঠি। বেলা অনেক হল।

—আবার কবে আসবেন?

—সময় পেলেই আসব। তোমার কথা আর আমার ভুল হবে না।

কম্পাউণ্ডের ভিতরকার লাল সুড়কির পথটা পার হয়ে সদর গেট অবধি সতীনাথের সঙ্গে সঙ্গেই এল সুলোচনা।

পথে নেমে খানিকটা যেয়ে পিছনে ফিরে একবার তাকাল সতীনাথ। সুলোচনা তার দিকে চেয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে তখনও।

## ॥ ১৫ ॥

অনেক চিন্তার উথাল-পাথালে দুলতে দুলতেই বাসে উঠে বসল সতীনাথ।

সুলোচনার আজকের আচার-আচরণ, আলাপ-আলোচনার কোন হদিসই যেন সে করতে পারছিল না। কবে একদিন নেহাৎই অর্থের তাগিদে তাকে সে পড়াতে গিয়েছিল, শুনিয়েছিল গোটাকয় আশ্বাসের বাণী, তাকেই এই দীর্ঘকাল ধরে একান্ত নির্ভরতায় আঁকড়ে ধরে আছে সে। অর্থে-বিত্তে যশ-খ্যাতিতে পরিপূর্ণ হয়েও সেদিনের কথা সে ভোলে নি। বরং দ্বিগুণ তীব্রতায় আজও সে তার মত একজন অক্ষম অসহায় মানুষের উপরেই নির্ভর করতে চায়। তার কল্যাণ কামনায়, তার সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার বাসনায় নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে চায়।

এ কি করে সম্ভব হল?

সুলোচনার এই হৃদয়াবেগ যে একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস বা উপচিকীর্ষামাত্র নয়, তার প্রমাণ তো সতীনাথ নিজের চোখেই দেখে এল। কবে সে তাকে নিজের একখানা ফটো দিতে চেয়েছিল, কথাপ্রসঙ্গে একদিন কোন্ প্রতিশ্রুতি তাকে দিয়েছিল, তার প্রতিটি অক্ষর সে স্মৃতির মণি-কোঠায় সঞ্চয় করে রেখেছে।

দীর্ঘ দশ বছর আগে যে একখানিমাত্র চিঠি সে তাকে লিখেছিল—তাও অনুরাগে রঞ্জিত কোন প্রণয়-লিপি নয়, নেহাৎই বেদনাদায়ক একখানি গতানুগতিক চিঠি, তাকেই সে মহামূল্যবান যক্ষের ধনের মত সযত্নে রক্ষা করে রেখেছে। এমন কি তার হাতের লেখা, তার স্বাক্ষর আছে বলে ছাত্রীজীবনের নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর সব টাস্কের

খাতাগুলো পর্যন্ত আলমারিতে দামী কাঠের বাক্সে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে।

এ অহৈতুকী অনুরাগ কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

নিজের মনেই এক সময় এ-প্রশ্নের জবাব দিল সতীনাথ।

অসম্ভবই বা কেন হবে?

এমন অকারণ মমতার পরিচয় কি সে নিজের জীবনেই এর আগেও পায় নি?

অল্প হোক বেশী হোক, সকারণ হোক আর অকারণ হোক, সরযূকে সেদিন সেই পরিস্থিতিতে নিয়মিত পড়াতে যেয়ে, সব জেনে শুনেও তার সঙ্গে মানুষের মত সহজ সরল ব্যবহার করে, তার কিছুটা উপকার হয় তো নিজের অজ্ঞাতেই সতীনাথ সেদিন করেছিল।

কিন্তু রেবা?

রেবার কোন উপকারই তো সে কোন দিন করে নি। বরং উপকৃতই হয়েছে সর্বভাবে। রেবার বাবার সুপারিশেই কলকাতা থেকে বি. এ. পড়বার ব্যবস্থা হয়েছিল সতীনাথের। একটি সহায়-হীন পল্লী-তরুণকে সেবায় ও সাহচর্যে সেই তো কৃতকৃতার্থ করে দিয়েছিল। বিনিময়ে তাকে কিছুই তো দিতে পারে নি সতীনাথ। বুকের তলে হয়তো হিল্লোলিত হয়েছে অনুরাগের তরঙ্গ, কিন্তু একটি পরাশ্রিত তরুণের মুখ দিয়ে তার ক্ষীণতম প্রকাশ তো কোন দিন ধ্বনিত হয় নি। একটি অক্ষম তরুণের ক্ষণিকের ভুলেও তো সে অনুরাগ রূপ পায় নি ন্যূনতম কোন ব্যবহারে।

তবু কেন তার প্রতি এমন অহেতুক মমতায় আর গভীর সহানুভূতিতে ভরেছিল রেবার মনের পাত্র?

সুলোচনার কথা ভাবতে ভাবতে রেবাকেই মনে পড়ে গেল নতুন করে।

ভাগ্যের সন্ধানে তখন জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে মরছে সতীনাথ।

কোথাও এতটুকু ঠাঁই মিলছে না। কপালে ঘটছে না ন্যূনতম জীবিকা অর্জনের কোন সুযোগ।

ঘুরতে ঘুরতেই একদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল গ্রামের মহাজন কৃষ্ণচরণের কথা। সতীনাথদের গ্রামেরই মানুষ। ব্যবসা উপলক্ষে থাকেন বহুদূর বিদেশে—গৌরীপুর নামে একটি উপশহরে। সেখানে তাঁর কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিও আছে বলে সে শুনেছে। তাই তাঁকেই ভরসা করে একদিন গৌরীপুর যেয়ে হাজির হল সতীনাথ।

ট্রেনটা গৌরীপুর পৌঁছে তুপুবেব পরে। স্টেশন থেকে খোঁজ করে সতীনাথ সোজা যেয়ে উপস্থিত হল কৃষ্ণচরণের গদাতে।

তুপুরের দিবানিদ্রাটি সমাধা করে কৃষ্ণচরণ তখন গদীঘরের বারান্দায় একখানা চেযারে বসে থেলো হুকোয় তামাক টানছিলেন।

ছোট বিছানা আর স্যুটকেসটা একপাশে রেখে পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল সতীনাথ।

কৃষ্ণচরণ চশমাটা নাকের নিচে আর একটু টেনে নামিয়ে চোখ তুলে বললেন, কে? কে তুমি?

—আজ্ঞে আমার নাম সতীনাথ। স্বর্গীয় দাননাথ মজুমদারের ছেলে আমি।

—দাননাথ? আমাদের গাঁয়ের দীননাথ মানে দীনুর ছেলে তুমি।

—আজ্ঞে।

—তা এখানে কি মনে করে? তুমি তো শুনেছি অনেক লেখাপড়া করেছ। তা চাকরি-বাকরি কি করছ?

সলজ্জ গলায় সতীনাথ বলল, আজ্ঞে, পড়শুনো মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে গেছে। বাবাও মারা গেছেন। তাই—

—কি বললে? দীনু মারা গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদিন হল?

—আজ্ঞে তা প্রায় বছর দুই হবে।

চুপ করে কী যেন ভাবলেন কৃষ্ণচরণ। তারপর বললেন, বিদেশে পড়ে আছি। দেশ-গাঁয়ের কোন খবরই তো পাই না। তা তুমি এখন কি করছ তাহলে?

—আজ্ঞে, কাজকর্মের কিছুই সুবিধা করতে পারি নি। বাড়িতেই বসে ছিলাম। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি। যদি একটা কোন সুবিধে-টুবিধে—

মৃদু হেসে কৃষ্ণচরণ বললেন, আমি ব্যবসাদার মানুষ। তোমার মত লেখাপড়া-জানা ছেলের কি সুবিধে আমি করব?

সতীনাথের নিজেরও সে বিষয়ে কোন ধারনা নেই। তাই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন জবাব দিল না।

কৃষ্ণচরণই আবার বললেন, যাকগে, সে যা হয় পরে দেখা যাবে। তুমি আমার এখানেই উঠেছ তো?

সকুণ্ঠ ভাবে সতীনাথ বলল, আজ্ঞে, আপনি ছাড়া—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওরে পূর্ণ—

কৃষ্ণচরণবাবু লো‘ ‘ ভাল। দেশপ্রীতিও আছে। সাদরেই তিনি সতীনাথকে আশ্রয় দিলেন। তার কাজের জন্য কিছুটা চেষ্টাও করলেন। স্থানীয় একটা পা টর আপিসে একদিন নিয়েও গেলেন সঙ্গে করে। কিন্তু সতীনাথ পাটের ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি। আপিসের বড়বাবু বললেন, বুঝতেই তো পারেন কৃষ্ণচরণবাবু, আমাদের কোম্পানির কাজ। উনিও একেবারেই আনকোরা নতুন। এ অবস্থায়—। তার চেয়ে ...ং আপনার গদীতে বসিয়েই একটু ট্রেনিং দিয়ে দিন। তারপর যদি আপনি চান আমরা ওকে নিয়ে নিতে চেষ্টা করব।

কৃষ্ণচরণবাবু বিচক্ষণ লোক। এ নিয়ে আর কোন রকম পীড়া-

পীড়ি করলেন না। সতীনাথকে নিয়ে গদীতে ফিরে এলেন। সারাপথ একটি কথাও বললেন না।

সতীনাথ ভয় পেয়ে গেল। বুঝতে পারল, এবার এখান থেকেও তল্পি গুটোতে হবে।

কিন্তু কৃষ্ণচরণবাবুকে চিনতে তখনও বাকি ছিল সতীনাথের।

চিনতে পারল সন্ধ্যার পরে।

সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে গদীঘরের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন কৃষ্ণচরণ। সেখানেই ডেকে পাঠালেন সতীনাথকে।

সতীনাথ এসে দাঁড়াতেই বললেন, বস।

ভয়ে ভয়ে পাশের আসনে বসল সতীনাথ। কি যে তিনি বলবেন তা তো সে জানেই।

কৃষ্ণচরণ বললেন, আমার এখানে কিছুদিন থেকে একটু কাজকর্ম শিখে ওই পাটের আপিসে যদি কেরাণী হয়ে ঢুকতে চাও, সে ব্যবস্থা হয় তো আমি করে দিতে পারি। তবে তার আগে—তুমি আমাদের দীনুর ছেলে বলেই বলছি—আমার একটা প্রস্তাব আছে। যদি তোমার মনে নেয় তো সেটাও ভেবে দেখতে পার।

সতীনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনি যা বলবেন আমি তাই করতে রাজী।

মৃদু হাসলেন কৃষ্ণচরণ। বললেন, উহু-হু, সব কথা না শুনেই অমন হুড়বড় করে কথা দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। আগে শোন আমার কথা।

এই বিচক্ষণ লোকটির সামনে এ ধরনের প্রগল্‌ভতা যে সমীচীন নয় এ সত্য উপলব্ধি করে সতীনাথ বড়ই লজ্জিত বোধ করল।

কৃষ্ণচরণ বললেন, দেখ, যা দিন কাল পড়েছে তাতে ওই অল্প টাকার মাইনের চাকরি করে কি করবে জীবনে? নুন আনতেই তো পান্তা ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি বলি কি, স্বাধীন ভাবে একটা ব্যবসা-টেবসা কিছু কর না।

সতীনাথ সবিনয়ে বলল, কিন্তু ব্যবসা করবার টাকা আমি পাব কোথায়? তাছাড়া ব্যবসার আমি জানিই বা কি?

—চেষ্টা করলেই জানতে পারবে। কোন জিনিষ কি কেউ মায়ের পেট থেকেই শিখে আসে? আমি শিখিয়ে দেব। আর টাকা? প্রথমে ছোটখাট কিছু দিয়েই শুরু কর না কেন? এই ধর, একটা মুদিখানার দোকান। মূলধন মানে জিনিষ-পত্র যা লাগে আমার গদী থেকেই তুমি পাবে। বেচা-কেনা করে দাম দেবে।

কথা শেষ করে চুপ করলেন কৃষ্ণচরণ। আড় চোখে একবার সতীনাথের দিকে চেয়ে আপন মনে সশব্দে হুকো টানতে লাগলেন। বুঝি সতীনাথের জবাবের জন্যই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কী জবাব দেবে সতীনাথ?

এ কথা তো কোনদিন স্বপ্নেও সে ভাবে নি। ওদের সাত পুরুষে কেউ কোন কালে ব্যবসা করে নি। তাও মুদিখানার দোকান। তেল-নুন-লঙ্কার বেসাতী। সহসা কোন জবাব দিতে পারল না সতীনাথ।

কৃষ্ণচরণই কথা বললেন আবার, মনে তোমার খটকা লেগেছে তা বুঝতে পারছি। কি জান, কথায় বলে বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। কথাটা মিথ্যে নয়। ছোট থেকেই লোকে বড় হয়। আমিও কিছু লাখ-পঞ্চাশ নিয়ে এখানে আসি নি। যৎসামান্য যা পুঁজি নিয়ে এসেছিলাম তাই দিয়েই তো করে কম্মে খাচ্ছি।

এ কথার পরে কৃষ্ণচরণের প্রস্তাবে সায় দিতেই হল সতীনাথকে। বলল, বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন—

বাধা দিলেন কৃষ্ণচরণ, না না, ও সব মন-রাখা কথায় হবে না। মনে কোন রকম খট্‌কা রাখলে চলবে না। এটা দুদিনের খেয়াল নয়। তোমার সারা জীবনের কথা। যে কাজই করবে বেশ ধরে-বেঁধে লাগতে হবে। তবে তো লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইবেন। কি জান, টাকা পয়সাই বল আর ঠাকুর-দেবতাই বল, এক মন হয়ে না ডাকলে

কাউকেই পাওয়া যায় না। বেশ ভাল করে ভেবে মনস্থির করে বল কি করবে।

খানিক চুপ করে থেকে সতীনাথ বলল, আজ রাতটা আমাকে ভাবতে সময় দিন। কাল আপনাকে আমি জানাব।

—বেশ, তাই জানিও।

কৃষ্ণচরণবাবুর প্রস্তাবই মেনে নিল সতীনাথ।

নিয়তি কেন বাধ্যতে ?

সেদিন কি সতীনাথ জানত যে স্বেচ্ছায় কৃষ্ণচরণের প্রস্তাবে সে সম্মতি দেয় নি ?

সে কি জানত যে এক দুনিরীক্ষ্য শক্তির দুর্বার হাতের সুতোর টানে পুতুল খেলার পুতুলের মতই সে কৃষ্ণচরণের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল ?

আর সেই ব্যবসার সুতো ধরেই গৌরীপুর থেকে বরাহনগর, বরাহনগর থেকে ক্লাইভ স্ট্রীটের 'এ্যালায়েড হার্ডওয়ার কনসার্ণ', এবং সেখান থেকে একদিন হরিদ্বার জনতার চলন্ত ট্রেনের কামরায় তাকে ছুটতে হয়েছিল ?

কিন্তু সে সব কথা এখন থাক।

কৃষ্ণচরণ মাসখানেক ধরে নিজের দোকানে বসিয়ে নিজের হাতে ধরে মুদিখানা দোকানের প্রাথমিক শিক্ষা সতীনাথকে দিলেন।

তারপর একদিন বললেন, যা শিখেছ এই যথেষ্ট। বাকিটা শিখবে নিজের হাতে, কাজে নেমে। বাজারের মধ্যে অনেক দোকান। আর একটা ছোট দোকান এখানে বসিয়ে তুমি সুবিধা করতে পারবে না। তুমি বরং গোলপুকুর অঞ্চলে দোকান খোল। সে অঞ্চলটায় কিছু ভদ্রজনের বাস আছে। জমিদারের কাচারি আছে। থানা পোস্ট আপিস আছে। মফস্বল থেকে যে সব লোক সপ্তাহে দুদিন গৌরীপুরের হাটে আসে তারাও ওই গোলপুকুরের পাড় দিয়েই

আসে। আমার মনে হয় ওখানে একটা দোকান করলে চলবে ভাল। তোমার জন্য একটা ছোট ঘরও আমি দেখে রেখেছি। তুমি যদি মত কর তো সামনের রথের দিনই তোমার ব্যবসার শুভক্ষণ করিয়ে দি। কি বল?

এর আর বলাবলি কি। সতীনাথ তো পা বাড়িয়েই আছে। যথারীতি সেই রথযাত্রার দিনই তার নতুন ব্যবসার শুভক্ষণ হয়ে গেল।

কিন্তু কোন্ ক্ষণ যে শুভ আর কোন্ ক্ষণ যে অশুভ পঞ্জিকার পাতা দেখলেই কি তার হদিস পাওয়া যায়?

পঞ্জিকার শুভক্ষণ আর জীবনের শুভক্ষণে যে আসমান-জমিন তফাৎ এ সত্য জানতে সতীনাথেরও বেশী দিন সময় লাগল না।

কৃষ্ণচরণবাবুর ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রখর। তাঁর হিসাবে ভুল হয় নি। দেখতে দেখতেই সতীনাথের ছোট দোকানখানি বেশ জমে উঠল। বিক্রি-বাটা বাড়তে লাগল দিনের পর দিন।

মুদিখানা দোকানের এক পাশেই কিছু কিছু স্টেশনারী জিনিষ, স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপযোগী খাতা-পেন্সিল, বিস্কুট-লজেন্স, লাট্টু-মারবেলও সে রাখতে শুরু করল।

সতীনাথের দোকানের ঠিক সামনা-সামনি রাস্তার অপর পারে একটা ছোট মাঠ। সেই মাঠের পরেই একখানা একতলা পাকা বাড়ি। সতীনাথ সেখানে আসা অবধি তালাবন্ধই পড়ে ছিল। লোকের মুখে সে শুনেছিল, ওটা জমিদার কাচারির নায়েবমশায়ের বাসাবাড়ি। নায়েবমশায় অসুস্থ হয়ে সপরিবারে কলকাতা গেছেন চিকিৎসার জন্য। বাড়ি তাই তালাবন্ধ পড়ে আছে।

একদিন সকালে সতীনাৎ দেখল, জমিদার-কাচারির পাইক সনাতন এসে বাড়িটা পরিষ্কার করছে। বাইরের ঘরটরগুলো খুলে ধোয়ামোছা করাচ্ছে।

কাজের ফাঁকে একবার সনাতন এসে বসল সতীনাথের দোকানে।

একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরাল।

সতীনাথ বলল, কি ব্যাপার সনাতন? হঠাৎ বাড়িঘর ধোয়া-মোছা করছ যে বড়?

সনাতন বলল, ওরে বাপরে! ছাপছুতরো করে না রাখলে কি আর রক্ষা থাকবে? নায়েববাবু আসছেন যে। ভারী কড়া মেজাজের মানুষ তিনি।

—নায়েববাবুর তো শুনেছিলাম অসুখ। ভাল হয়ে গেছেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই রকমই তো লিখেছেন কাচারিতে। তবে কি জানেন, ও অসুখ আর ভাল হবার নয়।

—কেন? কি অসুখ?

—কি জানি কি অসুখ। শুনেছি পেটের ভিতরে লিভরের নাকি কি গোলমাল হয়েছে। আর লিভরেরই বা দোষ কি। অনাচার অত্যাচার তো আর কম করেন না।

সতীনাথ এইটুকুতেই আন্দাজ করতে পারল ব্যাপারটা। চুপি চুপি প্রশ্ন করল, খুব মদ খান বুঝি?

একটা বিচিত্র মুখভঙ্গী করে সনাতন বলল, খুব মানে, এন্‌তার। নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে থাকেন কত সময়। তখন বাবুর সে কী চেহারা! জবা ফুলের মত রাঙা চোখ। হাতে মোটা বেতের লাঠি। একেবারে বাঘের মত বসে ঢুলতে থাকেন। তাঁর সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি। মাঠাকরুণ পর্যন্ত ভড়কে যান তখন।

—কেন? তোমাদের মাঠাকরুণ বাধা দেন না?

—আর বাধা। কার বাধা কে শোনে। মাঠাকরুণের আমাদের কপাল মন্দ। নইলে অমন সোনার মানুষ কখনও এমন লোকের হাতে পড়ে।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল সনাতনের। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, দোহাই আপনার, এ সব কথা যেন নায়েববাবুর কানে না ওঠে। তাহলে আর আমার রক্ষা থাকবে না।

—না না, তোমার কথা কেউ জানতে পারবে না।

আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল সনাতন।

সারাটা দিন অভ্যস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারেই একটি অসহায় ম্লানমুখী গৃহস্তবধূর দুটি অশ্রুছলছল চোখ সতীনাথকে যেন উন্মনা করে তুলতে লাগল।

পরদিন সকালে এসে দোকান খুলতেই সতীনাথের নজরে পড়ল, সামনের বাড়ির দরজা জানালাগুলো খোলা হয়েছে। বাড়িতে লোকজনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আর একটু বেলা হতেই একদল ছোট ছোট ছেলে জুটে গেল বাড়ির সামনের মাঠটায়। রোজই এমন জোটে। মারবেল-ম্যাট্রু খেলে। বিস্কুট-লজেন্স খায়। সতীনাথের সকাল বেলাকার বাঁধা খদ্দের তারা।

সেদিন একটি নতুন ছেলেকে তাদের দলে দেখা গেল।

ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটি। বয়স খুব অল্প। খেলাধূলো তখনও ঠিক বোঝে না। তবু একটা মারবেল হাতে নিয়ে ওদের দলে ভিড়ে ঘোরাঘুরি করছে।

সতীনাথ অনুমান করল, ও নিশ্চয় নায়েবমশায়ের ছেলে।

আহা, কী সুন্দর ছেলেটি। দেখলেই কাছে ডেকে কোলে নিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নায়েবমশায়ের যে বিবরণ সে শুনেছে কাল সনাতনের মুখে তাতে সে ইচ্ছাকে কার্যকরী করার সাহস তার হল না। নিজের কাজেই মন দিল সে।

হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে চোখ তুলে তাকাল সতীনাথ।

সেই ফুটফুটে ছোট ছেলেটি কাঁদছে। আর অন্য সব ছেলেগুলো কী যেন বোঝাতে বোঝাতে তাকে নিয়ে সতীনাথের দোকানের দিকেই আসছে।

কি ব্যাপার?

নায়েবমশায়ের ছেলের মারবেলটি দিয়েছিল অন্য একটি ছেলেকে খেলতে। খেলতে খেলতে হঠাৎ মারবেলটি ফেটে গেছে। তাই নিয়ে ওর কান্না। পাছে নায়েবমশায় আবার সব শুনতে পেয়ে একটা অনর্থ বাঁধান তাই ওরা ছেলেটিকে নিয়ে এসেছে একটা নতুন মারবেল কিনে দেবে বলে।

সব শুনে সতীনাথ বলল, ঠিক আছে। এই মারবেলের বাক্স তোমার কাছে দিচ্ছি, তোমার যেটি ইচ্ছে বেছে নাও।

ছেলেটি হাত বাড়িয়ে একটি লাল-নীল ডোরাটানা চকচকে বড় মারবেল বেছে নিল।

পাশ থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, ওর মারবেল তো ছিল ছোট।

সতীনাথ বলল, তাতে কি হয়েছে। ও ওটাই নিক।

—বারে, ওটার যে দাম বেশী। ডবল।

—তা হোক। দাম তোমাকে দিতে হবে না। ওটা আমি ওকে দিলাম। কি নাম তোমার খোকন?

ছেলেটি খুশি-খুশি চোখ তুলে বলল, বাবলু।

—বাবলু! বাঃ, বেশ নাম। তোমরা বুঝি কাল রাতে এসেছ কলকাতা থেকে?

—হ্যাঁ।

—কলকাতায় কোথায় ছিলে?

—দাদুর বাড়িতে। বাবার খুব অসুখ কিনা তাই।

বাবার অসুখ। লিভারের দোষ। জবা ফুলের মত রাঙা চোখ। দুটি অশ্রু ছলছল চোখের ডাগর চাউনি।

ছায়াছবির মত পর পর সতীনাথের মনের পর্দার উপর দিয়ে ছবিগুলি ভেসে যেতে লাগল।

একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়েছিল সতীনাথ। খেয়াল হতে দেখল ছেলেরা সব আবার মাঠে নেমে গেছে। একটু লক্ষ্য করে বুঝল, বাবলু সেখানে নেই।

পরের দিন হাটবার। সতীনাথ তাই মালপত্রের একটা ফর্দ করায় মন দিল। এমন সময় ঘরে ঢুকল সনাতন। বলল, খোকাবাবু একটা মারবেল নিয়েছে আপনার দোকান থেকে ?

মুখ তুলে সতীনাথ বলল, হ্যাঁ, আমি দিয়েছি।

—ওটার দাম ক' পয়সা ?

—কেন বল তো ?

—নায়েববাবু বলে দিলেন, দামটা দিয়ে দিতে।

মৃদু হেসে সতীনাথ বলল, ওটা আমি বাবলুকে এমনি দিয়েছি। ওর আর দাম দিতে হবে না।

—না না, দাম না নিলে তিনি রাগ করবেন।

—কেন রাগ করবেন ? সামান্য দু'পয়সা দামের একটা মারবেল। আমি দিয়েছি হাতে তুলে। দামটা নিতে কেমন বাধ বাধ লাগছে। তুমি বুঝিয়ে বলগে নায়েবমশায়কে।

সনাতন কিন্তু কিন্তু করেই ফিরে গেল।

একটু পরেই আবার ফিরেও এল। বলল, দামটা না নিয়ে আপনি ভাল করেন নি গো বাবু ! নায়েববাবু খুব গোসা হয়েছেন। আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখুনি একবার যেতে হবে।

সতীনাথ বিব্রত বোধ করল। একটা সামান্য মারবেলের দাম নিয়ে যে এত কাণ্ড ঘটবে এটা সে বুঝতে পারে নি। পারলে দামটা সে নিয়েই নিত। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই। যা মেজাজ শুনেছে নায়েবমশায়ের, না গেলে হয় তো জোর করেই ধরে নেবার ব্যবস্থা করবেন।

অগত্যা সে খাতা বন্ধ করে উঠতে উঠতে বলল, চল তবে। একবার দেখা করেই আসি। নাহক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল।

বাইরের ঘরেই বসে ছিলেন নায়েবমশায়। সতীনাথ ঘরে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়াতেই রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, তুমি মারবেল দিয়েছ বাবলুকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন দিলে ?

—ছেলে মানুষ মারবেলটা ভেঙে যাওয়ায় কাঁদছিল তাই।

—ওঃ। তা দাম ফেরৎ দিলে কেন ?

—আজ্ঞে ফেরৎ ঠিক দেই নি। মারবেল তো ও চায় নি। আমিই নিজের থেকে হাতে তুলে জিনিষটা দিয়েছি। সামান্য জিনিষ, তাই দামটা নিতে কেমন মন চায় নি।

—তাই একটু খয়রাৎ করেছ ? নায়েবমশায়ের গলায় ঈষৎ বিদ্রূপের আভাষ। সতীনাথের মন তাতে আঘাত পেল।

তবু সবিনয়ে সে বলল, আমি গরীব মানুষ। খয়রাৎ করবার সাধ্য আমার কোথায় ? ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?

—থাক্। আর বক্তৃতা করতে হবে না। এই নিয়ে যাও তোমার মারবেলের দাম। খবরদার, ভবিষ্যতে কখনও এভাবে গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করো না। যাও।

নায়েবমশায় দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের উপর।

তার চরিত্রের কথা সতীনাথ কিছু কিছু শুনেছিল সনাতনের মুখে। অন্যের মুখেও। নিজে তার সাক্ষাৎ পরিচয়ও প্রথম দর্শনেই কিছু কম পেল না। তাই এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য না করে পয়সা দুটো টেবিলের উপর থেকে কুড়িয়ে একটা নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নায়েবমশায়ের শেষের মন্তব্যটা বিষের মত তার কানের ভিতর যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল।

সেই দিন বিকেলেই কিন্তু সেই জ্বালায় শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল বাবলু নিজে।

সতীনাথকে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে বাবলু তার দোকানে এসে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, তুমি আমাদের বাড়ি চল।

সকাল বেলাকার অপ্রীতিকর ঘটনার জ্বালা তখনও মেভে নি। তবু সহজ হাসির সঙ্গেই সতীনাথ বলল, কেন বল তো বাবলুবাবু?

—বারে! মা যে তোমাকে যেতে বলেছে।

মা যেতে বলেছে!

চমকে উঠল সতীনাথ। এ কী বলছে বাবলু: নায়েবমশায়ের স্ত্রী তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? কিন্তু কেন?

পরক্ষণেই যেন এ প্রশ্নের একটা জবাব সে খুঁজে পেল। একটি অপরিচিত মানুষের স্বাভাবিক ভদ্র ব্যবহারের বিনিময়ে আজই সকালে তাঁর স্বামী যে অকারণ রূঢ় ব্যবহার তার প্রতি করেছে, হয় তো ভদ্রমহিলা তার জন্য ক্ষমা চাইতেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল নায়েবমশায়ের অশোভন মন্তব্যটা: ভবিষ্যতে কখনও এভাবে গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করো না।

কথাগুলো মনে হতেই কঠিন হয়ে উঠল সতীনাথের মন। তবু বাবলুকে কোন কঠিন কথা সে বলতে পারল না। তেমনি মৃদু হেসেই বলল, তুমি হয় তো ভুল শুনেছ—

—না না, মা বলেছে। তুমি চল।

—বেশ তো. তুমি আজ বাড়ি যাও। আমি আর একদিন যাব তোমাদের বাড়ি। কেমন?

—না, আজই চল। এক্ষুনি।

অনেক বুঝিয়ে সতীনাথ তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। সকাল বেলাকার ঘটনাটা না ঘটলে সে হয় তো অসংকোচেই বাবলুর সঙ্গে যেতে পারত। কিন্তু সকালে যা ঘটেছে তারপর কোন মতেই সেখানে তার যাওয়া চলে না।

তবু বাবলুর ডাকে তাকে সাড়া দিতেই হল।

একটু পরেই বাবলু একটা চিরকুট এনে দিল সতীনাথের হাতে। তাতে পরিচ্ছন্ন মেয়েলি হাতে লেখা: আপনি অতি অবশ্য একবার আসবেন এখুনি। বিশেষ প্রয়োজন আছে।—বাবলুর মা।

এর পরে আর না যেয়ে পারে নি সতীনাথ। নায়েবমশায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আর জবাফুলের মত রাঙা চোখের নিষেধাজ্ঞার চেয়ে এ চিঠির আহ্বান তার কাছে অনেক বেশী শক্তিশালী মনে হল।

বাবলুর পিছনে পিছনে তাদের বাইরের ঘরে যেয়ে হাজির হল সতীনাথ।

বাবলু আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, ও মা, দেখ, দেখ, কে এসেছে।

ভদ্রমহিলা আগে থেকেই পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকেই নিম্নকণ্ঠে বললেন, ছিঃ, এসেছে বলতে নেই, এসেছেন বলতে হয়। তোমার মামাবাবুকে বসতে বল বাবলু।

মামাবাবু!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই সতীনাথের।

—তোমার মামাবাবুকে প্রণাম কর বাবলু।

বাবলু এগিয়ে কাছে আসতেই সতীনাথ তাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিল।

ভদ্রমহিলা বললেন, সকালের ব্যাপারটার জন্য আমি খুব লজ্জিত। ওঁর স্বভাবই ওই রকম। ওঁর হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

—সে যা হবার হয়ে গেছে। তার জন্যে কেন আবার বাবলুকে পাঠিয়েছেন শুধু শুধু?

—শুধু সে জন্যেই পাঠাই নি। আপনার সঙ্গে আমার অন্য প্রয়োজন আছে।

—আমার সঙ্গে? কিন্তু আমি তো আপনাকে—

—চেনেন না, এই তো? কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।

—চেনেন?

—হ্যাঁ চিনি। এবং অনেক দিনের কথা হলেও সম্ভবত আপনিও আমাকে একেবারে ভুলে যান নি।

—কে আপনি?

—আপনি নয়, তুমি। আমি রেবা।

—রেবা!

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল রেবা।

তার দিকে চেয়ে বিস্ময়, বেদনা ও আনন্দে মিশ্রিত এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে সত্যনাথের হৃদয়-সমুদ্র যেন সহসা কল্লোলিত হয়ে উঠল।

সেই রেবা।

ভাগ্যের চক্র অনুকূল পথে ঘুরলে যাকে জীবন-সঙ্গিনী হিসাবে পেয়ে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিতে তাদের জীবন ধন্য হতে পারত অথচ কিছুই হল না। কে যে কোথায় বসে কোন সুতোয় টান দিল, আর তারা দুজনই ছিটকে পড়ল সার্থক জীবনের পথ হতে অনেক নিচে—ব্যর্থতা ও বেদনার ঊষর মরুভূমিতে। রেবার স্বামীর স্বভাব-চরিত্রের আর রেবার বর্তমান জীবনযাত্রার যে সামান্য আভাষ সে পেয়েছে তাতেই সে বুঝতে পারে যে কোন অন্ধ কারাগারের বদ্ধ অন্ধকারে অসহ্য বেদনায় চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটে।

রেবা বলল, নেহাৎ কৌতূহল বশেই সকাল বেলায় পর্দার আড়ালে এসে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু এক নজর দেখেই চমকে উঠলাম। এ যে আপনি, কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব হল? আপনাদের অবস্থা খারাপ ছিল সে কথা শুনেছিলাম। কিন্তু সে যে এতদূর খারাপ সে কথা বুঝতে পেরে বুকটা আমার হঠাৎ টনটন্ করে উঠল। তারপরই উনি অকারণে এমন ভাবে আপনাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন যে আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না।

—কিন্তু এখনও এ ভাবে আমাকে ডেকে এনে তুমি তো ভাল কর নি রেবা। সাহেবমশায় দেখতে পেলে আবার একটা অনর্থ বাধাবেন যে। আমি বরং এখন উঠি।

রেবা মাথা নিচু করে ভারী গলায় বলল, আপনাকে এখনই ছেড়ে দিতে মন চাইছে না। তবু এখানে আপনাকে ধরে রাখব এমন

জোরও আমার নেই। শুধু একটা অনুরোধ আপনাকে করব। বাবলুকে দিয়ে যখনই আপনাকে ডেকে পাঠাব, দয়া করে আসবেন। আর কখনও-সখনও চা-জলখাবার যদি পাঠাই দোকানে, দয়া করে খাবেন। ফেরৎ পাঠাবেন না যেন।

—না না, ফেরৎ পাঠাব কেন? এই নির্বান্ধব দেশে তুমি আমার জন্য খাবার পাঠাবে সে তো আমার মহা সৌভাগ্য।

—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি, আপনি খেলে আমি তৃপ্তি পাব।

অনেক দুর্ভাগ্য-দুর্দশার মধ্যেও খুশির অমৃতে মনের পাত্র একেবারে কাণায় কাণায় ভরে নিয়ে সেদিন দোকানে ফিরে গেল সতীনাথ।

সহসা যেন সে উপলব্ধি করল, এই স্নেহটুকু এই মমতাটুকুর জন্যই বুঝি এতদিন তার কাঙাল মন হাহাকার করে ফিরছিল।

এই অমৃত-সমুদ্রে অবগাহন করতে পারলেই বুঝি নিঃশেষে জুড়িয়ে যাবে তার দুঃখ-দারিদ্র্যভরা জীবনের সব জ্বালা।

অলক্ষ্যে থেকে সেদিন বুঝি বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন সতীনাথের ভাগ্য-বিধাতা।

কটা দিন যেতে না যেতেই ঝড় উঠল অমৃত-সাগরে। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ভয়াল নখর বিস্তার করে তাড়া করল সতীনাথকে। সতীনাথ পালিয়ে গেল তার অনেক আশার অমৃত-সায়রের তীর হতে।

বাবলুর ডাকে সেদিনও বিকেলে নায়েবমশায়ের বাড়িতে গিয়েছিল সতীনাথ। পরম যত্নে তার সামনে পায়সের বাটি এগিয়ে দিয়ে স্মিত মুখে বসেছিল রেবা। কৃতকৃতার্থ সতীনাথ বুঝিবা আনন্দের আতিশয্যে পায়সের বাটিতে হাত দিতেই ভুলে গিয়েছিল।

কাঁপা কাঁপা গলায় শুধু বলেছিল, এ জিনিষ যে কত দিন মুখে দেই নি। তবু তোমার কল্যাণে আজ মুখ বদল হল।

রেবা মিষ্টি হেসে বলল, একটুও রেখে যেতে পারবেন না কিন্তু। সবটুকু খেতে হবে।

—সে আর তোমাকে বলে দিতে হবে না। এ অমৃত বরং হাত পেতে চেয়ে নিয়ে আরও একটু খেতে সাধ যায়।

আনন্দে ভরা ছিল সতীনাথের মন। সেই আনন্দেই কথা শেষ করে হেসে উঠল সতীনাথ। রেবাও যোগ দিল সে হাসিতে।

—থামো।

প্রচণ্ড একটা ধমক যেন বোমার মত ফেটে পড়ল দুজনের কানের উপর। চমকে চেয়ে দেখল, খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নায়েবমশায়। তার দুই চোখে জ্বলছে ঘৃণা আর ক্রোধের নীল আগুন।

নিজেদের আনন্দে এতই মশগুল ছিল সতীনাথ আর রেবা যে নায়েবমশায়ের আকস্মিক আগমনের কথা তারা টেরও পায় নি।

সবিস্ময়ে রেবা স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, তুমি? এরই মধ্যে রঘুনাথপুর থেকে ফিরে এলে?

কণ্ঠস্বরে বিষ মিশিয়ে নায়েবমশায় বললেন, ফিরে এসে তোমাদের খুব অসুবিধা ঘটালাম বোধ হয়?

রেবা কাঁপা গলায় বলল, না না, অসুবিধার কি আছে? ইনি সতীনাথবাবু—

—থাক, আর পরিচয়ের পালা গাইতে হবে না। ওর পরিচয় জানবার মত বুদ্ধি আমার আছে। ওকে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে বল।

—সে কি? আমি নিজে ওকে ডেকে এনেছি—

—সেই জন্যেই নিজের মুখেই ওকে বিদায় দিতে হবে।

সতীনাথ তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে পায়সের বাটি ফেলে। অপ্রস্তুত কণ্ঠে সে বলল, দেখুন, আপনি ভুল করছেন—

—থাক। সে ভুল আর তোমাকে শোধরাতে হবে না। ভাল চাও তো এই মুহূর্তে এখান থেকে সরে পড়। মনে রেখ, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। মহাজনের আড়ত নয়।

এরপর আর কোন কথা বলল না সতীনাথ। রেবার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেবা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, সব না জেনেশুনে এ তুমি কি করলে?

ধমকে উঠলেন নায়েবমশায়, আমি কি করেছি সে কথা থাক। এখন তুমি কি করছিলে তাই বল?

—তার মানে?

—মানে—এ লোকটি কে?

—ওঁর নাম সতীনাথবাবু। ওই দোকান—

—সে খবর আমি রাখি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওর কিসের পরিচয়?

—উনি আমার মাস্টারমশায়।

—মাস্টারমশায়! তুমি যে আমাকে অবাক করে দিলে। ওই মুদিখানার দোকানদার তোমার মাস্টারমশায়?

—অবস্থার চাপে পড়ে আজ ওই হয়েছেন বটে, কিন্তু চিরদিন উনি এমন ছিলেন না। খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। যখন বি. এ. পড়তেন কলকাতায় তখন আমার দাদুর বাড়িতে ছিলেন কিছুদিন। আমাকে পড়াতেন।

—তাই বল! প্রাইভেট টিউটর! তার মানে ফার্স্ট লভার! অতি পুরাতন বিরহ-মিলন কথা।

—ছিঃ, এ কথা বলতে তোমার জিবে আটকাল না?

গর্জে উঠলেন নায়েবমশায়, বটে! আবার ধমক! তুমি একটা মুদিওলাকে বাড়িতে ডেকে এনে আমাকে না জানিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করতে পার তাতে আটকায় না, আর আমি সে কথা মুখে বললেই গায়ে ফোস্কা পড়ে, না?

—ছিঃ ছিঃ, তুমি যে এত নীচ তা জানতাম না।

—সবই কি আর একদিনে জানা যায়? আমিই কি সব জানতাম এত দিন? কিন্তু যখন জেনে ফেলেছি তখন ঠিক জেন এ আমি

কিছুতেই সহ্য করব না। ওই লোকটা যেন আর কোন দিন এ বাড়িতে পা না দেয়। নইলে আমাকে তুমি চেন, আর আমার চামড়ার চাবুকটাকেও তুমি চেন।

সেইদিন সন্ধ্যায়ই আর একবার সতীনাথকে ডেকে পাঠিয়েছিল রেবা। একখানি চিরকুটে সকরুণ মিনতি জানিয়েছিল, শেষ বারের মত তার সঙ্গে দেখা করতে।

অনেক বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে নি সতীনাথ।

সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকারে মুখ নিচু করে বসে ছিল রেবা।

সতীনাথ ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

সতীনাথ দেখল, রেবার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বইছে।

সভয়ে সে বলল, নারেনমশাই কি রাগের মাথায় তোমাকে মারধোর করেছেন?

রেবা ধীর গলায় বলল, না, ততখানি অধঃপতন বোধ হয় এখনও হয় নি। আমার গায়ে তিনি কখনও হাত তোলেন নি আজ পর্যন্ত।

সতীনাথ বুঝল, তার মুখ থেকেও নিজের স্বামীর নিন্দা শুনতে রেবা রাজী নয়। তাই প্রসঙ্গ বদলে সে বলল, কাজটা তুমিও ঠিক কর নি রেবা। তোমার স্বামী যখন পছন্দ করেন না যে আমি তোমাদের বাড়িতে আসি, তখন আমাকে এ ভাবে ডেকে আনা, আমার সঙ্গে মেলামেশা করা সত্যি তোমার উচিত হয় নি।

অসহায় আর্তকণ্ঠে কথা বলল রেবা, মাস্টারমশায়, উচিত হয় নি তা বুঝি। কিন্তু আমার চোখের সামনে দিনের পর দিন আপনার এই দুর্দশা দেখব অথচ কিছুই আমি করতে পারব না, একটুমাত্র সেবাযত্নও না, এ যে আমার পক্ষে অসহ্য মাস্টারমশায়। এর চেয়ে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই যে ভাল ছিল।

রেবার চোখের জল মোছাতে সেদিন অনেক সান্ত্বনার বাণী

সতীনাথ তাকে শুনিয়েছিল। কিন্তু কোন সান্ত্বনা সে মানে নি। দুই চোখে অবিরল অশ্রুর ধারা বইয়ে বার বার সে শুধু একটি কথাই বলেছিল, মেয়েমানুষের মন আপনি বুঝতে পারবেন না মাস্টারমশায়। কারও জন্যে যদি একবার তার মন কাঁদে তাহলে সারা জীবনেও সে কান্নার হাত থেকে আর তার রেহাই নেই। আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন, স্বামী আমাকে শাসন করবেন, সমাজ আমাকে চোখ রাঙাবে। কিন্তু আমার মন যে তা শুনবে না। আপনার কষ্ট দেখলে আমার মন যে কেঁদে উঠবে, সে কান্নাকে আমি থামাব কোন্ সান্ত্বনার পাথর চাপা দিয়ে বলতে পারেন?

সতীনাথ বলতে পারে নি। রেবার এ আর্ত প্রশ্নের কোন জবাব সে দিতে পারে নি। শুধু এইটুকু বুঝেছে, গৌরীপুরে সে যতদিন থাকবে ততদিনই রেবার চোখে তার জন্য অশ্রু ঝরবে।

আর শুধুই কি রেবা? তার নিজের বুকের তলেও কি বইবে না বেদনার কল্লোলিত তরঙ্গ? রেবার হাতের একটু সেবা, একটু যত্নের জন্য তার কাঙাল মনও কি অহর্নিশি ছটফট করে মরবে না?

সারা সন্ধ্যা এমনি অনেক কথা ভাবল সতীনাথ।

ক্রমে রাত বাড়ল। চারদিক নিস্তব্ধ হল একে একে। শুধু জেগে বসে রইল সতীনাথ।

তারপর এক সময় দোকানের হাত-বাক্স খুলে নগদ টাকা যা ছিল পকেটে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পথে নামল সতীনাথ। রেবা নয়, কৃষ্ণচরণ নয়, কেউ কিছু জানল না। সকলের অজ্ঞাতে—বুঝি বা নিজেরও অজ্ঞাতে সতীনাথ গৌরীপুরের বাস তুলে দিয়ে আবার অনির্দিষ্টের পথে বেরিয়ে পড়ল।

## ॥ ১৬ ॥

বাসের একটা অতর্কিত ঝাকুনিতে চমক ভাঙল সতীনাথের। রোড-লাইটের রক্তচক্ষু দেখে ব্রেক কসেছে বাস।

চমকে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল সতীনাথ। বাস তখন গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে চলেছে। দুপুরের কড়া রোদে রাস্তার পিচ গলে চক্‌চক্‌ করছে।

সতীনাথের মনে হল, তার চোখ দুটোও বুঝি অমনি চক্‌চক্‌ করছে। জীবনে সে দুঃখ পেয়েছে অনেক, যন্ত্রণা সয়েছে অনেক। তাই বলে সুখের পাত্রও তো একেবারে রিক্ত হয় নি।

নিজের জীবনে এ সত্য সে তো বার বার উপলব্ধি করেছে যে, মানুষের অনুরাগ বৃন্তহীন শতদলের মতই অকারণসঞ্জাত। যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোন প্রশ্ন নেই, অধিকার-অনধিকারের কোন দায় নেই, কখন যে কার মনে সে শতদল বিকসিত হয় তার হদিস কেউ বলতে পারে না। প্রে[illegible] মন-বৃন্তের স্বয়ম্ভু ফল।

তাই যদি না হবে, তাহলে রুক্ষস্বভাব স্বামীর প্রত্যাশিত লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করেও কেন রেবা সেদিন সতীনাথকে একটু সেবা একটু যত্ন করবার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ?

আর কেনই বা আজ সুলোচনা তার অন্তরের মমতা দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে সতীনাথের জীবনের সব দুঃখ-দৈন্যকে নিঃশেষে মুছে দেবার জন্য এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে ?

হয়, এমনই হয়। মানুষের মনের এ এক দুরধিগম্য রহস্য। কেন যে মন কাকে চায় তা সে নিজেই জানে না। তবু সেই চাওয়াই তার কাছে একমাত্র সত্য।

সেই একান্ত মন নিয়েই রেবার মন তাকে চেয়েছিল। পাওয়া যাবে না জেনেই চেয়েছিল।

আজও সেই একান্ত মন নিয়েই সুলোচনা তাকে চাইছে। এই চাওয়াতেই তার তৃপ্তি। তার মনের পরম প্রশান্তি।

সঙ্গে সঙ্গে সতীনাথের মন বলে উঠল, হোক—তবে তাই হোক।

রেবার হাতে নিজেকে সে সঁপে দিতে সেদিন পারে নি। যে পথে রেবা নিজেই ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কাছে চেয়েও তাই সে নিজের মুখেই সেদিন সতীনাথকে বিদায় দিয়েছিল। সকলের অজ্ঞাতে, এমন কি কৃষ্ণচরণকে না জানিয়ে সতীনাথ পালিয়ে এসেছিল গৌরীপুর থেকে।

কিন্তু আজ সে সুলোচনার কাছে নিজেকে অ[illegible] সমর্পণ করবে। সমাজ, সংসার, স্ত্রী পুত্র, আত্ম-অভিমান—[illegible] সে মানবে না। তাকে সুখী করবে, তাকে মর্যাদার সমাজে [illegible] করবে সুলোচনা যদি সুখী হয়, তার বঞ্চিত জীবনে যদি [illegible] স্বাদ পায়, তবে তাই হোক।

বরাহনগর বাজারের বাস থেকে ... এমনি সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বাড়ির পথ ধরল সতীনাথ। বেলা অনেক হয়েছে। এরপর গেলে হয়তো সুভদ্রাই আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করবে।

ভয়ে ভয়েই দ্রুত পা চালিয়ে দিল সতীনাথ।

বাড়ির ভিতর পা দিতেই সশব্দে ফেটে পড়ল সুভদ্রা। [illegible] চেঁচিয়ে বলে উঠল, এই যে এতক্ষণে বাবুর বাজার করা সারা হল! বাজ[illegible] কোন্ চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি?

—কোথায় আবার যাব! দোকান থেকেই তো আসছি।

—বটে! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হচ্ছে! এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বলতে মুখে তোমার আটকালো না একটু? এমনি বেহায়া তুমি!

—কি যা তা বকছ? থামো।

—বটে! আবার চোখ গরম করা হচ্ছে! ঘরে এদিকে মাগ-ছেলের খাবার নেই, আর উনি ওদিকে কাকভোরে উঠে ফূর্তি করতে গেছেন বালিগঞ্জের সিনেমাওলীর কাছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমার কি একটু লজ্জাসরমেরও বালাই নেই?

এবারে সত্যি ভয় পেল সতীনাথ। গলার স্বর নিচু করে খোসামোদের সুরে বলল, আঃ! থামো না। কেন বলছ এসব বাজে কথা?

—বাজে কথা! বেশ, তুমিই দিব্যি করে বল তো আমার গা ছুঁয়ে তুমি যাও নি সিনেমাওলীর বাড়ি?

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না সতীনাথ। চুপ করে রইল।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার তেড়ে উঠল সুভদ্রা, কি গো মুখে রা কাড়ছ না কেন? ভেবেছিলে তুমি খুব সেয়ানা। আমার চোখে ধুলো দিয়ে মজা ক'রে বেড়াবে। তা হয় না গো, তা হয় না। পাপের কল বাতাসে নড়ে। মনে চাপ বাড়ল। তাই ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিলাম। ওমা কোথায় কে! দোকান বন্ধ করে বাবু হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। খোঁজ করতে পাশের সাইকেলের দোকানের ছোঁড়াটাই না সব কথা ফাঁস করে দিল। চোখ টিপে হেসে হেসে বললে, এখানে বাবুর খোঁজ করছিস কেন রে? সে যে এখন বালিগঞ্জে কোন সিনেমাওলীর বাড়িতে গেছে। সেইখানে খোঁজ করগে না হাঁদারাম। ছি ছি, কথা শুনে আমি ঘেন্নায় মরি।

আর সহ্য করতে পারল না সতীনাথ। রেগে বলল, বেশ করেছি গিয়েছি, তাতে ঘেন্নার কি আছে?

—আহা তা থাকবে কেন? সে যে তীর্থক্ষেত্তর গো। বরং পুণ্যি হয়েছে বল। বলি কালীঘাটে একটা ডুব দিয়ে এসেছ তো?

—কী বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! চুপ কর!

—কেন! চুপ করব কেন! বলব। একশবার বলব। হাজার-বার বলব। পাড়াসুদ্ধু লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। বুড়ো হতে চলেছ, ছেলের বাপ হয়েছ, এখনও তোমার নষ্টামি গেল না? বয়সকালে একবার তো আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছ। ফাঁসের দড়ি পর্যন্ত গলায় ঝুলিয়ে তবে ছেড়েছ। এই বয়সেও আবার সেই রঙ্গিলাপনা শুরু করে দিয়েছ? বলিহারি তোমার আক্কেলের!

সুভদ্রার স্বরগ্রাম উচ্চ হতে উচ্চতর, তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হতে থাকে ক্রমে।

ঠিক সেই সময় সতীনাথের সাত বছরের ছেলে সলিল কোথা থেকে যেন দৌড়ে এসে মার কাছে যেযে বলল, শিগগির খেতে দাও মা, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

রাগে ফেটে পড়ল সুভদ্রা, হ্যাঁ, ক্ষিদে পেলেই খেতে পাবি সেই কপাল করেই এসেছিস কিনা! কি খেতে দেব আমি? আমার যা কিছু ছিল বাপ-বেটায় মিলে এতদিন ভরে তো চেঁছেপুছে খেয়ে সাবাড় করেছিস। এখন আমার এই হাড়-মাংসগুলো আছে, তাই চিবিয়ে খা।

সলিল বাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাগের মাথায় সুভদ্রা চেঁচিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, সিনেমাওলার বাড়ি থেকে তোর জন্যে উনি রাজভোগ এনেছেন যে। আয়, তাই তোকে খাওয়াই।

বলতে বলতেই সুভদ্রা ছেলের একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে নিজের কাছে নিয়ে গুম্ গুম্ করে গুটিকয়েক কিল চড় বসিয়ে দিল তার পিঠে।

সলিল তারস্বরে চীৎকার করে উঠল।

ছেলেটা যত চীৎকার করে সুভদ্রা বেপরোয়াভাবে তত তাকে মারে।

সতীনাথ স্থাণুর মত অসহায়ভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। সে জানে, এর প্রতিবিধানের শক্তি তার নেই। প্রতিবাদ

করতে গেলে ফল দাঁড়াবে আরও ভয়ানক। সলিলের দুর্দশা তাতে আরও বাড়বে।

তাই সে চুপ করেই ছিল।

কিন্তু আর পারল না।

এই শোচনীয় দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে এক সময়ে ছেড়ে-রাখা শার্টটা গায়ে চাপিয়ে সেই অবস্থায়ই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

দুঃখে ও বেদনায় সে তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দিশেহারার মত পথে পথে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল বহু ক্ষণ ধরে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় একটি পুরানো দিনের স্মৃতি তার মনের পটে ভেসে উঠল।

সেদিনও দর্জিপাড়ার বাড়িতে সরযুকে পড়াতে গিয়েছিল সতীনাথ।

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ কেমন যেন চুপ করে বসে ছিল সরযু।

সতীনাথ তার সেই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে বলেছিল, কি ভাবছ তুমি চুপ করে?

চমকে উঠে সরযু বলেছিল, কিছু না।

সতীনাথের মনে পড়ল সেদিন কথাপ্রসঙ্গেই যে সরযুকে বলেছিল, তুমি যাতে কষ্ট পাও এমন কাজ আমি কোনদিন করব না সরযু।

গভীর আগ্রহে সরযু বলেছিল, আপনি কথা দিলেন মাস্টার-মশায়?

সতীনাথও ঘাড় কাৎ করে বলেছিল, দিলাম।

কথা সেদিন হয় তো সতীনাথ কথার ছলেই দিয়েছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হল, সে কথার মর্যাদা সে রাখবেই। তার কোন কাজে, কোন ব্যবহারেই আজ আর সে সরযুকে কষ্ট দেবে না। সারা জীবন নিজে সে অনেক কষ্ট পেয়েছে। সে কষ্টকে সে নীরবেই সহ্য করেছে।

এতদিন সে মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারে নি যে তার দুঃখে দুঃখিত হবার মত আর একটি মানুষও এ পৃথিবীতে আছে। আজ এতদিন পরে সুলোচনাকে দেখে, তার কথা শুনে, তার আন্তরিক ব্যবহার দেখে সতীনাথ বড় আহ্লাদেই অনুভব করেছে যে তার ব্যথার ব্যথী যদি কেউ থাকে এ সংসারে সে সুলোচনা।

সেই সুলোচনা যদি তাকে সাহায্য করে, তাকে সুখের মুখ দেখিয়ে নিজেকে এতটুকু সুখী করতে পারে, তাহলে সে কেন তাতে বাধা হবে!

না না, বাধা আর সে হবে না।

নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে সুলোচনার হাতেই ছেড়ে দেবে। মিথ্যা কুৎসার ভয়ে সরযূর কাছ থেকে একদিন নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যে মহাপাতক সে করেছে, আজ সুলোচনার হাতে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করে দিয়ে সেই পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করবে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সতীনাথ

একটা বাস চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। হাত তুলে সেটাকে থামিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল সে।

খবর পেয়েই নিচে নেমে এসে সুলোচনা সবিস্ময়ে বলে উঠল, কি ব্যাপার মাস্টারমশায়?

—তোমার কাছেই এলাম সরযূ। তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী। আমি ব্যবসাই করব।

—কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মাস্টারমশায়, হয়েছে কি আপনার?

—কিছুই হয় নি। তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী, এই কথাটাই তোমাকে জানাতে এলাম।

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? এই তো কিছুক্ষণ আগে বেশ সুস্থ মানুষ গেলেন এখান

থেকে। এরি মধ্যে কি এমন ঘটল আমাকে সব কথা খুলে বলুন।

—বলবার মত কিছুই ঘটে নি সরযু। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর—

বাধা দিল সুলোচনা, কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার স্নান হয় নি, খাওয়া হয় নি—

—তা হয় নি ঠিকই। কিন্তু ও নিয়ে তুমি ভেব না। ও রকম আমার অভ্যাস আছে। তুমি তো আজ শুধু একদিন দেখলে। সময়ে খাওয়া-দাওয়া আমার অনেক দিন ঘুচে গেছে। কিন্তু সে কথা থাক। আমার কথার কি জবাব দেবে তাই বল। কত টাকা তুমি দিতে পারবে আমাকে?

—টাকা আপনার যা দরকার হবে সবই দেব। কিন্তু যে কারণেই হোক, এখন আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আগে বিশ্রাম করুন। স্নানাহার করুন। তারপর সব কথা হবে।

নিজে পাশে বসে বড় যত্ন করে সেদিন সতীনাথকে খাওয়াল সুলোচনা।

আনন্দের আবেগে সতীনাথের বুকের ভিতরটাও যেন থর থর করে কাঁপতে লাগল।

সুলোচনা বলল, আপনাকে এভাবে পাশে বসে খাওয়াবার ভাগ্য যে আমার কোন দিন হবে সে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

সতীনাথ বলল, আমার মত একটা অকৃতজ্ঞ অকর্মণ্য দুর্ভাগার মধ্যে কী যে তুমি খুঁজে পেয়েছ তা তুমিই জান সরযু। কিন্তু আমি তো জানি, এ সংসারে একটা কানাকড়িও মূল্য আমার নেই। নিজের চোখেই তো দেখেছ আমার বরানগরের দোকানঘরের হাল।

সুলোচনা আরও একটু কাছে এগিয়ে যেয়ে একান্ত আগ্রহভরা গলায় বলল, এইবার তাহলে বলুন, আমার টাকা নিতে আপনি সত্যই কুণ্ঠা করবেন না? বলুন, বরানগরের ওই দোকান তুলে দিয়ে আপনি একটা বড় কিছু করতে রাজী হবেন?

(তীনাথ বিহ্বল কণ্ঠে জবাব দিল, অত কথা কিছু বুঝি না আমি। এইটুকু তোমাকে বলতে পারি—আর ঝোঁকের মাথায় সেই থা তোমাকে বলতেই এসেছিলাম—যে আজ থেকে নিজেকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম। তুমি আমাকে যেমন চালাবে, আমি তেমনি চলব।

সুলোচনা আর কোন কথা বলল না।

গলায় আঁচল জড়িয়ে সতীনাথের পায়ের উপর মাথা রেখে তাকে প্রণাম করল গভীর প্রশান্তিতে।

## ॥ ১৭ ॥

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে···

সতীনাথের জীবন-গাড়ির চাকাও হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল।

বরাহনগরের মুদিখানার দোকান উঠে যেয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে নতুন সাইনবোর্ড উঠল : 'অ্যালায়েড হার্ডঅয়্যার কন্‌সার্ন'। সেখানে আপিস বসল। টাইপিস্ট এল। উর্দিআঁটা চাপরাসি এল। পাখা ঘুরল। টেলিফোন বাজল।

এদিকে বরাহনগরের এঁদো গলির দু-কামরা টালির ঘরের জায়গা নিল পাইকপাড়ার দোতলা পাকা বাড়ি। আর সেখান থেকে শ্যামবাজারে নিজের জমিতে পছন্দমত করে তৈরি করা আধুনিক প্যাটার্নের মোজাইকমণ্ডিত গৃহ 'সু-বাস'। খাট এল, আলমারি এল। ঝি এল, চাকর এল। ফ্রি প্রাইমারী স্কুল ছেড়ে সলিল নীল হাফপ্যান্ট, সাদা হাফশার্ট আর 'টাই' বেঁধে বাসে চেপে ভাল স্কুলে ভর্তি হল। সুভদ্রার অঙ্গে জড়াল শান্তিপুরী কল্কাপাড় মিহি শাড়ি। হাতে-গলায় চিক চিক করল নতুন পালিশ-লাগানো সোনার চুড়ি বালা হার। তার বাঁকা ঠোঁটে পানের রসের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিল নতুন হাসি।

এক কথায় সতীনাথের চেহারা একেবারে আমূল পাল্টে গেল। কী তার ব্যবসার, আর কী তার সংসারের। আগেকার দৈন্য-দুর্দশার সকল চিহ্ন বিলকুল মুছে গিয়ে তাতে লাগল সাফল্য আর সার্থকতার ঝকঝকে পালিশ।

চাকা-ভাঙা গরুর গাড়ির জায়গা নিল বুঝি নতুন অটোমোবিলের ঝকঝকে দীপ্তি আর ক্ষিপ্রবেগ গতি।

তাছাড়া—

ভাগ্যের গতি যখন ফেরে তখন বুঝি এমনি করেই ফেরে।

সুলোচনার অর্থানুকূল্যে ও অন্য সববিধ সহায়তার কল্যাণে সতীনাথের ক্লাইভ ষ্ট্রীটের লোহার ব্যবসা সবেমাত্র জাঁকিয়ে বসেছে, ঠিক সেই সময়েই যেন সতীনাথের প্রসন্ন ভাগ্যদেবতার অঙ্গুলিনির্দেশেই সারা ইওরোপখণ্ডে জ্বলে উঠল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমরানল। সেই যুদ্ধের সর্বগ্রাসী টান এসে অনিবার্যভাবেই লাগল ভারতবর্ষের জীবনে। জিনিসপত্রের বিশেষ করে লোহালক্কড়ের দাম রাতারাতি যেন আকাশ ছুঁয়ে বসল। আর সেই সুযোগে সুলোচনার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানাবিধ প্রভাবের ফলে খোলা বাজারে আর কালো বাজারের কৃপায় সতীনাথের ভাগ্যে যত লোহা হয়ে উঠল সোনা। বুঝি বা সোনার চেয়েও দামী।

আর সেই লোহার সোনার কনকদীপ্তিতে পথ দেখে দেখে সতীনাথও অচিরেই জীবনের সব অন্ধকার পথ পার হয়ে উপনীত হল সমৃদ্ধির একেবারে উজ্জ্বল দিবালোকে।

বরাহনগরের এঁদো গলি থেকে পাইকপাড়া—পাইকপাড়া থেকে শ্য[illegible]র প্রাসাদোপম অট্টালিকা। শ্রম নয়, ধর্ম নয়, সাধনা নয়, তপস্যা নয়, ভাগ্য [illegible] পথ [illegible] উজাড় করে দিল, আর বিস্মিত মুগ্ধ সতীনাথ শুধু দুই নিরলস হাতে কুড়িয়ে নিল জীবনের যত ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধি।

সুভদ্রা আহ্লাদে গলে পড়ল। সকলেরই খুশির অন্ত নেই। কেউ একবার তলিয়ে ভেবে দেখল না, একবার খোঁজ পর্যন্ত নিল না যে রূপকথার এই সুবর্ণভাণ্ডারের দ্বার খোলবার গোপন মন্ত্রটি সতীনাথ পেল কোথায়? জোয়ারের প্রবাহের মত কোথা হতে সহসা এল এই সাফল্য আর সমৃদ্ধি?

সবাই নিঃসংশয়ে ধরে নিল, সবই সতীনাথের কপালের জোর। ভাগ্যের চাকা যখন ঘোরে তখন এমনি দুর্দমনীয় বেগেই ঘোরে।

কিন্তু সেই ঘূর্ণায়মান চাকাকে সচল রাখতে যত তৈলনিষেক দরকার সেটা যে অলক্ষ্যে থেকে জুগিয়েছে সুলোচনার ব্যাঙ্কের হিসাব, সে সত্যটা একমাত্র সতীনাথ ছাড়া আর কেউ জানল না।

ইচ্ছে করেই সে সত্য সতীনাথ আর কাউকে জানায় নি। সুভদ্রাকে সে চেনে। ভাল করেই চেনে। আসবাবে-অলংকারে সমৃদ্ধিতে-মর্যাদায় আজ সে খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে যে এ সমস্তের অন্তরালে রয়েছে সুলোচনার দাক্ষিণ্য, আর সে সুলোচনা সরযূ ছাড়া আর কেউ নয়, সেই মুহূর্তেই সে যে নতুন দাবদাহে নিদারুণ আক্রোশে ফেটে পড়বে না, নতুন করে গলায় ফাঁস দেবার আয়োজন করবে না, এ কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। অন্ততঃ সতীনাথ তো নয়ই।

তাই প্রকৃত তথ্য সে সযত্নেই গোপন করে রেখেছিল সকলের কাছ থেকে। সবাই জানত কোন এক বড়লোক অংশীদারের সহযোগিতায়ই সতীনাথ এই ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। কে যে সেই ধনী অংশীদার এ প্রশ্ন নিয়ে কেউ কোন রকম মাথা ঘামায় নি।

কিন্তু গভীর মমতায় আর সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় সুলোচনার প্রতি তার তখন যে অত্যাগসহন অনুরাগ, আর তার প্রতি সুলোচনার যে ঐকান্তিক নির্ভরতা, তাতে এ সত্যকে দীর্ঘদিন লোক-লোচনের অন্তরালে রাখা কোনমতেই সম্ভব হল না।

বিশেষ করে সম্ভব হল না সুলোচনার অত্যধিক শুভ-কামনার ফলেই।

বেচারী সুলোচনা!

সতীনাথের কল্যাণ, সতীনাথের সুখ, সতীনাথের শান্তি—এই তখন তার জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তার সংসারে সে একক মানুষ। তাই তার সমগ্র জীবন দিয়ে সতীনাথকে ঘিরে রাখার পথে

তার দিক থেকে কোন বাধাই ছিল না। কোন বাধাই সে রাখে নি।

কিন্তু বাধা ছিল সতীনাথের দিক থেকে। অসীম কৃতজ্ঞতায় নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে স্থলোচনার হাতে ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু পারল না। পারা সম্ভব নয়। তার সংসার রয়েছে, সমাজ রয়েছে। আর সে সংসারে আছে সুভদ্রার মত অসহিষ্ণু স্ত্রী। সরযু সম্পর্কে সে স্ত্রীর মনে রয়েছে একটা অহেতুক ঈর্ষার অগ্নি-জ্বালা।

অন্য আরও অনেক দিনের মত সেদিনও সন্ধ্যার পরে স্থলোচনার সঙ্গে দেখা করতে গেল সতীনাথ।

কোন একটা সিনেমা কোম্পানির সঙ্গে একটা নতুন বইয়ের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে বাইরের ঘরে বসেই আলোচনা করছিল স্থলোচনা। সেখানে না বসে সতীনাথ সোজা দোতলায় উঠে গেল।

সিনেমা কোম্পানির লোকদের একটু অপেক্ষা করতে বলে পায় পায়ে পায়েই উপরে উঠে গেল স্থলোচনা। বলল, আপনি একটু বিশ্রাম করুন মাস্টারমশায়। কথাবার্তা শেষ করেই আমি আসছি। দেরি হলেও চলে যাবেন না যেন। দরকারী কথা আছে।

ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সতীনাথ বলল, তুমি নির্ভাবনায় নিচে যাও। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই আছি।

স্থলোচনা নিচে গেল। একটু পরেই চা ও জলখাবার দিয়ে গেল বুড়ো চাকর নীলমণি।

নিচের কাজকর্ম মিটিয়ে উপরে উঠে এল স্থলোচনা। বলল, আপনাকে অনেক ক্ষণ বসিয়ে রাখলাম মাস্টারমশায়।

—তাতে আর কি হয়েছে। এখানে একটু বসে থাকতেই তো আমি আসি। তুমি তো জান না, তোমার এই বাড়িই যে আমার তীর্থক্ষেত্র। এখানে দুদণ্ড থাকলেই যে আমি শান্তি পাই।

—এটা আপনি বাড়িয়ে বলছেন। আমাকে স্নেহ করেন তাই।

সুলোচনার গলার স্বর শুনে চমকে সতীনাথ বলল, কি বুঝতে পেরেছ তুমি সরযূ?

—সে কথা থাক মাস্টারমশায়। দুঃখের কপাল নিয়েই আমি জন্মেছি। সম্পূর্ণ একাকাই সারা জীবন সে দুঃখের বোঝা আমাকে বইতে হবে। আমি জানি, মানুষের সংসার, মানুষের সমাজ আমাকে চায় না। তারা চায় আমার অভিনয়, আমার গ্ল্যামার। কিন্তু তাদের সমাজের, তাদের সংসারের একজন হিসাবে সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। সবাই এড়িয়ে চলুক, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু মাস্টারমশায়, আপনিও যে আমাকে দূর থেকেই কৃতজ্ঞতা জানাতে চান, স্নেহ করতে চান, আপনার সংসারের মধ্যে আমাকে টেনে নিতে চান না, এটা আমি এতদিন বুঝতে পারি নি।

বলতে বলতে সুলোচনার গলা যেন অবরুদ্ধ বেদনায় বার বার আটকে আসছিল।

সতীনাথ বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সরযূ। তোমার মনে এতটুকু আঘাত লাগে এমন কোন কাজ আমি করতে চাই না। তবু যে তোমার এ প্রস্তাবে অমত করে বার বার তোমাকে ব্যথা দিই, সেটা তোমাকে এড়িয়ে চলতে চাই বলে নয়, তোমার কাছে খুশিমত দুদণ্ড এসে শান্তি পাবার পথটা নির্বিঘ্ন রাখতে চাই বলে।

সুলোচনা কোন কথা বলল না এবার। যেমন মাথা নিচু করে বসে ছিল তেমনি নিশ্চুপ হয়ে বসেই রইল।

সতীনাথ আবার বলল, আমার স্ত্রীকে তুমি কখনও দেখ নি। তার স্বভাব-চরিত্র তুমি জান না। তোমার আমার মাঝখানে তাকে টেনে আনলে যে অকারণ তিক্ততার সৃষ্টি হবে তার ফল কারও পক্ষেই ভাল হবে না।

মুখ তুলে সুলোচনা বলল, কিন্তু আমাকে তো আপনি চেনেন। আমার স্বভাব-চরিত্র তো আপনি জানেন। আপনার সংসারের,

আপনার স্ত্রীর, আপনার ছেলের কোন অকল্যাণ কোন স্বার্থহানি যে আমার দ্বারা কোনদিন ঘটবে না সেটা অন্ততঃ আপনি তো বিশ্বাস করেন। তাহলে কেন তারা এ বাড়িতে এসে, আমার সঙ্গে পরিচিত হলে অকারণে আমার উপর রুষ্ট হবেন? আমি তো কারও সুখের ভাগ দাব না।

এ কথার কোন জবাব সতীনাথ দিতে পারল না। চুপ করে রইল। কি জবাব সে দেবে? সে কি বলবে যে সরযূকে সে একদিন পড়াত মাত্র সেই সংবাদটুকু শুনে যে তার গলায় দড়ি দিতে পারে, আজ সে যদি জানতে পারে যে সেই সরযূই সুলোচনা হয়ে ফিরে এসেছে তার জীবনে, তা হলে ও বাসায় যে প্রলয়ংকর কাণ্ড বাধবে তা মোটেই অসম্ভব নয়?

কিন্তু [illegible] সুলোচনা আবার বলল, দেখুন মাস্টারমশাই, আপনি শুধু আমার কাছে আসেন, যান, কখনও দুদণ্ড থাকেন। সেই লুকিয়ে, আপনার পরিবার পরিজনের অজান্তে। তাই তো আমার ভয় হয়, এই লুকোচুরির খেলা যেদিন প্রকাশ পাবে, সেদিন আপনাকে ও আমাকে কেন্দ্র করে বীভৎস কোলাহলই না ছিটকে বেরোয় আপনার স্ত্রী পুত্র আত্মীয়জনের ভিতর থেকে। সে বিষোদ্গারের ভিতর পাছে আপনাকেও আবার হারাই, সেই আশঙ্কা দূর করবার জন্য আপনাদের সকলের সঙ্গে আমি খোলাখুলি-ভাবে মিশতে চাই। আমার আচার ব্যবহার দিয়ে আমার আলাপ আলোচনা দিয়ে তাদের আমি জয় করে নিতে চাই। আর এ বিশ্বাস আমার আছে যে মনে যখন আমার কোন লোভ নেই, তখন জয় করে নিতে আমি পারবই।

সতীনাথ তবু ইতস্ততঃ করে বলল, তা হয়তো তুমি পারবে, তবু—

সুলোচনার মনেও যেন জিদ চেপে গেল। সে বলে উঠল, আপনি আর কিন্তু করবেন না। আমি বলছি, ক'দিন আসা যাওয়া করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বেশ তো না হয় আপনি একদিন

পরীক্ষা করে দেখুন, আমি সব দিক রক্ষা করতে পারি কি না।

এরপর আর আপত্তি করতে পারল না সতীনাথ। সুলোচনার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পরদিন সবাইকে নিয়ে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

আশঙ্কায় কম্পিত বুকে পরদিন সন্ধ্যার পরে সুভদ্রা ও সলিলকে নিয়ে সুলোচনার বাড়িতে হাজির হল সতীনাথ।

আগের রাতে খেতে খেতে সতীনাথ নিমন্ত্রণের খবরটা দিয়েছিল সুভদ্রাকে। একটু মিথ্যা করেই বলেছিল, আমাদের ব্যবসার যিনি অংশীদার তার বাড়িতেই যেতে হবে। অনেক করে ধরেছেন তিনি।

ওকে নিমন্ত্রণ করায় বড়লোকের বাড়ি, খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠল সুভদ্রা। বলল, খুব বড়লোক বুঝি তারা? একেবারে লেকের উপরে বাড়ি? তাহলে তো খুব মজা হবে।

মজাটা যে কি হবে তা অবশ্য সতীনাথ বুঝতে পারে নি। তার শুধু একটিই আশঙ্কা, সব মজা শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে সাজা হয়ে না দাঁড়ায়।

চলল তাই।

সতীনাথরা গাড়ি থেকে নামতেই সুলোচনা নিজে এসে তাদের আদর করে ভিতরে নিয়ে গেল। অভ্যাগতদের অন্য সবাই বসেছিলেন বাইরের হলঘরে। সুলোচনা সতীনাথদের নিয়ে বসাল দোতলায় নিজের শোবার ঘরে।

নীলমণিকে ডেকে তাদের চা দিতে বলে সে সুভদ্রার দিকে চেয়ে বলল, আপনারা এখানেই বিশ্রাম করুন। আমি নিচে ওদিকটা একটু দেখে আসি। আপনিও এখানেই বসুন মাস্টারমশায়। নিচের ভিড়ে আপনার ভাল লাগবে না।

—মাস্টারমশায়!

সম্বোধনটা যেন খচ্ করে কানে বিঁধল সুভদ্রার।

কোথায় যেন সুর কেটে গেল তার মনের খুশির।

সুলোচনা চলে যেতেই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সত্যনাথকে জিজ্ঞেস করল, উনি কে? তোমাকে মাস্টারমশায় বললেন কেন?

চমকে উঠল সত্যনাথ। তবু সহজ হবার চেষ্টায় বলল, উনিই তো আমার ব্যবসার অংশীদার। আমাকে ওই বলেই ডাকেন।

—উনিই তোমার ব্যবসার অংশীদার? ওঁর স্বামীকে তো দেখছি না। তিনি কোথায়?

—ওঁর [illegible] নি। উনি একাই থাকেন এ বাড়িতে।

—উনি একাই থাকেন এ বাড়িতে? [illegible] তুমি ব্যবসার নাম করে [illegible] মন। বারে বারে এখানে আসা [illegible]?

[illegible] সত্যনাথ বুঝতে পারল, সুভদ্রার স্বরূপ প্রকাশ [illegible] অনিবার্য [illegible] না। তাড়াতাড়ি সে সলিলকে বলল, [illegible] নিচে যাও। ঘুরেফিরে সব দেখগে।

[illegible] মনটাও [illegible] করছিল। বাবার কথার সঙ্গে [illegible] সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

[illegible] সেই [illegible] সুভদ্রার চোখ পড়ল দেয়ালে ঝোলানো [illegible] একখানা ফটোর উপর।

[illegible] একদিন [illegible] ফটোগ্রাফারকে দিয়ে তার নিজের [illegible] খানা তুলিয়েছিল। সত্যনাথের কোন ওজর-আপত্তিই শোনে নি।

ফটোখানা চোখে পড়তেই চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে যেন গর্জন করে উঠল সুভদ্রা, ওঃ, ব্যাপার দেখছি বেশ অনেক দূরই গড়িয়েছে। দেয়ালে আবার ছবি টাঙানো হয়েছে নাগরের। তা তুমিই বা একখানা ছবি টাঙাওনি কেন আমার ঘরের শিয়রে? রোজ সকালে তাহলে মনের মানুষের ধ্যান করতে পারত সাধ মিটিয়ে।

চাপা অথচ দৃঢ় গলায় সতীনাথ বলল, আঃ, কী যা তা বলছ ভদ্র-লোকের বাড়িতে এসে।

—ভদ্রলোকের বাড়ি! পরপুরুষ নিয়ে যে মেয়েমানুষ—

আরও কি কুৎসিত বাক্য সুভদ্রার মুখ থেকে উচ্চারিত হত কে জানে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে নীলমণির গলা শোনা গেল। সে তাদের নিচে যেতে বলছে। অগত্যা সতীনাথের উপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুভদ্রা মনের রাগ তানকার মত মনে চেপে রেখে নীলমণির পিছনে পিছনে নিচে নেমে গেল।

তারপর যতক্ষণ সে সে-বাড়িতে রইল আহত ফণিনীর একটা উগ্র নীল দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ সে দেখতে লাগল শুধু সুলোচনাকে।

বাড়ি ফিরেও দুর্দমনীয় আক্রোশে ফেটে পড়ল সুভদ্রা। বল, কে এই সুলোচনা? কি সম্পর্ক তোমার ওর সঙ্গে?

সতীনাথ বুঝল, ভয়ের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার রূপকে ভয় করে কোন লাভ নেই। কপালে যা থাকে তাই হবে, সত্যের পথেই সে দাঁড়াবে। সুলোচনারও তো তাই ইচ্ছা।

অকপটেই সব কথা সে খুলে বলল সুভদ্রাকে। বরাহনগরের দোকানঘরে সুলোচনার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভ স্ট্রীটের 'অ্যালায়েড হার্ডঅয়ার কনসার্ন'-এর প্রতিষ্ঠা, দুই-কামরা টালির ঘর থেকে আরম্ভ করে সেদিনকার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত সব কথাই সে বলল সুভদ্রাকে।

সতীনাথের প্রদত্ত এই সব বিবরণকে সুভদ্রা কি ভাবে গ্রহণ করত, শ্রাব্য ও অশ্রাব্য নানারূপ কটু-কাব্য করতে করতে সতীনাথের সুলোচনার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে পড়েই থামত, কিংবা আরও বেশী দূর অগ্রসর হত, তা বলা যায় না।

কিন্তু ঘটনার সাধারণ বিবরণ শেষ করে যে মুহূর্তে সে জানাল যে সুলোচনা সরযূরই নামান্তর, সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটিই

আজকের বিখ্যাত অভিনেত্রী সুলোচনা নন্দী, সেই মুহূর্তে যেন আগ্নেয়গিরির বিষম বিস্ফোরণে হাহাকার করে উঠল সুভদ্রা।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, বুঝেছি, এইবার বুঝেছি, সেই নষ্ট মেয়েমানুষটাই আবার তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। তাই অনেক রাত না হলে তোমার বাড়ি ফেরার সময় হয় না, তাই বয়স যত বাড়ছে সাজপোশাকের ঘটাও তত বাড়ছে, তাই তো দিনরাত আমার সঙ্গে খিটমিট, আমার সব কিছুই এত অপছন্দ। তখন কি আর জানি, সেই পেত্নীটাই পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে। উঃ, দিনে দিনে তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে! এই বুড়ো বয়সে এ সব রং তামাশা করতে তোমার লজ্জা করে না?

সুভদ্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করে সতীনাথ বলল, বৃথাই তুমি এমন অবুঝের মত কথা বলছ। সবাই আমাকে মাস্টারমশায় বলে, ছেলের মতই তারা করে শ্রদ্ধা। [illegible] তার সম্পর্কে যে সব কথা তুমি বললে সে সব ভাবাও পাপ [illegible] তা ছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন সে আমাদের অন্নদাতা। হঠাৎ সেদিন তার সঙ্গে দেখা না হলে আজও আমাদের হা ভাত হা-ভাত করেই ঘুরে মরতে হত।

ফোঁস করে উঠল সুভদ্রা, না হয় হা ভাত হা ভাত করে শুকিয়ে মরে যেতাম। সেও যে ছিল ভাল। আমি বেঁচে থাকতেই আমার চোখের সামনে তুমি পর মেয়েমানুষ নিয়ে এমন বেহেডপনা করে বেড়াবে, এর চেয়ে যে আমার মরণও ছিল ভাল। মরতেই তো আমি চেয়েছিলাম। এ পোড়া কপালে যে আমার মরেও সুখ লেখা নেই। হে ভগবান, এত মানুষকে তুমি নাও, আর আমাকে কি তুমি চোখে দেখতে পাও না?

চীৎকার করে, চোখের জল ফেলে, মাথার চুল ছিঁড়ে সুভদ্রা সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

বেচারী সতীনাথ নীরবে নত মুখে বসে বসে সব দেখল। প্রতিবাদের একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হল না।

॥ ১৮ ॥

সতীনাথের জীবনে দেখা দিল এক নতুন সংকট

একদিকে সুলোচনা আর একদিকে সুভদ্রা। যেন জীবন-গোলার্ধের দুই মেরু। আর তাদের মাঝখানে পড়ে সতীনাথের এক দুস্তর টানা পোড়েন।

একদিকে অভিমান আর অন্যদিকে অভিযোগ। একদিকে কৃতজ্ঞতা আর অন্যদিকে কর্তব্য। কাকে রেখে সে কাকে ছাড়বে?

হায়রে, ছাড়তে চাইলেই কি ছাড়া যায়? উড়তে চাইলেই কি ডানা মেলা যায় আকাশে? মনের পায়ে যে শিকলি বাঁধা।

সতীনাথ প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল দুদিকই বজায় রাখতে।

হয় তো পারতও। সুতো-ছেড়া ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে খেয়েই হয়তো জীবনের পথে সে পাড়ি জমাতে পারত।

কিন্তু আবার নতুন করে প্যাঁচ খেলল কোন অদৃশ্য ঘুড়িওয়ালা। তার হ্যাঁচকা টানে সতীনাথের জীবন ঘুড়ি একেবারেই গুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। মাথা তুলে আর সে দাড়াতে পারল না। শূন্যে ডানা মেলে আকাশ বিহার তো দূরের কথা।

'এলায়েড হার্ডওয়ার কনসার্ন'-এর আপিস ঘরেই চুপচাপ বসে ছিল সতীনাথ। হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না।

তাছাড়া মনটাও ভাল ছিল না।

গত রাত্রে সুলোচনার বাড়িতে একটা নিমন্ত্রণ ছিল। তার নতুন বইয়ের কন্ট্রাক্ট উপলক্ষ্যে একটা পার্টির আয়োজন হয়েছিল। আপিসেই ফোন করে বার বার সে সতীনাথকে অনুরোধ করেছিল যাবার জন্য। সতীনাথও যাবে বলেই কথাও দিয়েছিল। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। সুভদ্রাই যেতে দেয় নি। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিয়েছে।

সেদিন রাতে বালিগঞ্জ থেকে ফিরে গিয়েই সুভদ্রা খাড়া হুকুম জারী করেছে, ব্যবসার প্রয়োজন ছাড়া সুলোচনার বাড়ি যাওয়া চলবে না সতীনাথের। তবু যদি সে যায় সুভদ্রাকে লুকিয়ে, সে তাহলে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হবে।

সুভদ্রার পক্ষে যে তা অসম্ভব নয় সে কথা সতীনাথ ভাল করেই জানে। তাই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত হয়েই চলে। না জানি কখন আবার কী কাণ্ড করে বসে সে।

আজকাল তাই সুলোচনার বাড়ি যাওয়াও সে কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে রাত্রের দিকে তো সে প্রায় যায়ই না সেখানে। পারিবারিক শান্তির হাড়িকাঠে নিজের মনের ভীরু কপোতকে বলি দিয়েই সে চলতে চেষ্টা করছিল। তবু যদি শেষ রক্ষা হয়। তবু যদি সুলোচনার সঙ্গে তার সম্পর্ককে সুভদ্রার অকারণ বিষ-দৃষ্টি থেকে বাঁচান যায়।

আপিস থেকে বাড়ি ফিরে সতীনাথ তাই সোজাসুজিই সুভদ্রাকে জানিয়েছিল সুলোচনার নিমন্ত্রণের কথা। ভেবেছিল, সহজ ভাবে বললে হয় তো সুভদ্রা নিমন্ত্রণ রক্ষার ব্যাপারে কোন রকম আপত্তি করবে না।

কিন্তু তার ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সুভদ্রা তীক্ষ্ণকণ্ঠে আপত্তি জানাল। সোজা জানিয়ে দিল, এ নিমন্ত্রণ খাওয়া তার চলবে না।

আঘাত পেয়েছিল সতীনাথ। সুলোচনার ব্যর্থ প্রতীক্ষার বেদনার কথা স্মরণ করে ব্যথাও পেয়েছিল অল্প নয়। তবু সুভদ্রার বাধাকে উপেক্ষা করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারে নি।

সেই জন্যই তার মনটা ভাল ছিল না।

আশা করেছিল, আপিসে এসেই হয় তো সুলোচনার 'ফোন'

পাবে। সে হয় তো অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে তার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করবে। অথবা হয় তো শংকান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইবে তার কুশল-সংবাদ।

কিন্তু সারা দুপুর গড়িয়ে গেলেও সুলোচনার কোন ডাক আসে নি তার টেবিলে। সতীনাথ বুঝতে পেরেছে, অভিমানেই নীরব হয়েছে সুলোচনার কণ্ঠ। তার পালিয়ে বেড়ানোর মূল কারণটা সেও ধরে ফেলেছে। হয় তো বা তাকে সে ভুলই বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু সে যে কত অসহায়, সুলোচনার জন্য তার মনের আর্তি যে কত গভীর, সে কি সুলোচনাও বুঝবে না!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সতীনাথ। এক টুকরো মেঘ জমেছে আকাশে। হয় তো বৃষ্টি হবে বিকেলের দিকে।

পেপার-ওয়েটটা সরিয়ে খোলা ফাইলটাকে সামনে টেনে নিল সতীনাথ। সামান্য কাজ যা বাকি আছে তাড়াতাড়ি শেষ করে সুলোচনার সঙ্গে একবার দেখা করে তবে সে বাড়ি ফিরবে।

এমন সময় ঘরে ঢুকল আদালি।

—কি চাই?

—একজন বুড়োবাবু দেখা করতে চান। এই স্লিপ।

একটু বিরক্তি-ভরেই হাত বাড়াল সতীনাথ। কিন্তু হাতটা চোখের কাছে টেনে নিতেই তার বিস্মিত দৃষ্টিটা যেন স্লিপের লেখা-গুলোর ভিতর আটকে গেল।

নিজেকে সংযত করে সহজ গলায় বলল, পাঠিয়ে দে।

একটু পরেই দুর্বল গলায় কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকলেন দয়াময়বাবু।

জেলা কোর্টের ঝানু উকীল দয়াময়বাবু। রেবার বাবা।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর? অকাল বার্ধক্যের ক্ষুধিত নখরের চিহ্ন পড়েছে সারা অঙ্গে। মাথার সব চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। সারা মুখমণ্ডলের মাংস ও চামড়া কুঁচকে কুঁচকে

গেছে। দাতহীন মাড়ির ফাঁক বোজাতে দুই গাল ঢুকে পড়েছে মুখের গহ্বরে। চোয়ালের লম্বা বাঁকানো হাড় দুটো বড় বেশী প্রকট হয়ে ঠেলে উঠেছে। শেল-ফ্রেমের একটা ডাঁটা-ভাঙা চশমাটা কালো সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে জড়ানো। গায়ের কালো আলপাকার কোটটা বিবর্ণ মলিন। অনেক জোড়াতালির পদচিহ্ন তাতে।

বিস্মিত সতীনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল দয়াময়বাবুকে।

দয়াময়বাবু চশমাটাকে নাকের উপর আর একটু তুলে ধরে সতীনাথকে ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে বললেন, তুমিই তো সতীনাথ?

—আজ্ঞে হ্যা। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?

—চিনতে পারছি। তবে চিনতে বড় ভয় হচ্ছে।

—ভয়? সে কি? কেন?

—কেন? তোমার উপর যে আমি অনেক অন্যায় করেছি।

—না না, সে কথা আপনি ভুলে যান। দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

—বসব? তুমি বলছ?

—হ্যাঁ, আপনি বসুন। আপনি এত সংকোচ করছেন কেন?

—সংকোচের কাজ নিয়েই যে তোমার কাছে এসেছি। তাই তো ভয় হচ্ছে, সব কথা শুনে তুমি যদি আবার উঠে যেতে বল।

—আপনি কি বলছেন আমি যে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

একে একে দয়াময়বাবুর মুখে সব কথা শুনে সবই বুঝতে পারল সতীনাথ।

দেশ-বিভাগের সেই পুরনো করুণ কাহিনী।

অন্য অনেকের সঙ্গেই অনেক আশা নিয়ে দয়াময়বাবুও সপরিবারে পশ্চিম বাঙলায় চলে এসেছেন। প্রথমে উঠেছিলেন শ্বশুরমশায়ের শিয়ালদার বাসায়। শিয়ালদা-আলিপুর-ব্যাংকশাল কোর্টের

অনেক সিঁড়ি বেয়ে অনেক ওঠা-নামা করলেন

সিঁড়িতে ক্রমাগতই পা হড়কে পড়তে লাগলেন। [illegible] উপরে উঠবার নিশানা খুঁজে পেলেন না। শীর্ণ পকেট শীর্ণতর হতে লাগল দিনের পর দিন। আর সেই অনুপাতে হ্রাস পেতে লাগল শ্বশুর-বাড়ির আপ্যায়ন। প্রথমে আকারে ইঙ্গিতে। তারপর প্রকাশ্য সরব ঘোষণায় উচ্চারিত হল শ্বশুরগৃহ ত্যাগের সুস্পষ্ট নির্দেশ। চিরকালের আত্মগর্বী মানুষ দয়াময়বাবু। এ অপমান সইতে পারলেন না। বাসা নিলেন শহরতলীর জীর্ণ বাড়িতে। সেখানেই অর্থাভাবে দিনযাপনের অসহায় মহড়া চলেছে।

এই পর্যন্ত একটানা বলে একটু থামলেন দয়াময়বাবু। সতীনাথের মুখ থেকে যেন কি শুনতে চান এমনি ভাবে তাকালেন তার মুখের দিকে।

দয়াময়বাবুর কাহিনী শুনতে শুনতে রেবার [illegible] মুখখানি বারবারই ভেসে উঠছিল সতীনাথের চোখের সামনে। অসুস্থ অমিতাচারী স্বামীকে নিয়ে সেও তো ছিল পাকিস্তানে। তারাও কি দেশত্যাগ করে এমনি বিপর্যয়ে পড়েছে? বলি বলি করেও সংকোচ বশতঃ এতক্ষণ রেবার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে নি সতীনাথ। এবার হঠাৎ বলেই ফেলল।

—আচ্ছা, আপনার মেয়ে মানে রেবা এখন কোথায়? তারা কি গৌরীপুরেই আছে?

—সে অভাগিনীর কথা আর বলো না বাবা। তাকে নিয়েই তো হয়েছে আমার আরও জ্বালা।

—কেন? কি হয়েছে তার?

—কি না হয়েছে তাই বল। কী যে জিদ চাপল তার দাদুর মাথায়, কার্তিকের মত চেহারা দেখেই একেবারে গলে গেলেন। ভাল করে খোঁজ খবর না নিয়েই বিয়ে দিয়ে দিলেন একটা বেহেড মাতালের সঙ্গে।

হোক। একটা কাজের ব্যবস্থা করে দাও। তবু মনকে বোঝাতে পারব, ভিক্ষে করে খাচ্ছি না।

আবার খানিক চুপ করে রইল সতীনাথ। তারপর বলল, বেশ, তাই হবে। আপনি কাল থেকেই কাজে 'জয়েন' করুন এখানে। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।

—তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব—

বাধা দিল সতীনাথ, আজ্ঞে না, ধন্যবাদ নয়, আপনি আশীর্বাদ করুন আমাকে।

—তাই করছি বাবা, তাই করছি। 'তুমি বড় হও, আরও অনেক বড় হও।' আচ্ছা, আজ তাহলে আমি উঠি।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। দয়াময়বাবু বোধ হয় সেটা খেয়াল করেন নি।

সতীনাথ বলল, কিন্তু আপনি যাবেন কেমন করে? বাইরে যে বৃষ্টি হচ্ছে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দয়াময়বাবু বললেন, তাই নাকি? তাহলে তো বড়ই মুশকিল হল দেখছি। আমাকে যে আবার অনেকটা দূর যেতে হবে।

সতীনাথ বলল, সে জন্য আপনি ভাববেন না। আরও কিছুক্ষণ বসুন এখানে। বৃষ্টি যদি নাই ধরে আমি নিজে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—তুমি যাবে এই বৃষ্টির মধ্যে? তোমার যে খুব কষ্ট হবে।

সতীনাথ হেসে বলল, না না, কষ্ট হবে কেন? আমার গাড়ি রয়েছে নিচে।

হেসে উঠলেন দয়াময়বাবুও, তাও বটে। তোমার তো গাড়িই রয়েছে। সে কথাটা আমার মনেই ছিল না।

অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করেও বৃষ্টি থামল না। অগত্যা সতীনাথ নিজেই গেল দয়াময়বাবুকে তাঁর বাসায় পৌঁছে দিতে।

যে গলিতে দয়াময়বাবুর বাসা সেখানে মোটর ঢোকে না। তাই বড় রাস্তার মোড়েই তাঁকে নামতে হল গাড়ি থেকে।

বৃষ্টি তখনও টিপ্ টিপ্ করে পড়ছে। অল্প অল্প জলও দাঁড়িয়েছে রাস্তার এখানে-ওখানে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে একটু ইতস্তত করেই দয়াময়বাবু বললেন, এই বৃষ্টি-কাদার মধ্যে তোমাকে নামতে বলতে পারি না। তবু কষ্ট করে এত দূর এসেও পথ থেকেই তুমি চলে যাবে, এটাও যেন কেমন মনে লাগছে। তাছাড়া রেবাই বা—

গাড়ির দরজা খুলে সতীনাথও তৎক্ষণে একটা পা রেখেছে নিচের রাস্তায়। সে বলে উঠল, রেবা যাতে কিছু না ভাবতে পারে তাই করছি। চলুন, আপনাদের বাসাটা একবার দেখেই যাই।

—সে তো খুব ভাল কথা খুব ভাল কথা। তবে এই কাদা-বৃষ্টিতে তোমার খুব কষ্ট হবে।

—না না, কষ্ট হবে কেন? ও আমার অভ্যাস আছে। আমি তো আর চিরদিনের গাড়ি-চড়া মানুষ নই। কাদা-জলে পথ চলা আমার অভ্যাস আছে।

চলতে চলতেই দয়াময়বাবু বললেন, গাড়িতে চড়তে পারলে আর সে কথা ক'জনে মনে রাখে বল। এই এসে পড়েছি আমরা। ওই বাঁকটা ঘুরলেই আমাদের বাসা। বাসা তো নয় বাবা, দুখানি পায়রার খোপ।

পথের বাঁক ঘুরে সেই পায়রার খোপেই ঢুকল সতীনাথ।

দেখল রেবাকে। তৈলহীন রুক্ষ চুল আর আভরণহীন বিধবার বেশবাসে একটা বিষন্নতার আবরণ তাকে ঘিরে ছিল সত্যই। তবু প্রথম দৃষ্টিতেই সতীনাথের মনে হল, গৌরীপুরে নায়েবমশায়ের বাড়িতে তাকে প্রথম দেখার দিন যে অশ্রুছলছল অব্যক্ত বেদনার কালো ছায়ায় ছেয়ে ছিল রেবার সারা মুখ, আজ যেন সেখানে নেমেছে মুক্ত জীবনের উদার আশ্বাসের এক গভীর প্রশান্তি। আজ সে

স্বামীর আশ্রয় হারিয়েছে। হারিয়েছে স্বচ্ছন্দ সঙ্গতিপূর্ণ জীবনের আশ্বাস। অসহায় অক্ষম বৃদ্ধ পিতার ঘাড়ে আজ সে বোঝাস্বরূপ। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশংকায় আজ সে ম্রিয়মান। তবু আজ তার চোখে নেই বিষণ্ণতার কালো ছায়া। নেই নিজগৃহে পরবাসী হবার দুঃসহ বেদনা। সমস্ত বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও সে যেন মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবার সাধনায় দৃঢ়সংকল্প।

দয়াময়বাবু দরজার কড়া নেড়ে নাম ধরে ডাকবামাত্রই একটা মাটির দীপ হাতে নিয়ে রেবা এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই দীপের ম্লান আলোয়ই সতীনাথ প্রথম দেখেছিল রেবাকে। দেখেই চমকে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, ওই অকম্পিত দীপশিখাটি যেন রেবার জীবনেরই প্রতীক। বাইরে মেঘান্ধকার রাত্রি। অবিরলধারায় চলেছে বর্ষণ। তারি মাঝখানে জ্বলছে একটি ক্ষীণ দীপশিখা। স্বীয় শক্তিতে যতটুকু আঁধার সে দূর করতে পারে তারই সাধনায় আত্মনিমগ্ন।

রেবাও বুঝি ঠিক তাই। দুঃখ-দারিদ্র্য-বেদনার অমানিশার বুকে সে যেন একটি অকম্পিত দীপশিখা। অন্ধকারের বুকে আলো জ্বালাই যেন তার সাধনা।

দরজা খুলে বাইরে আবছা অন্ধকারে দয়াময়বাবুর পাশে আর একজন মানুষকে দেখে চকিতেই একটু আড়ালে সরে গিয়েছিল রেবা।

দয়াময়বাবু হেসে বললেন, তুই চিনতে পারলি নে মা, ও যে আমাদের সতীনাথ। এস বাবা, ভিতরে এস।

রেবা বিস্মিতদৃষ্টিতে সতীনাথের সুসজ্জিত পালিশ-লাগা চেহারার দিকে চেয়ে এগিয়ে যেয়ে তাকে প্রণাম করল। বাবলু বোধ হয় পাশের ঘরে পড়া করছিল। তাকে ডেকে এনে বলল, তোমার মামাবাবুকে প্রণাম কর বাবলু।

গৌরীপুরের বাসায়ও ঠিক এই কথাগুলিই আর একদিন রেবা বলেছিল। কিন্তু সে দিন আর এদিনের কথা বলায় যেন কত পার্থক্য।

যে মাধুর্য সেদিন ঝরে পড়েছিল রেবার প্রতিটি কথার ফাঁকে ফাঁকে আজ তা কোথায় গেল ?

রেবার সঙ্গে বেশী কথা সে দিন হয় নি সতীনাথের। সামান্য দু'চারটি কথা। সহজ কুশল-প্রশ্ন আর সামাজিকতার বিনিময়। দয়াময়বাবুর মুখে সতীনাথের উচ্ছ্বসিত স্তুতিগানের ফাঁকে ফাঁকেই তার এই আকস্মিক আবির্ভাবের প্রকৃত কারণটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সহসা নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল রেবা। সতীনাথের একান্ত আগ্রহ তার মনের কঠিন বহিরাবরণে আঘাত খেয়ে বারে বারেই প্রতিহত হল।

তবু ফিরবার সময় সারা পথ সতীনাথ কেমন যেন আচ্ছন্ন অভিভূতের মত আত্মমগ্ন হয়ে বসে রইল। গাড়ির চলার তালে তালে তার কেবলি মনে হতে লাগল, জীবনের যা কিছু কামনার যা কিছু আকাঙ্খার সে সব থেকে সে যেন আজ কেবলি দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। মনের মধ্যে কেবলি প্রশ্ন জাগতে লাগল, জীবনের চির-সাধনার যে পরশমণি নিকষে কণকরেখার মত মুহূর্তের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েও আবার সীমাহীন অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল তাকে কি বক্ষের হারে চিরদিনের মত দুলিয়ে রাখা যায় না ?

## ॥ ১৯ ॥

একটা নতুন উপলব্ধির আলোয় সতীনাথের জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু যেন সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জীবনের যে সমস্ত আচার-আচরণ, যে সব ঘটনা-দুর্ঘটনা এতকাল ছিল দুর্বোধ্য ও রহস্যময়, তার নতুন উপলব্ধির আলোয় সব যেন অনেক বার পড়া গল্পের মত সরল ও সহজবোধ্য হয়ে দেখা দিল।

বিবাহের দিন হতে আজ অবধি সুভদ্রার প্রতি স্বামীর কর্তব্যে তার অবহেলা ঘটেছে। স্ত্রীর সর্বাঙ্গীন অধিকার দিয়ে তাকে সে বরণ করে নেয় নি তার মনের ঘরে। নিতে পারে নি।

কিন্তু কেন পারে নি?

নরেনদা বলেছেন, সুভদ্রার অশিক্ষা ও রূপহীনতাই তার কারণ। শূলপাণি বলেছে, সুভদ্রা নিজে বুঝেছে, অন্য অনেকেই তাই মেনেছে যে সরযূর প্রতি যৌবনোচিত রূপজ মোহই তার কারণ।

কিন্তু সতীনাথ জানে, একান্ত ভাবেই জানে যে তা সত্য নয়! সরযূর প্রতি তার স্নেহ ছিল, করুণা ছিল, সহানুভূতি ছিল। কিন্তু রূপজ মোহ ছিল না। তা যদি থাকত তাহলে সব জেনেশুনেও সে কখনও দিনের পর দিন নির্লিপ্ত মনে দর্জিপাড়ার বাড়িতে তাকে পড়াতে যেতে পারত না।

তাহলে কেন সে সুভদ্রাকে গ্রহণ করতে পারে নি তার অন্তরের মধ্যে?

অনেক ভেবে, অনেক আত্মবিশ্লেষণ করেও এতদিন এ-প্রশ্নের কোন সদুত্তর সে পায় নি।

কিন্তু আজ পেয়েছে। নিজের অন্তরের আলোয় সে সত্য আজ তার কাছে ধরা দিয়েছে। আজ সে উপলব্ধি করেছে, রেবার প্রতি তার মনের গহনতম কন্দরে যে অনুরাগ তিল তিল করে সঞ্চিত হয়েছিল তার সম্পূর্ণ অগোচরে, তারই দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণ তাকে সুভদ্রার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এতকাল।

এ সত্যের একটা আংশিক আভাষ সতীনাথ পেয়েছিল গৌরীপুরে রেবার সাময়িক সান্নিধ্যের ফলেই। কিন্তু তখনও তার উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় নি। সম্পূর্ণ হবার সুযোগও সে তখন পায় নি। তার আগেই বিরুদ্ধ ঘটনার আবর্ত তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রেবার কাছ থেকে দূরে।

কিন্তু আজ সতীনাথ বুঝতে পেরেছে, সুখে ও দুঃখে, মিলনে ও বিরহে তার অন্তরতম মন চিরদিন রেবাকেই চেয়েছে। দয়াময়বাবুর আদরিনী কন্যা রেবা তার পক্ষে অলভ্যা। বিবাহিত সতীনাথের জীবনে তার আবির্ভাব অকল্পনীয় শুভ্রবাসা রেবা তার পক্ষে অপ্রাপনীয়া। সব সত্য। সব সে জানে। তবু সব জেনেশুনেও সেই রেবাকে ঘিরেই এতকাল ধরে চলেছে তার মনের মধুচক্র রচনা।

সেই রেবা ঘটনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে আজ আবার এসেছে তার একেবারে কাছে। বলতে গেলে তারই আশ্রয়ে। তার আর্থিক আনুকূল্যের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

শিল্পী যেমন করে প্রাণ ভরে দেখে আকাশের নীলকে, সাগরের ঢেউকে বা লতার বুকে দোল-খাওয়া ফুলকে, তেমনি ভাবে একান্ত আপনার করে সে দেখতে পাবে রেবাকে—তার মনের মানসীকে। ধরা নয়, ছোঁয়া নয়, শুধু দেখা, শুধু কাছে পাওয়া,—সেই আশাতে সেই আনন্দই যেন কাণায় কাণায় ভরে উঠল সতীনাথের মনের পাত্র।

এত দিনে যেন কৃতকৃতার্থ হল সতীনাথের জীবন।

হায়রে মানুষের আশা! কাঁচের পেয়ালার মতই সে যে ভঙ্গুর।

সূর্যের সাত রঙ লেগে এই সে ঝিলমিল করে আশায় আর আনন্দে। আবার কখন এতটুকু আঘাত লেগেই ফেটে ভেঙে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ে

সতীনাথের সব আনন্দও একদিন তেমনি করে ফেটে ভেঙে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

দয়াময়বাবু চতুর মানুষ। জেলা কোর্টের ঝানু উকীল। সতীনাথের কথায়-বার্তায়, আলাপ-আলাচনায় দুদিনেই তিনি বুঝে নিলেন, রেবার প্রতি সতীনাথের দুর্বলতার গোপন কথা। আর তাকেই কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনের ছেঁড়া ব্যাগটাকে বেশ শক্ত-পোক্ত করে বেঁধে নেবার মওকায় আত্মনিয়োগ করলেন সর্বপ্রযত্নে।

কয়েকদিন 'অ্যালায়েড হার্ডওয়্যার কনসার্ণ'-এর আপিসে যাতায়াত করতে করতেই একদিন কাজের ফাঁকে এক সময় তিনি ঢুকে পড়লেন সতীনাথের খাস-কামরায়। হেঁ হেঁ করে হাসতে হাসতে আর কাসতে কাসতে বললেন, বাবাজীর এখন কাজের খুব তাড়া নেই তো?

—আজ্ঞে না, আপনি আসুন।

—হেঁ হেঁ, কদিন থেকেই আসব আসব ভাবছি। তা কেমন যেন সংকোচ হয়। হাজার হোক তুমি আমার মনিব তো।

—না না, আপনি সে কথা ভাবছেন কেন? আপনার যখন দরকার হবে আসবেন।

—না না, দরকার ঠিক আমার নয়। মানে রেবা—

কথার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে গেলেন দয়াময়বাবু।

সতীনাথ সাগ্রহে বলল, রেবা ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালই আছে। সেই তো আমাকে বলল—

—কি বলুন তো?

—মানে, আমার অবস্থা তো তুমি নিজের চোখেই সেদিন দেখে এসেছ। তাই সাহস করে কথাটা ঠিক বলতে পারছে না বেচারি।

অথচ ওর ইচ্ছা নিজের হাতে রেঁধে একদিন তোমাকে খাওয়ায়। তাই বলছিলাম কি—

—বেশ তো, এতে এত কিন্তু করবার কি আছে? আমি নিশ্চয়ই যাব। কবে যেতে হবে বলবেন।

—কবে আর কি বাবাজী, তোমার যদি অসুবিধা না হয় তো কালই সন্ধ্যের পরে—

—সন্ধ্যের পরে! চমকে উঠে নিজের মনেই কথা দুটো উচ্চারণ করল সতীনাথ। সেদিন সন্ধ্যার পরে দয়াময়বাবুকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বেশ একটু দেরী করেই বাড়ি ফিরেছিল সতীনাথ। আর তার ফলে সুভদ্রার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে যেয়ে সত্য-মিথ্যে অনেক কথাই বলতে হয়েছিল তাকে। সুভদ্রা অবশ্যি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সুলোচনাকেই শাপ-শাপান্ত করেছিল অনেক বার।

দয়াময়বাবু বললেন, কাল কি তোমার অসুবিধা হবে?

—না না, অসুবিধা কিসের? আপনি বলবেন রেবাকে কাল সন্ধ্যার পরেই আমি যাব।

কথামত সন্ধ্যার পরেই গিয়েছিল সতীনাথ।

কিন্তু রেবার মুখের দিকে চেয়েই কেমন যেন চমকে উঠেছিল। তার দুটি ছলছল চোখে এ তো আহ্বানের বাণী নয়, এ যে প্রত্যাখ্যানের কঠিন লিপি!

খাবার আগে পর্যন্ত একটি কথাও মুখ ফুটে বলল না রেবা। বরং সতীনাথের মনে হল, সে যেন তাকে এড়িয়েই চলতে লাগল। অবশ্য ছোট দুই কামরা বাড়িতে অতিথির প্রতি সহজ সৌজন্য বজায় রেখে যতটা এড়িয়ে চলা সম্ভব।

বিস্মিত হল সতীনাথ। একটু বা বেদনাও অনুভব করল রেবার এই আকস্মিক পরিবর্তনে। এই কি সেই রেবা, স্বামীর সম্ভাব্য লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে সামনে

ধরে দিয়েছিল নিজের হাতে তৈরি মিষ্টান্নের বাটি? যে একদিন সতীনাথকে সেবাযত্ন করতে না পারার দুঃখেই দুই চোখে ফেলেছিল অবিরল অশ্রুধারা?

যথারীতি আহারাদি হয়ে গেল। ভোজন-ব্যবস্থাব কোন রকম ক্রুটি রাখেন নি দয়ামযবাবু। খেতে বসে হেঁ হেঁ করে হাসতে হাসতেই বললেন, তোমাকে আর আমরা কি খাওয়াব বাবাজী। এ তো তোমার নিজের জিনিষই তুমি খাচ্ছ। তাই কোন রকম সংকোচ তুমি করো না।

সংকোচ সতীনাথ করে নি। শুধু রেবার দিক থেকে নীরব উপেক্ষার একটা ব্যথা যেন বার বার তার বুকের ভিতরে গুমরে গুমরে উঠছিল।

খাওয়া শেষ হলে সতীনাথকে সযত্নে এনে নিজের বিছানায় বসালেন দয়াময়বাবু। তেমনি হে হে করে হাসতে হাসতেই বললেন, এইবার তাহলে তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমি এই ফাঁকে একটা জরুরী কাজ সেরে আসছি। ওরে রেবা, সতীনাথ রইল। ওঁর যা দরকার হয় না হয় একটু দেখিস্।

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দয়াময়বাবু। একলা ঘরে চুপ করে বসে থাকতে কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল সতীনাথ।

একটু পরে ঘরে ঢুকল রেবা।

রান্না ঘরে যেমন ছিল ঠিক তেমনি বেশবাসেই এল। কাপড়ে তেল-হলুদের দাগ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অযত্নরক্ষিত রুক্ষ চুল। সামান্যতম প্রসাধনের আভাসও কোথাও নেই।

দরজার এক পাশেই চুপ করে দাঁড়াল রেবা। কোন কথা বলল না।

কথা বলল সতীনাথ। বলতে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম তো?

রেবা গম্ভীর গলায় বলল, কষ্ট আমার কপালের লিখন। কিন্তু আমি ভাবছি সে কষ্ট দিতে আপনি এখানে এলেন কেন? আসতে পারলেন কেমন করে?

চমকে উঠল সতীনাথ। বিহ্বল কণ্ঠে বলল, তার মানে?

—মানে তো খুব কঠিন নয় মাস্টারমশায়। আর আপনার পক্ষে সেটা না বোঝবারও কথা নয়।

—তুমি কি বলতে চাইছ?

—আমি কি বলতে চাই তা কি আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি? আপনি কি বুঝতে পারেন নি কেন বাবা আপনাকে এখানে নেমন্তন্ন করে এনেছেন? কেন আপনাকে আমার কাছে একলা রেখে কাজের অজুহাতে তিনি বাইরে চলে গেলেন?

—তুমি কি বলছ রেবা? তিনি তোমার বাবা?

—হ্যাঁ, আমার দুঃখী অসহায় বাবা। আপনার মত শিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে ভাল করে না জড়াতে পারলে তাঁর যে খাওয়া-পরারও সংস্থান হবার উপায় নেই।

আতংকে যেন চেঁচিয়ে উঠল সতীনাথ, রেবা!

—তাছাড়া আমার বাবা যে স্বার্থপর মানুষ, নিজের স্বার্থ ছাড়া তিনি যে এক পা-ও চলেন না সে কথা তো আপনার না জানবার কথা নয়। কলকাতায় আমার দাদুর বাড়িতে আপনার আকস্মিক ভাবে আসা আবার তেমনি আকস্মিক ভাবে চলে যাওয়ার পিছনে তার কোন্ মন কাজ করেছিল সে কি আপনি ভুলে গেছেন?

চকিতে বিছানার উপর সোজা হয়ে উঠে বসল সতীনাথ। বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর রেবা। এত কথা আমি ভেবে দেখি নি। সহজ সরল মনেই তোমার বাবার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছিলাম। তুমি বিশ্বাস কর—

—বিশ্বাস আপনাকে আমি করি মাস্টারমশায়। আর তা করি বলেই বলছি আপনি আর কখনও এ বাড়িতে আসবেন না।

—তুমি কি বলছ ?

—ঠিকই বলছি। আমার বাবার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আপনার এ বাড়িতে এ ভাবে আসা-যাওয়ায় কী অর্থ যে পাড়ার অন্য লোকেরা করবে সেটাও কি আপনি ভেবে দেখেছেন ?

সতীনাথ কোন কথা বলল না এ-প্রশ্নের জবাবে। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময়ে বলল, আচ্ছা রেবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ঠিক ঠিক জবাব দেবে তো ?

—চেষ্টা করব।

—সে দিন তোমার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে আমাকে তোমাদের গৌরীপুরের বাসায় ডেকে নিয়ে যেতে সেদিন কই এ লোকনিন্দার ভয় তো তোমার হয়নি ? তাহলে আজ কেন তোমার-আমার সহজ সুন্দর সম্পর্ককে শুধু মাত্র মিথ্যা লোকনিন্দার ভয়ে এমন ভাবে তুমি ছিন্ন করতে চাইছ ?

—সেদিনে আর আজে যে অনেক তফাৎ মাস্টারমশায়। সেদিন আমি ছিলাম রাণার আসনে। আপনার অশেষ দুঃখ-কষ্টের এতটুকুও যদি লাঘব করতে পারি এই ছিল সেদিন আমার ধ্যান-জ্ঞান। তাই স্বামীর লাঞ্ছনা বা লোকের নিন্দার কথা তখন আমার মনেও হয় নি। কিন্তু আজ যে আমি একেবারেই অসহায়। অর্থ নেই, মর্যাদা নেই, একেবারেই পথের ধূলায় এসে বসেছি। আপনাকে আজ তো আমার দেবার কিছুই নেই। শুধু আছে দুই হাত পেতে নেওয়া। বাবাকে আপনি চাকরি করে দিয়েছেন। আমাদের খেয়ে-পরে বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই তো যথেষ্ট। কিন্তু দোহাই আপনার, এর চেয়ে বেশী কিছু দেবার চেষ্টা আপনি করবেন না। সত্য হোক মিথ্যা হোক, তাতে যে কলংক রটবে তার কালি শুধু আমার মুখেই নয়, আপনার গায়েও যে লাগবে। না না, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

এর পরেও আরও কিছু কথা হয় তো বলবার ছিল সতীনাথের।

হয় তো সে বলতে চেয়েছিল, তুমি শুধু তোমার দিকটাই দেখলে রেবা, আমার দিকে একবারও চেয়ে দেখলে না? এ সংসারে আমি যে কত একা, তোমার একটুখানি সেবাযত্নে আমার মনের আকাশে যে কত রামধনু হাসে, সে খবর তুমি একটুও রাখলে না? শুধুমাত্র কর্তব্য আর কৃতজ্ঞতার শুকনো কাঠ চিবিয়ে আমার ক্ষুধার্ত মনকে আমি কতকাল আর বাঁচিয়ে রাখব? কোন্ প্রত্যাশায় চলব আর জীবনের পথে?

কিন্তু রেবার দুটি বেদনার্ত ছলছল চোখের দিকে চেয়ে কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হল না। স্খলিতপদে বিছানা থেকে নামতে নামতে কোন মতে সে শুধু বলল, তাই হবে রেবা, তাই হবে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

দয়াময়বাবুর জন্য আর তিলমাত্রও সেখানে অপেক্ষা করে নি সতীনাথ। ঝড়ের তাড়া-খাওয়া শুকনো পাতার মত দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে সে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল পথে। কোন মতে গাড়ির হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে হাঁক দিয়েছিল, চল গড়ের মাঠ।

ময়দানের পথে পথে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরতে ঘুরতে কেমন যেন একটা সীমাহীন শূণ্যতায় সতীনাথের হৃদয়-মন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল, তার কেবলই মনে হতে লাগল কেউ নেই, কিছু নেই। সব শূন্য। সব ফাঁকা। জীবনে কোন রস নেই, কোন আকর্ষণ নেই, কোন অর্থ নেই। একটা অর্থহীন নিঃসীম শূন্যতার অতলে যেন সে কেবলি তলিয়ে যেতে লাগল।

সুভদ্রার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবলি দেনা-পাওনার—অর্থ-নৈতিক বাধ্যবাধকতার সুতো দিয়ে বাঁধা। যে কোন দিক থেকে একটু জোর টান লাগলেই সে সুতো ছিঁড়ে দুজন দুদিকে ছিটকে পড়বে। সে ঠুণকো সম্পর্ককে সম্বল করে আর যাই চলুক জীবনের গাঙে পাড়ি জমানো যায় না।

সুলোচনা তাকে ভালবাসে, তার কল্যাণ কামনা করে, তার সেবাযত্নে তার গভীর পরিতৃপ্তি। কিন্তু সে তো সুলোচনার দিকের কথা। তার নিজের দিকের কথা কি ? এতদিন হয় তো সে কথা, সে সত্যের স্বরূপ সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে নি। করতে চেষ্টাও করে নি। হয় তো বা সুলোচনার প্রতি তার গভীর মমত্ব বোধকে সেও ভালবাসা বলেই মনে করেছিল। কিন্তু আজ রেবাকে কাছে পেয়ে, তার প্রতি নিজের মনের অকারণ আকর্ষণের তীব্রতাকে অনুভব করে, দুটি নারীকে নিজের মনের আয়নায় পাশাপাশি বসিয়ে সে বুঝতে পারছে, সুলোচনার কাছে সে কৃতজ্ঞ, তার ভালবাসায় সে মুগ্ধ, তার অনন্য-সাধারণ সেবাযত্নে সে কৃতকৃতার্থ। কিন্তু বৃন্তহীন পঙ্কজের মত যে কারণবিহীন ভালবাসার মধুসৌরভে দিকদিগন্ত সুরভিতে ভরে ওঠে, তার মনের বৃন্তে সুলোচনার প্রতি সে ভালবাসার পঙ্কজ তো কই ফোটে নি!

আর রেবা ?

যে সূর্যমুখী নিজের হাতে নিজের কণ্ঠনালি সজোরে চেপে ধরে তার মুখখানি ফিরিয়ে নিল সূর্যের দিক থেকে, স্বেচ্ছায় হৃদয়ের পাপড়ি মুদে বরণ করে নিল অন্তহীন অন্ধকারের বেদনাত জীবন, তার কাছে আর কোন্ প্রত্যাশায় আলোর আহ্বান পাঠাবে সতীনাথ ?

সুদূর সপ্তর্ষিলোকের ক্ষীণপ্রাণ অরুন্ধতীর মতই রেবার দুটি অশ্রু-ছলছল ম্লান আঁখি হয় তো মিটি মিটি করে চেয়ে থাকবে।

কিন্তু তার দিকে হাত বাড়াবে সতীনাথ কোন্ উন্মাদের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ?

না না, তা হয় না। আকাশের তারা আকাশেই থাকে। মাটির মানুষের জীবন তাতে ভরে না।

কোন দিন ভরবেও না। সব ফাঁকা, অর্থহীন, শূন্য।

সর্বম্ শূন্যম্ শূন্যম্।

ভাবতে ভাবতেই অকস্মাৎ এক সময় সতীনাথ যেন আর্তনাদ করে বলে উঠল, চল, কোঠিমে।

ড্রাইভার গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে স্পীড্ বাড়িয়ে দিল।

দ্রুত পদক্ষেপে দোতলায় উঠতেই একেবারে সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল সুভদ্রার সঙ্গে। মনে হল, গাড়ির আওয়াজ শুনেই সে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কৈফিয়তের সুরে সতীনাথ বলল, আমার একটু দেরি হয়ে গেল—

সুভদ্রা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, দেরি যে হয়ে গেছে সেটা না বললেও আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন দেরি হল সেইটেই আমি জানতে চাই। কোথায় ছিলে এত রাত ?

মৃদু হাসি দিয়ে সুভদ্রার গলার ঝাঁঝটাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে সতীনাথ বলল, তুমি যা ভেবেছ তা নয়। সুলোচনার বাড়িতে আমি যাই নি।

—আহারে. কী আমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রে! কি না, ঠাকুর ঘরে কে, না আমি কলা খাই না।

—তুমি বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি, সুলোচনার বাড়ি যাই নি।

—সেখানে যাও নি তো গিয়েছিলে কোন্ চুলোয় ? কোথায় কাটিয়ে এলে এত রাত ? আবার কোন্ নাগরালি জুটিয়েছ ?

সুভদ্রার কথার হুল্ সতীনাথের চামড়াকেও এবার বিদ্ধ করল। এমনিতেই মনটা তার শিকড়-ছেঁড়া সহকারের মত হতচ্ছাড়া হয়েছিল। তার উপর বাড়ি ফিরতেই উপর্যুপরি এমন কথার ঝাঁটা। সতীনাথের মনটাও খিঁচরে উঠল। তবু ঝামেলা না বাড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে চুপ করে রইল। সুভদ্রার কথার কোন জবাব দিল না।

সুভদ্রা আবার ফুট কাটল, কি হল ? চুপ করে রইলে যে ? বল, কোথায় গিয়েছিলে ?

সতীনাথ মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিল, জাহান্নামে।

—কি বললে? জাহান্নামে?

—হ্যাঁ, জাহান্নামে। তোমার মত স্ত্রীকে নিয়ে যার ঘর করতে হয় জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তার আর গতি কি?

—বটে! এখন সব দোষ হল আমার। জাহান্নামে যাবার পথ খুঁজেছ নিজে, এখন আমায় নিয়ে টানাটানি! তা কথা তুমি মিথ্যে বল নি। সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।

—তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?

—ঠিকই বলছি। নিজের স্ত্রীর প্রতি যার টান নেই, ঘর-সংসারে যার মন নেই, শেষ পর্যন্ত জাহান্নামেই সে যায়। তোমারও সেই লক্ষণই আমি দেখছি।

—বেশ করব, জাহান্নামেই যাব। তাতে কার বাবার কি?

আর যাবে কোথায়? সুভদ্রা রাগে একেবারে ফেটে পড়ল, কি, তুমি আমার বাপ-মা তুলে কথা বলছ? তুমি এত নীচ! নিত্যি নতুন মেয়েমানুষ নিয়ে তুমি ফূর্তি মারবে আর—

সুভদ্রার শেষের কথাগুলো আর সতীনাথের কানে গেল না। হন্ হন্ করে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে সে দরজা বন্ধ করে দিল। রুদ্ধদরজার উপর সজোরে আঘাত করতে করতে সুভদ্রা শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় অবিরাম চীৎকার করতে লাগল। সতীনাথ কোন কথারই জবাব দিল না। পাখাটাকে ফুল্ ফোর্সে চালিয়ে দিয়ে দুই হাতে মাথাটাকে চেপে ধরে চুপ করে বসে রইল বিছানার উপর।

কোথায় যেন সে পড়েছিল, সংসারকে তপ্ত কটাহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উপমাটার তাৎপর্য যেন সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল সেই মুহূর্তে।

## ॥ ২০ ॥

পরদিন বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙল সতীনাথের। তখনও তার সমস্ত শরীর যেন আলস্যে ভেঙে পড়ছে। বিছানা ছেড়ে যেন উঠতেই ইচ্ছা করছে না। তার মনে হল, শুধু মনেই নয়, তার দেহের কলটাও যেন হঠাৎ বিগড়ে গেছে। কোন কাজ-কর্ম করবার সামর্থ্যই যেন তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

তবু এক সময় সে উঠে পড়ল বিছানা থেকে। মনে মনে স্থির করল, এ নরককুণ্ডে যত কম সময় থাকা যায় ততই মঙ্গল। সকাল-সকালই খেয়েদেয়ে আপিসে চলে যাবে। সেখান থেকে কাজকর্ম সেরে যাবে সুলোচনার কাছে। তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। বড় অভিমানী সে। অনুরাগই তো অভিমানের জনক। যে ভালবাসে অভিমান তো তাকেই সাজে। যাবে বলে কথা দিয়েও সেদিন রাত্রে সুলোচনার বাড়ি সে যায় নি। তা নিয়ে কত অনুযোগ করেছিল সুলোচনা। তার উপরে গত তিন-চার দিনের মধ্যে একবারও সে সুলোচনার সঙ্গে দেখা করতে যায় নি। না জানি, আহত স্বপ্ন অভিমানের বেদনায় কতখানি অভিভূত হয়ে পড়েছে সে। তাই আজ বিকেলে তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তার অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তরকে যথাসাধ্য শান্ত করবার চেষ্টা করতেই হবে।

সুভদ্রার সঙ্গে একটি কথাও না বলে আপিসে চলে গেল সতীনাথ। সুভদ্রাও রাগ করে তার ঘরমুখো হল না।

একটু দ্রুত হাতেই আপিসের কাজ শেষ করল সতীনাথ। একটু বা বিরক্তি ভরেই। ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না তার।

ঘর-সংসার, আপিস-কর্মচারি, অর্ডার-কণ্ট্রাক্ট, দেনা-পাওনা—সবই যেন মূল্যহীন নীরস শুকনো পাতার মত মনে হয় তার কাছে।

সুলোচনার অভিমান-ভরা মুখখানি, তার সঙ্গে সম্ভাবিত আলোচনার টুকরো-টুকরো কথা, সুলোচনার মুখের ভাব-পরিবর্তনের নানা রেখা—কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই সব ছবিই যেন বার বার সতীনাথের চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

দ্রুত হাতেই কাজ করছিল সতীনাথ। এমন সময় বিরক্তিকর হুঁ হুঁ শব্দ করতে করতে স্প্রিং ডোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন দয়াময়বাবু।

অসীম বিরক্তিতে একবার চোখ তুলে তাকাল সতীনাথ। কোন কথা বলল না। মুখ নিচু করেই নিজের কাজে মন দিল আবার।

সে নীরব উপেক্ষাকে গ্রাহ্য করলেন না দয়াময়বাবু। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। চুপ করেই বসে রইলেন একটু ক্ষণ। তারপর এক সময় বললেন, বাবাজি বোধ হয় খুব ব্যস্ত আছ আজ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু ব্যস্ত আছি।

—তাহলে তো এ সময় এসে তোমাকে বিরক্তই করলাম। কিন্তু না এসে যে পারলাম না বাবাজি।

দয়াময়বাবুর কথায় কেমন যেন খটকা লাগল সতীনাথের মনে। মুখ তুলে সে বলল, ব্যাপার কি বলুন তো?

—ব্যাপার যে কি তা তো আমি জানি না। কাল রাতে রেবার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছে তা তুমিই জান। আমি বাড়ি ফিরে দেখি তুমি চলে গেছ, আর রেবা বসে কাঁদছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় কোন কথাই সে বলল না। কেবলি কাঁদতে লাগল। কাঁদুক। তাতে আর কি। কাঁদতেই তো ও এসেছে। কিন্তু কাল থেকে ও যে অন্নজল ত্যাগ করেছে বাবাজি। না খেয়েই যে ও মরে যাবে এমন করলে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে বিস্ময়ে ও বেদনায় সতীনাথ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল, আপনি ওকে খেতে বলেছিলেন?

—তা আর বলি নি? বার বার করে বলেছি। যত খারাপই হই আমি তো ওর বাপ। কিন্তু আমার কোন কথায়ই ও কান দিল না। হয় তো তোমার কথা ও অমান্য করবে না। তুমি যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বল—

হঠাৎ যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠল সতীনাথ। দয়াময়বাবুর নির্লজ্জ লোভ আর জঘন্য স্বার্থপরতাই যে রেবা ও তার মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে, সে ক্ষোভকে যেন সতীনাথ আর মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারল না। কঠিন গলায় সে বলে উঠল, না না, আমার এখন সময় নেই। আমার দ্বারা ওসব হবে না। আপনি দয়া করে চলে যান এখান থেকে। যদি এখানে চাকরি করতে চান তাহলে আর কখনও কোন ছুতো করে আমাকে আপনার বাড়িতে নেবার ফন্দি করবেন না।

সতীনাথের নির্মম কণ্ঠস্বর শুনে দয়াময়বাবুর মত ঝানু লোকও যেন কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়া গলায় বললেন, আমি আর কখনও তোমার ঘরে আসব না বাবা, তোমার সঙ্গে দেখাও করব না। কিন্তু দোহাই তোমার, আমার চাকরিটা খতম করে দিও না। তা হলে আমরা যে না খেয়ে মারা যাব বাবা।

কথা শেষ করে কম্পিত স্খলিত পায়ে দয়াময়বাবু সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্তব্ধবাক সতীনাথ হাঁ করে তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

খোলা ফাইল সামনে নিয়ে কতক্ষণ যে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল সতীনাথ সে খেয়ালই তার ছিল না। দেয়াল-ঘড়িতে টং টং করে পাঁচটা বাজতেই তার যেন সম্বিত ফিরে এল। সুলোচনার বাড়ি যেতে হবে। আর যেতে হবে ট্রামে বা বাসে। তাকে আপিসে পৌঁছে দিয়েই গাড়ি ফিরে গেছে বাড়িতে। সুভদ্রা নাকি সলিলকে নিয়ে বিকেলে কোথায় বেরুবে, ড্রাইভারকে সে বলে দিয়েছিল গাড়ি নিয়ে

ফিরে যেতে। সে কথা শুনে আপিসে পোঁছেই সে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছিল গাড়ি দিয়ে।

ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সতীনাথ। ব্র্যাকেট থেকে কোটটা নিয়ে গায়ে চাপাল এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

আকণ্ঠ যাত্রীবোঝাই হয়ে মহানগরীর জনাকীর্ণ পথ বেয়ে মন্থর-গতিতে চলেছে ট্রাম পথে পথে যাত্রীর ওঠা-নামার ধ্বস্তাধ্বস্তি-হাঁকাহাঁকির বিরাম নেই। বিরাম নেই ট্রামের এক ঘেয়ে ঘট ঘটাং শব্দের। অথচ সেই ট্রামের একটি কোণে জানালায় মাথা রেখে পরম নির্বিকার চিত্তে চোখ বুঁজে বসে রইল সতীনাথ। যেন আঘাত-সংঘাতে ভরা এ জগতে সে নেই।

এক সময় কণ্ডাক্টারের ডাকে চমকে চোখ মেলল সতীনাথ।

এ কি! উত্তর কলকাতার একটা ডিপোতে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে নির্জন যাত্রীবিহীন ট্রাম। যাত্রীরা একে একে কখন সবাই নেমে গেছে। কখন খালি হয়েছে ট্রাম। কিছুই সে খেয়াল করে নি। বুঝি খেয়ালের জগতে সে ছিলই না।

অপ্রস্তুত ভাবে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল সতীনাথ।

তার তো যাবার কথা বালীগঞ্জ—সুলোচনার বাড়িতে। তাহলে সে উত্তরাঞ্চলের ট্রামে উঠে এখানে এল কেন? ভুল করে এ ট্রামে সে উঠল কেন?

সহসা দয়াময়বাবুর কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল। কাল রাত থেকে রেবা অন্নজল ত্যাগ করেছে। দয়াময়বাবুর কথায় কোন ফল হয় নি। একমাত্র সতীনাথের কথা সে অমান্য করে না। সে যদি—

সতীনাথের ঠোঁটে অসহায়তার একটা বিবর্ণ হাসি খেলে গেল প্রতিপদের আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত। তাহলে রেবার মনই তাকে এ ভুলের পথে টেনে এনেছে। রেবার অনাহারক্লিষ্ট ম্লান

মুখখানিই অন্তরের অন্তস্থলে বসে তার পা দুটিকে আপিসের সিঁড়ি থেকে টানতে টানতে উত্তরগামী ট্রামের পাদানিতে পৌঁছে দিয়েছিল।

সতীনাথ ভাবল, অনাহারী রেবার মুখে দুটো অন্ন তুলে দেওয়াও তো তার কর্তব্য। রেবাকে সে ভালবাসে। রেবাও তাকে ভালবাসে।

পরমুহূর্তেই সজোরে মাথা নেড়ে উঠল সতীনাথের মন। না না, সে হয় না। রেবার পাশে দয়াময়বাবুর বাড়িতে আর সে যেতে পারে না। কোন ফল তাতে হবে না। রেবার অনশনক্লিষ্ট মুখে তাতে অন্ন উঠবে না। বরং ফল হবে বিপরীত। অসহায় ক্ষোভে অধিকতর নির্মমভাবে সে উৎপীড়ন করবে নিজেকে। অধিকতর নিষ্ঠুর কণ্ঠে হয় তো বা তিরস্কার করবে সতীনাথকে। সে তিরস্কারের বেদনা সতীনাথ সইতে পারবে না। সহ্য করবেই বা কিসের আশায়? যাকে ভালবাসা যায় তার বিরহ তবু সহনীয়, কিন্তু তার দেওয়া উপেক্ষা আর অনাদর যে সহনাতীত বেদনার বিষে জর্জর।

ট্রাম ডিপোর এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সতীনাথ। নিজের সঙ্গে মোকাবিলা করল। তারপর যেন অপর কেউ তাকে পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এমনি ভাবে পা ফেলতে ফেলতে এক সময় গঙ্গাতীরে যেয়ে পৌঁছুল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দূরে দূরে আলো জ্বলে উঠেছে গঙ্গার তীরে। তারই এক জায়গায় একটা বটগাছের নির্জন ছায়ার অন্ধকারে কায়াহীন প্রেতের মত গুম হয়ে বসে রইল সতীনাথ।

ও দিকে ঠিক সেই সময়ই একটা অভাবিত কাণ্ড করে বসল সুলোচনা। আর সেই অপ্রত্যাশিত কাণ্ডের ফলেই সতীনাথের অনেক ঘাটে জল খেয়ে অবশেষে তরতর করে বয়ে চলা জীবন-নৌকো একে-বারেই বানচাল হয়ে গেল।

অথচ তখন সুলোচনার চেয়ে অধিকতর আপনার জন বুঝি

সতীনাথের আর কেউ ছিল না। সুলোচনার চেয়ে বেশী করে আর কেউই বুঝি সতীনাথের কল্যাণ সেদিন চায় নি। অথচ সেই সুলোচনার হাত দিয়েই শেষ পর্যন্ত কোন্ এক অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতা যেন এ জন্মের মত সতীনাথের এ সংসারের পুতুলখেলার শেষ করে দিল।

বুঝি এমনিই হয়।

লঙ্কাধিপতির মৃত্যুবাণও তো হনুমানের হাতে তুলে দিয়েছিল তারই সহধর্মিণী মন্দোদরী।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সেদিন রাতে সতীনাথের 'সু-বাসে' যেয়ে হাজির হল সুলোচনা নিজের গাড়ি নিয়ে।

'সু-বাস' রচনার প্ল্যান তৈরি থেকে আরম্ভ করে বাড়ি সম্পূর্ণ হবার প্রতিটি টুকিটাকি ব্যবস্থার সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল সুলোচনার হাত। কিন্তু গৃহ-প্রবেশের দিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও সুলোচনা সে-বাড়িতে পদার্পণ করে নি।

করে নি সতীনাথ তাকে ডাকে নি বলেই।

সুলোচনা খুবই আশা করেছিল গৃহ-প্রবেশের অনুষ্ঠানে সতীনাথ সস্ত্রীক যেচে তাকে নিমন্ত্রণ করবে।

কিন্তু সতীনাথ তা করে নি।

কেন যে করে নি, কত বড় দুঃখে যে সে আনন্দ থেকে সতীনাথ নিজেকে বঞ্চিত করেছিল সেদিন, সে কথা একমাত্র সতীনাথ ছাড়া আর কেই বা জানে!

সেই থেকেই অভিমানভরে আর একটি দিনের জন্যেও 'সু-বাস'-এর কথা সুলোচনা মুখেও উচ্চারণ করে নি। সে বাড়িতে যাওয়া তো দূরের কথা।

তবু সেদিন রাতে বিনা নিমন্ত্রণে সেই 'সু-বাস'-এই যেয়ে হাজির হল সুলোচনা।

না যেয়ে সুলোচনা পারে নি।

মানব-মনের প্রথম অনুরাগ পাষাণের গায়ে লেখা অক্ষয় স্বাক্ষর। সুলোচনার কিশোরী মনের সেই অনুরাগের প্রবাহ দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর নতুন করে সতীনাথকে পেয়ে যখন শত তরঙ্গ তুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ সুভদ্রা এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়াল। বেচারি সতীনাথের মনে যাই থাকুক বাহ্যিক ব্যবহারে সে আড়ালকে সে সোজাসুজি অস্বীকার করতে পারল না।

সুলোচনার জীবনে সেখানেই দেখা দিল সংকট। সতীনাথকে সে আর মনের মত করে কাছে পায় না যত কাছে না পায় তার মনের অভিমান তত গুমরে গুমরে মরে। অভিমানে-অভিযোগে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

সেই মান-অভিমানের পালায় সুলোচনার অন্তর যখন ক্ষত-বিক্ষত ঠিক সেই সময়ই সুলোচনা-সুভদ্রা-সতীনাথের জীবন-নাটকের প্রায় শেষ অঙ্কে অকস্মাৎ আবির্ভাব হল রেবার। দু'নৌকোর টাল যদি বা কোন মতে সামলে চলছিল সতীনাথ, রেবার বেদনার্ত জীবনের ঘূর্ণিপাকের টানে তার হাতের হাল একেবারেই বেসামাল হয়ে গেল। বেচারি সতীনাথ এ-কূল ও-কূল সব কূল হারিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

আর তার দিশেহারা জীবনের ঘূর্ণিপাকের টান অনিবার্য ভাবে যেয়ে প্রতি-আঘাত করল সুলোচনার মনে। নিজের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত-হৃদয় সতীনাথ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পর পর কয়েক দিন ঘটনার চাপে পড়ে সুলোচনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পর্যন্ত যেতে পারল না, তখন অধীর প্রতীক্ষায় আশাহত সুলোচনা সেই অনুপস্থিতিকে সতীনাথের সজ্ঞান উপেক্ষা বলে কল্পনা করে একেবারে যেন মরিয়া হয়ে উঠল। নিজের জীবনের সব চেয়ে পরম বস্তু নিয়ে এ হেলাফেলার খেলা সে আর সহ্য করতে পারল না। সতীনাথ-সুভদ্রার একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ সমস্যার একটা চরম মীমাংসার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলল।

• আর ঠিক সেই মানসিক অবস্থাতেই তার আসন্ন জন্মতিথির নিমন্ত্রণকে উপলক্ষ্য করে সে একদিন স্বয়ং গাড়ি নিয়ে 'সু-বাস'-এ যেয়ে হাজির হল।

বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। চাকরের মুখে সে খবর শুনেও ফিরে গেল না সুলোচনা। বাইরের ঘরেই অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই বাড়িতে ঢুকল সতীনাথ।

বাইরে সুলোচনার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার যেন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। সুলোচনা এসেছে তার বাড়িতে, সুলোচনারই হাতে-গড়া 'সু-বাস'-এ এ-কথা ভেবে একটা গভীর তৃপ্তিতে যেমন ভরে উঠল তার মন, অন্য দিকে তেমনি আশংকার একটা কালো মেঘও ছায়া ফেলল তার মনে।

কে জানে সুলোচনার এই আগমনকে কি-ভাবে গ্রহণ করেছে সুভদ্রা? ঈর্ষাকাতর মনের জ্বালায় সহজ সৌজন্যবোধও যদি সে হারিয়ে ফেলে? সরযূ তথা সুলোচনাকে কেন্দ্র করে যত বিষ, যত বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে তার মনে, আকস্মিক উত্তেজনায় তারা যদি কুৎসিৎ সরীসৃপের মত কিলবিল করে বেরিয়ে আসে সুভদ্রার তীক্ষ্ণ রসনা-মুখে? তাহলে সে লজ্জা সে আত্ম-অবমাননার জ্বালা সে রাখবে কোথায়?

তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকতেই সামনে সুলোচনাকে একা বসে থাকতে দেখে সতীনাথ বলে উঠল, আরে সরযূ যে! হঠাৎ কি মনে করে? এদিকে কোথাও এসেছিলে বুঝি?

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সুলোচনা বলল, না, আপনার এখানেই এসেছি।

—বল কি? কী ব্যাপার?

—আমি একটা শেষ বোঝাপড়া করতে এসেছি। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল সুলোচনা।

আতঙ্কে কেঁপে উঠল সতীনাথের বুক। কাঁপা গলায় সে বলল,

শেষ বোঝাপড়া! তুমি বলছ কি সরযু? কিসের বোঝাপড়া?"

—এ ক'দিন আমি অনেক ভেবেছি মাস্টারমশায়। দিনরাত ভেবেছি। এতটুকু শান্তি পাই নি। রাতে ঘুমুই নি। দিনে খেতে পারি নি। কেবলি ভেবেছি, আমার মনে যখন পাপ নেই, অন্যায় হীনতা নেই, লোভ নেই, স্বার্থপরতা নেই, তবে কেন আপনার-আমার সম্পর্কের মধ্যে এত বাধা এত বিঘ্ন থাকবে? বাইরের সমাজ, বাইরের সংসার আমাকে যে চোখেই দেখুক, আপনার সমাজে, আপনার সংসারে কেন আমাব ঠাঁই হবে না?

সুলোচনার এই আর্ত কণ্ঠস্বরে সতীনাথের মন যেন স্নেহে করুণায় মমতায় একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত অথচ চাপা গলায় সে বলল, কে বলল তোমাকে সরযু যে আমার সংসারে তোমার ঠাঁই নেই? তোমার ঠাঁই যে আমার মাথায়, আমার অন্তরের মধ্যে, সে কি তুমি জান না?

সুলোচনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সতীনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, ও কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না মাস্টারমশায়, আমার ঠাঁই আপনার পায়ের নিচে। সেখানেই আমি থাকতে চাই।

—তবে কেন শেষ বোঝাপড়ার কথা বলছ সরযু? তোমার-আমার সম্পর্কের কি শেষ আছে?

—তবু মাস্টারমশায়, শুধু আপনাকে নিয়েই তো আপনি নন, আপনার স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়জনকে নিয়েও আপনি। সেই পরিপূর্ণ আপনাকেই যে আমি পেতে চাই। অনেক দিন তো আপনাকে বলেছি, আপনার পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আপনাকে আমি পেতে চাই না। আমি আপনাকে পেতে চাই দশের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে। আর সেই জন্যেই অনেক ভেবেচিন্তে আমি আজ এসেছি, সুভদ্রাদিকে নিমন্ত্রণ করতে। আপনি হয় তো ভুলে গেছেন আগামী পরশু আমার জন্মদিন।

সতীনাথ উল্লসিত হবার একটা নকল ভঙ্গী করে বলে উঠল, তাই

নাকি ? এই দেখ, নানা কাজের চাপে এত বড় কথাটা একেবারেই ভুলেই বসে আছি। কিন্তু তার জন্যে তোমার কষ্ট করে এখানে আসবার কি দরকার ছিল। আপিসে আমাকে একটা ফোন করে জানালেই তো চলত।

সুলোচনা ক্ষুব্ধ গলায় বলল, এতদিন তাই চলত। কিন্তু এবারে আর তা চলবে বলে ভরসা করতে পারলাম না। আমার অনেক নিমন্ত্রণই তো আজকাল আপনি রাখতে পারেন না। তাছাড়া ফোনে নিমন্ত্রণ করলে যদি সুভদ্রাদি না যান, তাই আমি নিজেই এসেছি।

সতীনাথ হয় তো সুলোচনার এ প্রস্তাবে আপত্তি জানাতেই যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

সুভদ্রা ফিরেছে। না জানি কি ঘটবে এবার। কোন্ দুর্ঘটনা! আশংকায় উৎকণ্ঠ হয়ে বাইরে তাকাল সতীনাথ।

সহজ ভাবে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ সুলোচনা ও সতীনাথকে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে সুভদ্রার মাথার মধ্যে যেন হাজার বিষাক্ত সাপ কিলবিল করে উঠল। তার দুই চোখে জ্বলে উঠল তীব্র জীঘাংসার লাল আগুন। রাগে সারা মুখ লাল হয়ে উঠল। সারা দেহ কাঁপতে লাগল তার উত্তেজনায়।

সোজা একেবারে সুলোচনার সামনে যেয়ে সুভদ্রা রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি চান আপনি ? কেন এসেছেন এ-বাড়িতে ?

সুলোচনা ততক্ষণে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার প্রতি সুভদ্রার বিরূপ মনোভাবের কথা সতীনাথ তাকে জানিয়েছে। একটা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন তাকে হতে হবে এটাও সে জেনেই এসেছিল। কিন্তু একেবারে প্রারম্ভেই তার চেহারা যে এমন রুক্ষ অশোভন হবে এতটা সে ভাবে নি।

তাই প্রথমটা সে হতবাকই হয়েছিল সুভদ্রার কঠিন প্রশ্নে।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, আমি আপনার কাছেই এসেছি দিদি।

কণ্ঠস্বরকে যত দূর সম্ভব তিক্ত করে সুভদ্রা বলল, কার কাছে যে এসেছেন আপনি সে আমি জানি। কিন্তু কেন এসেছেন সেইটেই জানতে চাই।

—আমি এসেছি আপনাদের নেমন্তন্ন করতে।

—নেমন্তন্ন? কিসের?

—কাল আমার জন্মদিন। তাই আপনি সলিল ও মাস্টার-মশায়কে নিয়ে—

—থাক। নেমন্তন্নটা আপনার মাস্টারমশায়কেই করে যান। আর সেই সঙ্গে জেনে যান যে উনি আপনার রূপ দেখে, আপনার টাকা খেয়ে নিজেকে আপনার পায়ে বিকিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু—

তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়ল সতীনাথ, চুপ কর সুভদ্রা। অভদ্রতারও একটা সীমা আছে।

ততোধিক উচ্চকণ্ঠে পাল্টা কথা বলল সুভদ্রা, আর বেহায়াপনার বুঝি কোন সীমা নেই? এটা যে ভদ্রলোকের পাড়া, ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি, সিনেমাওলা নাচনেওলীদের যাত্রার আসর নয়, সে কাণ্ডজ্ঞানও কি ওনার নেই?

এর পরেও 'সু-বাস'-এর মোজাইক-মসৃণ মেঝেতে দাঁড়িয়ে কথার বিষ হজম করবার মত মনের ধৈর্য সুলোচনারও ছিল না।

অপমানজর্জরিত ম্লান-মুখ তুলে একবার শুধু সে চাইল সতীনাথের দিকে। দ্যূতপণে সর্বহারা প্রথম পাণ্ডবের মত সে তখন নতমুখ, অবনতদৃষ্টি। সুলোচনা বলল, আমি যাচ্ছি মাস্টারমশায়।

এ কথার কোন জবাব সুলোচনা আশা করে নি। সতীনাথও কোন জবাব দেয় নি।

তবু অপমানিত বিতাড়িত সুলোচনা যখন দুই চোখের জল মুছতে মুছতে তার গাড়িতে যেয়ে বসল, সতীনাথও ততক্ষণে তার গাড়ির কাছে যেয়ে ম্লান মুখে দাঁড়াল।

শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে সুলোচনা নিম্নকণ্ঠে বলল, আপনার

আমার সম্পর্ক আপনার আর আমার অন্তরেই লেখা রইল মাস্টার-মশায়। তাকে সকল জনের পারিবারিক সম্পর্কের স্তরে তুলবার চেষ্টা করে আমিই ভুল করেছি। আপনি তো আগাগোড়াই নিষেধ করেছেন। এতে আপনার কোনই দোষ নেই। আপনি এ নিয়ে মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না।

ক্ষোভ! মনের মধ্যে একটা অসহায় ক্ষোভ পুষে রাখলেই কি ডাক্তারের এ অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হবে। এ যে কতবড় অকৃতজ্ঞতা, কতখানি জঘন্য কৃতঘ্নতা, সে কথা এ-বাড়ির আর কেউ না জানুক সতীনাথ তো জানে।

এ-বাড়ির প্রতিটি ইটের গায়ে যে সুলোচনার অদৃশ্য স্বাক্ষর আঁকা আছে। সুলোচনার নামটাকেই যে এ-বাড়ির ললাটে সোনার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত।

অথচ এই বাড়ি থেকেই তাকে আজ লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় নিয়ে কুকুরের মত বিতাড়িত হতে হল।

একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সতীনাথ।

সুলোচনার গাড়ি তখন রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আর তার চাকার তলায় যেন নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে সতীনাথের বিচার-বিবেচনা-বুদ্ধি—সব।

নেশাগ্রস্তের মতই ধীর পদক্ষেপে এক সময় দোতলায় উঠে গেল সতীনাথ। নীরবেই রাতের আহার সমাধা করল। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলল না। তারপর উঠে গেল তেতলার নির্জন চিলে-কোঠার ঘরে।

সুভদ্রা মনে করল, সুলোচনাকে অপমান করায় তার রাগ হয়েছে। তাই অমন গম্ভীর হয়েছে সে। কিন্তু বেদনার যে অগ্নিদহন তখন চলেছে তার মনে সে খবর কেউ রাখল না।

তেতলার ঘরে চুপচাপ বসে রইল সতীনাথ। প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে চলল। সতীনাথ নিদ্রাহীন চোখে ঠায় বসে রইল।

মনে তার হাজার প্রশ্নের অবিরাম অংকুশাঘাত : এ কী হল ? কেমন করে সে সহ্য করবে এত দুঃখ ? কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে এই মহাপাপের ? এ সংসারে সে বাস করবে কিসের আকর্ষণে ? যাকে কাছে পেতে চায়, যার সঙ্গ প্রাণে বইয়ে দেয় শান্তির অমিয় নির্ঝর, তাকেই ঠেলে দিতে হবে দূরে ; আর মন যাকে চায় না, যার ছায়ার স্পর্শে কুঞ্চিত হয় সারা দেহ মন, তাকেই গ্রহণ করতে হবে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ! জীবনের এ দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা সে ভোগ করবে কেমন করে ?

ভোগ কি করতেই হবে ? মুক্তির কি কোন পথ নেই ?

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিশীথের ওপারে যেন ঝলকিত হয়ে উঠল কণকদীপ্তি ত্বিষাম্পতি। সহসা ঝলমল করে উঠল সতীনাথের মনের আকাশ।

স্থির হয়ে কান পাতল একবার। না, কোথাও কোন সাড়া নেই। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। রাত্রির শেষ যাম সমাগতপ্রায়

আসন ছেড়ে উঠে সন্তর্পণে চাতল ঘুরিয়ে স্টীলের আলমারিটা খুলল সতীনাথ।

এক কোণ থেকে বের করল কোচানো একখানি শান্তিপুরী ধুতি।

গত ৺বিজয়াদশমীর দিন এই ধুতিখানি দিয়েই সুলোচনা তাকে প্রণাম করেছিল সুভদ্রার বিদ্রূপের ভয়ে ধুতিখানি সে আর পরে নি। যেমন পেয়েছিল তেমনি রেখে দিয়েছিল।

সেই ধুতিখানি যত্ন করে পরল সতীনাথ। একটা জামা গায় দিল। কিছু টাকা নিল আলমারি থেকে। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একবার কি যেন দেখল সতৃষ্ণনয়নে।

হঠাৎ কি মনে পড়ল, আলমারির টানা খুলে একখানা চেক্-বই তুলে নিয়ে পকেটে রাখল।

তারপর অতি সন্তর্পণে পা ফেলে 'সু-বাস'-এর মোজাইক-করা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

## ॥ ২১ ॥

সুলোচনার পুতুলের ঘর ভেঙে গেল।

খড়-ছাওয়া মাটির ঘর নয় যে আগুনে পুড়বে। ইট-কাঠের পাকা ঘর নয় যে ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়বে। আর দশজন মানুষের মত লাভ-ক্ষতি পাওনা-গণ্ডার হিসেব করে ঘরের পত্তন করেনি সুলোচনা। শুধুমাত্র মনের ভাল লাগার ভিতের উপর কল্পনার মর্মর প্রাসাদ গড়েছিল সে। গড়েছিল সতীনাথকেই মনে মনে পরম আত্মীয়তায় বরণ করে। অর্থ নয়, বিত্ত নয়, কাম নয়, কামনা নয়, শুধুই ভাল-বাসা। সতীনাথকে ভালবেসে, তাকে সুখী করে, অন্তরের অনাবিল সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে সতীনাথকে অভিসিঞ্চিত করেই সে সুখী হতে চেয়েছিল। অন্ততঃ নিজের মনে সুলোচনা তাই জানত। তাই পরম নিশ্চিন্তেই সে ভরসা করেছিল, তার সে মনের ঘরে কোন দিন স্বার্থের ঝড় উঠবে না, লাগবে না ঈর্ষার আগুন।

তবু সেদিন রাতের এক দমকা ঝড়ে উড়ে গেল তার বড় আশার ঘরের চাল। একটা দুর্বোধ্য ঈর্ষার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল তার ঘরের দেয়াল। ভূমিকম্পে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল তার ভিত।

দুই চোখে অবিরল অশ্রুর ধারা নিয়ে বালীগঞ্জে ফিরবার পথে তার অসহায় আর্ত মনে শুধু একটি মাত্র প্রশ্নই বার বার ধ্বনিত হতে লাগল: কেন এমন হল? সে তো কারও অকল্যাণ চায় নি, কারও সুখের অংশে তো সে ভাগ বসায় নি, বসাতে চায় নি, তবু কেন ক্ষতবিক্ষিন্ন কুকুরের মত তাকে বিতাড়িত হতে হল সতীনাথের 'সু-বাস' থেকে? কেন?

সারা রাত ঘুম এল না সুলোচনার চোখের পাতায়। একটা প্রতিকারহীন দুঃসহ অন্তর্জ্বালার দাহে তার সর্বাঙ্গ যেন পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল।

রাত শেষ হল। ভোরের হাওয়ায় খাটের বাজুর উপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুলোচনা। ঘুম ভাঙল নীলমণির ডাকে।

ধরমড়িয়ে উঠে বসল সুলোচনা। বেশ বেলা হয়েছে। খটখটে রোদে চারদিক ভরে গেছে।

নীলমণি বলল, আপনি তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন মা। বাইরের ঘরে একজন লোক অনেক ক্ষণ বসে আছে।

চমকে সুলোচনা বলল, এত সকালে আবার কে বসে আছে?

—তা তো জানি নে মা। বললেন, আপনার সঙ্গে জরুরী দরকার আছে।

—আমার সঙ্গে দরকার!

কথা কয়টি নিজের মনেই একবার উচ্চারণ করে আর দেরী করল না সুলোচনা। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে।

সাধারণ বেশভূষার একটি প্রৌঢ় লোক বসে ছিল নিচের ঘরে সুলোচনা ঘরে ঢুকতেই লোকটি সসম্ভ্রমে উঠে নমস্কার করল।

সুলোচনা সাগ্রহে বলল, কোত্থেকে আসছেন আপনি?

—আজ্ঞে, আমি বাবুর কাছ থেকে আসছি। একখানা চিঠি আছে আপনার।

—চিঠি? কে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে বাবু।

—বাবু? কে বাবু?

—আজ্ঞে আমাদের 'অ্যালায়েড হার্ডঅয়ার কনসার্ন'-এর বাবু।

সতীনাথের চিঠি! সুলোচনার বুকের ভিতরটা গভীর উৎকণ্ঠায় যেন ধ্বক্ করে উঠল। হাত বাড়িয়ে বলল, কই, দেখি চিঠিখানা।

স্পষ্টাক্ষরে সুলোচনারই নাম-ঠিকানা লেখা। সতীনাথই লিখেছে।

সুলোচনা বলল, এ চিঠি তিনি আপনাকে কখন দিয়েছেন?

—আজ্ঞে, কাল শেষ রাতে হঠাৎ বাবু আমার বাড়ি যেয়ে হাজির। আমার সজাগ ঘুম। দুই ডাকেই দরজা খুলে আমি তো